কাশ্মীর-কুসুম।

অর্থাৎ

কাশ্মীরের বিবরণ।

" ভ্রমণ ব্রমণ কিনা দেখ রে নয়ন ! "

শ্রীরাজেন্দ্রমোহন বসু-কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা

৩০নং করন্ওয়ালিস ষ্ট্রীট্—মধ্যস্থ-যন্ত্রালয়ে

শ্রীঅদ্বৈতচরণ ঘোষ দ্বারা

মুদ্রিত।

শকাব্দাঃ ১৭৯৭।

উৎসৃষ্ট উপহার।

সর্ব্বগুণালঙ্কৃত স্বদেশ-হিতৈষী গুণিগণাগ্রগণ্য

শ্রীযুক্ত বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়

কাশ্মীরের প্রধান বিচারপতি এবং জুডিশিয়েল কমিস্যনর

মহাশয় সমীপেষু।

সসম্মান নিবেদনমেতৎ

আপনি আমাকে সোদরের ন্যায় স্নেহ এবং অকৃত্রিম মিত্রোচিত আমার হিতসাধন ও মঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন। এমন মিত্রতা ঋণের পরিশোধ নাই। তথাপি আন্তরিক কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ এই "কাশ্মীর-কুসুম" নামা যৎসামান্য উপহার আপনাকে দিতেছি। এ অপকৃষ্ট হার আপনার মনোহরণ করিবে, এ দুরাশা করি না। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক সাদরে একবার স্পর্শ করিলেই সাধারণের হস্তে অর্পণ করিতে সাহসী হইতে পারি।

জম্বু।
১লা জ্যৈষ্ঠ,
সন ১২৮২ সাল।

বশম্বদ
শ্রীরাজেন্দ্রমোহন বসু।

ভূমিকা।

কয়েক বৎসরাবধি ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর রাজ্য আমার প্রবাস-ভূমি হইয়াছে। আদৌ বিষয় কর্ম্মোপলক্ষেই আমার আগমন —তৎসূত্রেই এতদ্রাজ্যের নানা স্থানে অবস্থান ও পর্য্যটনাদি হয়। স্বাভাবিক প্রবৃত্তির অনুরোধে প্রথমাবধিই মনে মনে সংকল্প ছিল, যে, যখন যেখানে যাইব, সুযোগমতে তত্রত্য কোনো কোনো বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার চেষ্টা পাইব। যদিও এই মানস ছিল, কিন্তু এত বাহুল্য যে হইয়া উঠিবে, তখন তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। ইটী কেবল স্বদেশস্থ আত্মীয় বান্ধবগণের সাগ্রহ কৌতূহল ও উত্তেজনাতেই ঘটিয়াছে। কিয়ৎকাল কাশ্মীর প্রবাসের পর যখন আমি একবার স্বদেশে গমন করি, তখন আমার মুখে তাঁহারা কাশ্মীরের রমণীয়তা, অনুপম শোভা, অদ্ভুত নৈসর্গিক ব্যাপারচয়, স্বাস্থ্যকর জল বায়ু, বিস্তৃত হ্রদ উৎসাদি জলাশয়, কৃত্রিম রম্যোপবনাদি বিলাস-ভবন এবং প্রাচীন কীর্ত্তিস্তম্ভাদির বিষয় কথঞ্চিৎ শ্রবণ করেন। সেই হইতেই তাঁহাদের কৌতূহলের বৃদ্ধি, এবং তদবধিই তাঁহারা কাশ্মীরের বিবরণ লিখিয়া পাঠাইতে আমাকে পুনঃ পুনঃ উপরোধ করেন। প্রধানতঃ তাহাই এই পুস্তক প্রণয়ন পক্ষে আমার উত্তেজক বা উত্তরসাধক।

এইরূপে প্রণোদিত হইয়া অবকাশ মতে মধ্যস্থ পত্রে “কাশ্মীরের বিবরণ” অভিধেয় প্রস্তাব ক্রমশঃ লিখিয়া পাঠাইতে লাগিলাম। তৎসম্পাদক মহাশয় প্রতিবারেই অনুরাগ

প্রকাশ দ্বারা উৎসাহের বহু গুণ বর্দ্ধন করিলেন। সেই সঙ্গে অনেক সহৃদয় পাঠক মহাশয়েরা প্রস্তাব পাঠে আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক উহাকে পুস্তকাকারে মুদ্রিত করণার্থ অনুরোধ করেন। আমি শুদ্ধ সেই সাহসে সাহসী হইয়াই অদ্য এই "কাশ্মীর কুসুম" পুস্তকখানি সাধারণের হস্তে অর্পণ করিতেছি। এই কুসুমে সুসৌরভ আছে কিনা এবং যদি কিছু থাকে, তাহা বিবিধ পাঠকের মনোমধুপকে আকর্ষণ করিতে পারিবে কি না—কিছুই বলিতে—কিছুই বুঝিতে পারি না। যদি অল্প সংখ্যক পাঠক পাঠিকারাও মনোনিবেশ পূর্ব্বক ইহার আদ্যোপান্ত এক একবার পড়িয়া দেখেন এবং দেখিয়া কিঞ্চিন্মাত্রও প্রীতি লাভ করেন; অথবা যদি কোনো পাঠক কাশ্মীরের পর্য্যটক হইয়া এই পুস্তক হইতে কিয়ৎ পরিমাণেও উপকৃত হয়েন, তবে তাহাতেই আমার আয়াস ও যত্নের সাফল্য জ্ঞান করিব।

মধ্যস্থ পত্রে যাহা প্রকাশ পায়, তাহার প্রথম অধ্যায়ে এখানকার ভৌগোলিক বিবরণ, ঋতু পরিবর্ত্তন, অধিবাসীদের চরিত্র, শিল্পকৌশল, ভাষা এবং শাসন প্রণালী; দ্বিতীয় অধ্যায়ে পথ সমূহের বিবরণ; তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীনগর ও তৎসন্নিহিত রম্য স্থান ও হ্রদাদির বিষয়; চতুর্থ অধ্যায়ে অদ্ভুত নৈসর্গিক ব্যাপার সমূহ বিবৃত হইয়াছিল। এক্ষণে তত্তাবৎ বহুলাংশে পরিবর্ত্তিত, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত এবং অবকাশবিরহে যে কয়টী পরিচ্ছেদ মধ্যস্থে তখন প্রকাশ করিতে পারি নাই, তাহাও এখন সন্নিবেশিত করিয়া দিলাম। কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে স্বতন্ত্র পুস্তক প্রণয়নের মানস রহিল।

বলা বাহুল্য, যে, এতদ্বর্ণিত পথ ও রম্য স্থানাদির প্রায়

সমুদয়ই আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অধিকন্তু ডাক্তার ইন্স সাহে-
বের " কাশ্মীর হ্যাণ্ড বুক " নামা পুস্তক, কাশ্মীরের সুবিস্ত
সচীব প্রধান দেওয়ান কৃপারাম কর্ত্তৃক পারসীক ভাষায় লিখি
" গুল্‌জারে কাশ্মীর " অভিধেয় গ্রন্থ এবং তৎগুণাকর পু
অথচ মদীয় প্রিয়তম ছাত্র ও মিত্র দেওয়ান অনন্তরামের নি
হইতে বিস্তর সাহায্যও পাইয়াছি। তজ্জন্য তাঁহাদিগের ৫
মুক্তকণ্ঠে কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিলাম ন

পরিশেষে বক্তব্য, আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ সুবিজ্ঞ মধ্য
সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন বসু মহাশয় এই পুস্তকে
লিপিগত ও মুদ্রাগত সংশোধনাদি বিষয়ে এবং কিয়দংশে
আর্থিক ভার বহনে যেরূপ বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন
তাহাতে তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা ঋণে বদ্ধ থাকিব। তি
নানাবিধ দুরূহ কার্য্যে নিয়ত ব্যাপৃত, তথাপি " কাশ্মী
কুসুম " প্রস্ফুটনার্থ যত্নরূপ জলসেক ও উৎসাহরূপ আলবা
বন্ধনে তিলেকের জন্যও ত্রুটী করেন নাই। অধিক কি, এবে
আমি গ্রন্থ লেখক পদে নবব্রতী, তাহাতে প্রবাসী, সুতরাং
তাঁহার ঐরূপ ঐকান্তিক স্নেহানুকূল্য ব্যতীত এ পুস্তক কদা
চই ভূলোকের আলোক দর্শনে সমর্থ হইত না!

বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজে এরূপ গ্রন্থ লেখার উদ্যম অদ্যাপি
সাধারণ হয় নাই, সুতরাং সমালোচকের দৃষ্টিতে আমার এই
পুস্তকে বিবিধ ত্রুটী থাকা সম্ভব, কিন্তু ভরসা করি, ঐ কার
বিবেচনাতেই তাঁহারা মার্জ্জনা ও প্রশ্রয় দান করিবেন।

জম্বু।
শ্রাবণ, ১২৮২ সাল। } শ্রীরাজেন্দ্রমোহন বসু।

শুদ্ধিপত্র।

পাঠকবর্গকে অনুনয় করিতেছি, তাঁহারা এই পুস্তক পাঠ করিবার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত অশুদ্ধিগুলি শোধন করিয়া লইবেন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
৪	১২, ১৭	লদাঘ্	লদাখ্
১১	১৮	বাগ্ণী	বগ্গী
১৪	২৪	খম্মুস	সম্মুখ
১৫	১২	মণ্ডলাকারে	চা মণ্ডলাকারে
২৪	৩	গোমা	গোসা
৩১	১০	সৌর্য্য	শৌর্য্য
৪৪	২১	ইউরোপীয়, (বোধ হয়, ইটালীদেশীয় হইবে)	আমেরিকা দেশীয় রণকুশল সেনানায়ক।
৪৮	১৬	কর্ণ	কোণ্
৪৮	১৯	ঔৎকর্ষ	উৎকর্ষ
৫৭	২২	১১00	১১,৪00
৮৬	২৪	খুসরি	খুপরি
৮৯	১২	কিয়দ্দর	কিয়দ্দূর
১০০	১২	প্রাণায়ম	প্রাণায়াম
১০৯	৩	রাজপুর	রামপুর
১১৬	১৩	৮	৮৷৷০

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১৯	৬	কৈশাখ	বৈশাখ
১৩০	১৩	মনোমেহন	মনোমোহন
১৩১	১২	হর	হয়
১৩৩	৫	শদৃশ	সদৃশ
১৪২	১১	গর্বদ্ধন	গোবর্দ্ধন
১৪৩	৩	বাগমন্দির	দেবমন্দির
১৪৩	৯	মুসলমানদিরে	মুসলমানদিগের
১৪৬	১	নিশ্চর	নিশ্চয়
১৫০	১	কাচী	কাটী
১৫৩	১৬	হদকে	হ্রদকে
১৫৪	১২	হদকে	হ্রদকে
১৫৪	১৬	সংস্কারভাবে	সংস্কারাভাবে
২০৪	১৬	তাঁহার	তাঁহারা
২৩৭	১৫	পেরু	চোরু

সূচীপত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কাশ্মীরের পথ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রীনগর এবং তৎসন্নিকটবর্ত্তী স্থানাদি।

প্রথম অংশ।

দ্বিতীয় অংশ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অদ্ভুত নৈসর্গিক ব্যাপার।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কাশ্মীরের পূর্ব্ব বিভাগ।

প্রথম অংশ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কাশ্মীরের উত্তর বিভাগ।

লার পরগণা। সিন্দ্ উপত্যকা। জীর্ণ দেবায়তন। নাগবল্।
গঙ্গাবল্। সোনামর্গ্। অদ্ভুত প্রতিমূর্ত্তি।

কাশ্মীর উপত্যকার মধ্যে কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অতি সুন্দর উপ-উপত্যকা আছে। পূর্ব্ববর্ণিত লোলাব পরগণার ন্যায় শ্রীনগরের উত্তর-পূর্ব্ব ভাগে লার নামে একটী অত্যুৎকৃষ্ট পরগণা। ইহার উত্তর প্রান্তে যে একটী রমণীয় ও সুদীর্ঘ উপত্যকা আছে, তাহার মধ্যদেশ দিয়া সিন্দ্ নদী প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া উহাকে সিন্দ্ উপত্যকা কহে। ইহা শ্রীনগর হইতে সপ্ত ক্রোশ দূরে স্থিত এবং দ্রাস, লদাখ্ ও ইয়ার্কন্দ প্রভৃতি স্থানে যাইবার পথ উহারই মধ্য দিয়া গিয়াছে।

এই উপত্যকায় স্বভাবের শোভা অতি সুন্দর ও বহু বিচিত্র। ইহার উভয় পার্শ্বে অভ্রভেদী পর্ব্বতশ্রেণী দণ্ডায়মান—উহাদের শিরোদেশ তুষার মণ্ডিত—গাত্রে চীড় ও ভূর্জ্জপত্রের অরণ্য এবং পদতলে সুস্বাদু ফলের উপবন। এখানকার ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা। সর্ব্বত্র যেরূপ মনোহর তৃণ জন্মিয়াছে, দেখিলে অবাক্ হইতে হয়—বোধ হয়, যেন প্রকৃতি দেবী দূর্ব্বাদলের গালিচা বিছাইয়া রাখিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অযত্নসম্ভূত আঙ্গুর, পিচ, আক্রোট, সেউ, নাসপাতি

প্রভৃতি রসাল ফলের বৃক্ষ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে চারি দিকে জন্মিয়াছে। নদীর উভয় তটে মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক গ্রাম আছে। উহাদের চতুঃপার্শ্বে কর্ষিত ভূমি শস্য-পূর্ণ হইয়া শোভা পাইতেছে। এখানে মৃগয়াও অতি সুলভ। কাশ্মীরের সমুদয় স্থানাপেক্ষা এখানকার জল বায়ু উৎকৃষ্ট। একারণ, সম্ভ্রান্ত ও ধনী কাশ্মীরীরা এবং পর্য্যটকমাত্রেই এখানে কিয়দ্দিবস বিশেষতঃ শ্রাবণ ও ভাদ্র মাস অতিবাহিত করিয়া থাকেন।

এই উপত্যকার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে এবং শ্রীনগর হইতে ১৬ ক্রোশ দূরে কতিপয় অত্যুত্তম জীর্ণ দেবালয় আছে। এতৎসমুদয় অতিশয় প্রাচীন; উহাদের ভগ্নাংশ ও নির্ম্মাণ কৌশল দেখিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, ইহারা বহু পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এক স্থলে প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাকারের মধ্যে মন্দির চতুষ্টয়ের জীর্ণি আছে। উহাদের গাত্রে এবং ছাতে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষরাজ জন্মিয়া রহিয়াছে। প্রাচীর পরিবেষ্টিত প্রাঙ্গণভূমি ঈষৎ জলময় বা আর্দ্র, সুতরাং এমত কোমল যে, বোধ হয়, ইহা কোনো কালে ক্ষুদ্র হ্রদগর্ভ ছিল।

কিয়দ্দূরে এক অতি প্রাচীন দেবালয়ের সন্নিকটে একটী পবিত্র উৎস আছে। ইহাকে নাগবল কহে। ইহা এক অত্যুচ্চ পর্ব্বতের তল হইতে নিঃসৃত হইতেছে। ইহার জল সাতিশয় শীতল ও বিশুদ্ধ এবং উৎস হইতে নির্গত হইয়া ন্যূনাধিক ৪০ হস্ত দীর্ঘ ও ২৫ হস্ত প্রশস্ত এক পাষাণনির্ম্মিত কুণ্ডে গিয়া পড়িতেছে। এই উৎসের চারিদিকে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত বহু বহু ঘাসের পাদুকা বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। যে

সমুদয় যাত্রী সম্মুখবর্ত্তী গঙ্গাবল নামক তীর্থ দর্শন করিতে যায়, তাহারাই এই স্থলে উক্ত উপানৎ পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

গঙ্গাবল্ অত্যুৎকৃষ্ট পার্ব্বত্য হ্রদ। ইহা হরমুখ পর্ব্বতের ১৬,৯০০ ফিট উচ্চ শিখরদেশে স্থিত। ইহাতে উঠিবার যে পথ আছে, তাহা অতি দুর্গম ও কষ্টসাধ্য এবং এমন দীর্ঘ, যে, কেবলমাত্র উঠিতে ও নামিতেই এক দিবস অতিবাহিত হয়। এই হ্রদ দৈর্ঘ্যে দেড় মাইল এবং প্রস্থে ৫০০ হস্ত হইবে। ইহাও বিতস্তা নদীর উৎপত্তি স্থান বলিয়া পরিগণিত এবং হিন্দুদিগের সুপ্রসিদ্ধ প্রধান তীর্থ। হিন্দুস্থানবাসী হিন্দুদিগের পক্ষে যেমন গঙ্গা, কাশ্মীর পণ্ডিতদিগের পক্ষে তেমনি এই গঙ্গাবল্। এস্থলে প্রতিবৎসর ভাদ্র মাসে মহা সমারোহ হয় এবং এই উপলক্ষে সহস্র সহস্র যাত্রী সমাগত হইয়া থাকে।

সিন্দ উপত্যকার উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তে এবং শ্রীনগর হইতে পাঁচ আড্ডা দূরে সোণামর্গ্ অর্থাৎ স্বর্ণময় ক্ষেত্র। ইহা গুল্‌মর্গের ন্যায় উৎকৃষ্ট। অপিচ, অনেকে গুলমর্গাপেক্ষা এই স্থানকে অধিক মনোনীত করিয়া থাকেন এবং কহেন, যে, এই স্থান জলবায়ু ও সৃষ্টির শোভা সম্বন্ধে কাশ্মীর প্রদেশের সমুদয় স্থানাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও প্রীতিকর। এস্থলে মহারাজা সম্প্রতি পর্য্যটকদিগের জন্য কয়েকখানি বাসগৃহ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন।

সোণামর্গের পূর্ব্বদিকে ন্যূনাধিক পাঁচ ক্রোশ দূরে এক অধিত্যকার উপর ভূর্জ্জপত্রের অরণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এক মহীরুহের তলদেশে দুই অতীব আশ্চর্য্য প্রতিমূর্ত্তি

আছে—একটী দৃঢ়কায় নর এবং অপরটী কোমলাঙ্গী রমণী। দুইটীই পাষাণ নির্ম্মিত। নরদেহ বামভাগে হেলিয়া মৃত্তিকার উপরে বাম হস্ত সংলগ্ন পূর্ব্বক উপবিষ্ট রহিয়াছে। উহার দক্ষিণ দিকে কয়েক পদ পশ্চাতে অবলা, যেন ভয়ভীতা রূপে অবস্থিতি করিতেছে। ইহাদের সমক্ষে পাষাণ নির্ম্মিত মহানস (উনান) এবং কতিপয় ভাণ্ড রহিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে, দূর হইতে উহাদিগকে যেন সজীব বলিয়া বোধ হয়, উহাদিগের সমীপবর্ত্তী হইলেও সে ভ্রম সহজে দূর হয় না—উহারা যেন "কোমল ও সুখস্পর্শ রক্ত মাংসে গঠিত বলিয়া বোধ হয়, কঠিন প্রস্তর বলিয়া প্রতীয়মান হয় না।" উহাদের নির্ম্মাণ কৌশল এমনি বিচিত্র, যে শরীরের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা, লোমকূপ, অস্থি, নরাকৃতির বাম পঞ্জর এবং উভয়ের অঙ্গ ভঙ্গী এমন স্পষ্ট ও সুন্দর রূপে বিন্যস্ত হইয়াছে, যে, মনুষ্য হস্ত রচিত বলিয়া আশু বিশ্বাস হয় না। ইহারা যে কোন্ কালে ভাস্কৃত এবং ইহাদি[illegible]কেই বা এস্থলে কি অভিপ্রায়ে স্থাপিত করিয়াছে, তাহার কিছুই সঠিক অবধারণ করিতে পারা যায় না। ইহাদের সমীপে কোনো জীর্ণ দেবায়তন বা হর্ম্ম্যাদির চিহ্ন মাত্রও নাই। পরন্তু, ইহারা যে অতি প্রাচীনকাল হইতে এখানে অবস্থিত, তাহার কোনো সন্দেহমাত্রই নাই। ইহারা অনাচ্ছাদিত, সুতরাং ইহাদের উপরে যে কত বৃষ্টি ও কত নীহারপাত হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না। কিন্তু কিছুতেই ইহাদের সুন্দর অবয়বকে কিছু মাত্র বিকৃত করিতে পারে নাই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

শাল প্রভৃতি ঊর্ণাবস্ত্র

অনেকে কহিয়া থাকেন, যে, ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীর মোগল সম্রাজ্যের অন্তর্গত হইলে পর বাদশাহেরা ইয়ার্কন্দ প্রভৃতি উত্তর ভাগস্থ জনপদ হইতে তন্তুবায়াদি আনাইয়া এখানে শাল প্রস্তুত করিবার শিল্প কৌশল প্রথম প্রচার করেন। আবার কেহ কেহ কহেন, যে, মোগল সম্রাটদিগের অধিকার কালের ১৬৫ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৪২৩ খৃষ্টাব্দে জানালব উদ্দীন নামে একজন অতি প্রতাপান্বিত অধিপতি ছিলেন। তিনি শিল্পবিদ্যা, ও সাহিত্য প্রভৃতি অনেক বিষয়ের উন্নতি সাধন করেন। তিনিই সর্ব্বাদৌ তুরকীস্থান হইতে তন্তু-বায় প্রভৃতি আনাইয়া আপন প্রজাদিগকে শাল প্রস্তুত করিবার কৌশল শিক্ষা দেন। প্রত্যুত, যে কোনো সময়ে শাল প্রথম প্রস্তুত হউক না কেন, মোগল সম্রাটদিগের শাসনকালে ইহার যেরূপ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, এমত আর কোনো সময়ে হয় নাই এবং বোধ হয়, আর কোনো সময়ে হইবেও না। তৎকালে ১৬০০০ তন্তু চলিত এবং প্রায় সমুদয় কাশ্মীরী এই কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিত। কিন্তু এক্ষণে কেবল ২০০০ তন্তু মাত্র আছে এবং শালবাফ * ও

* শালের তন্তুবায়দিগকে শালবাফ কহে এবং তাহাদিগের অধীন কর্ম্মচারীদিগকে শাক্‌রেত কহিয়া থাকে।

শাকুরেৎদিগের সংখ্যা ন্যূনাধিক বিংশতি সহস্র হইবে। সকলেই অবগত আছেন, পূর্ব্বে যেরূপ কাশ্মীরী শাল প্রস্তুত হইত, এক্ষণে আর সে প্রকার শাল বা আলোয়ান চক্ষে দেখা যায় না। ইহার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নহে, কেবল এই, যে, অমৃতসরের প্রতিযোগিতা দিন দিন বৃদ্ধি ও ক্রেতাদিগের রুচি ও উৎসাহের হ্রাস। অমৃতসর প্রভৃতি স্থানে যে সকল শাল প্রস্তুত হইয়া থাকে, যদিও তাহা কাশ্মীরী শালের তুলনায় সর্ব্বাংশে নিকৃষ্ট, তথাপি তাহাদের মূল্য স্বল্প বলিয়া সকলই তত্তাবৎকেই মনোনীত করিয়া থাকেন। অপর, ইউরোপের সমুদয় স্থানাপেক্ষা ফরাশীশ দেশে কাশ্মীরী শাল অধিক বিক্রয় হইয়া আসিতেছিল। উহাদের প্রত্যেকের মূল্য অধিক নহে এবং প্রায় সমুদয়ই স্কোয়ের অর্থাৎ সমচতুষ্কোণ এবং কেবল ইউরোপীয়দেরই ব্যবহার্য্য। তথাপি প্রতি বৎসর বিস্তর টাকার রপ্তানি হইত বলিয়া শালবাফি কর্ম্মের যথেষ্ঠ উৎসাহ ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ফরাশীশ যুদ্ধের প্রারম্ভাবধি সেই প্রয়োজন হ্রাস হওয়াতে শালের বাজারও একবারে নতমুখ হইয়াছে। মহারাজা ইহার উন্নতি সাধন জন্য নিজ কোষের হানি করিয়াও ইহার কর অনেক কমাইয়াছেন। অপর, কেবল তিনিই মধ্যে মধ্যে অধিক মূল্যের শাল প্রস্তুত করিবার আজ্ঞা দিয়া থাকেন। ডিউক অব্ এডিন্‌বরা এতদ্দেশে আগমন করিলে তিনি তাঁহাকে উপঢৌকন দিবার জন্য যে শাল প্রস্তুত করেন, তাহাতে তাঁহার ২৫০০০ চিলকি মুদ্রা অর্থাৎ ১৫৬২৫ টাকা ব্যয় হয়। ফলতঃ ক্রেতাভাবেই এক্ষণে অধিক মূল্যের শাল প্রস্তুত হয় না। কিয়দ্দিন হইল কোনো

ইংরাজ সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন, যে, মহারাজকর্ত্তৃক অধিক কর গৃহীত হয় বলিয়াই শালের ব্যবসায় হ্রাস হইয়াছে। এ কথা কথাই নহে—ইহা নিতান্ত অমূলক ও গ্লানিমূলক অপবাদ বই আর কিছুই নহে। আমরা আবার বলিতেছি, মহারাজা নিজের ক্ষতি স্বীকার করিয়াও ইহার উন্নতি পক্ষে নিতান্ত সচেষ্ট আছেন এবং শুদ্ধ ক্রেতার অভাবই অবনতির একমাত্র কারণ। হায়! সোণার ভারত ক্রমে নির্ধন হইয়া পড়িল—বহুমূল্য শাল আর ব্যবহার করিবে কে? হায়! এক্ষণে সচরাচর যে জামেয়ার বা রুমাল দেখিতে পাওয়া যায়, উহার মূল্য ৫০০ হইতে ৩০০০ পর্য্যন্ত এবং শাপচন্দী জোড়া ২০০০ হইতে ৫০০০ পর্য্যন্ত বই নয়। আলোয়ানের গজও সাধারণতঃ ১২ দ্বাদশ মুদ্রার অধিক নহে।

অনেকে মনে করিতে পারেন, কাশ্মীরী ছাগলের লোমেই শাল হয়। প্রত্যুত তাহা নহে। এখানকার ছাগলের লোমে কেবল লুই প্রভৃতি সামান্য ঊর্ণা-বস্ত্রমাত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। যে লোমে শাল হয়, উহা উত্তর ভাগস্থ লদাখ্, তিব্বত, ইয়ারকন্দ প্রভৃতি স্থান হইতেই আইসে। তত্রত্য শাল-ছাগ আকারে বৃহৎ নহে এবং উহার সমুদয় গাত্রলোমেও পশ্মিনা* হয় না। যে পশম অর্থাৎ লোম ঠিক চর্ম্মের উপরিভাগে থাকে এবং যাহা অতি সূক্ষ্ম, কেবল তাহা হইতেই পশ্মিনা উৎপন্ন হয়। দেশভেদে ও জলবায়ুর তারতম্যানুসারে পশ্মিনা-

* শাল, জোড়া, জামেয়ার, রুমাল, গলাবন্ধ, আলোয়ান প্রভৃতি যে সমুদয় সূক্ষ্ম দ্রব্য পশম হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাদিগের সাধারণ নাম পশ্মিনা। লুই প্রভৃতি সামান্য ও স্থূল ঊর্ণ-বস্ত্র ইহার অন্তর্গত নহে।

ছাগের পশমের ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। কারণ, যে সমুদয় তিব্বতীয় বা অপর স্থানীয় ছাগ এখানকার উপত্যকায় বা পর্ব্বতে প্রতিপালিত, তাহাদের পশম তত উৎকৃষ্ট নহে। ঐ পশম দ্বিপ্রকার—প্রথম শ্বেত। দ্বিতীয় শ্বেতমিশ্রিত ধূসর বর্ণ। শ্বেত পশম অধিক আদরণীয় এবং মূল্যবান্। শেষোক্ত বর্ণকে খোদ্‌রঙ্গি অর্থাৎ নিজ রঙ্গবিশিষ্ট কহে। এই পশমে যে পশ্‌মিনা প্রস্তুত হয়, তাহাতে অপর কোনো রঙ প্রয়োগ করে না এবং তাহার নিজের রঙ্গও কোনোকালে অপনীত হয় না।

পশম কর্ত্তন দৃঢ়কায় পুরুষদিগের কঠিন হস্তের কর্ম্ম নহে। একারণ ইহা কোমলাঙ্গীদিগের কোমল করেই কর্ত্তিত হইয়া থাকে। আবার আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে, বালিকাদিগের কুসুমময় সুকুমার করে ইহা যেরূপ উৎকৃষ্ট হয়, বয়স্থাকামিনীগণের অপেক্ষাকৃত কঠিনতর হস্তে সেরূপ হইতে পারে না। তজ্জন্য বালিকারাই অধিক পশম কাটিয়া থাকে।

যৎকালে ছাগ বা মেষের গাত্রোপরি পশম বিরাজ করে, সেই সময়েই অর্থাৎ কাটিবার পূর্ব্বেই পশম ব্যবসায়ীরা উহার প্রক্ষালন ও পরিষ্করণ প্রভৃতি সমুদয় কার্য্য সমাধা করিয়া লয়। কার্ত্তিক মাসে অর্থাৎ শীত ঋতুর প্রাক্কালে উহাকে পশ্চাল্লিখিত রীত্যনুসারে ধৌত করিয়া কাটিয়া থাকে। যেমন আমাদিগের দেশে বর্ষার বারিধারা সংস্পর্শে তৃণ প্রভৃতি উদ্ভিদ দ্বিগুণ সজীব হইয়া উঠে, তদ্রূপ হিমানীর আগমনে লোমহীন নগ্ন ছাগ ও মেষের গাত্রে অতি নিবিড় ও সুন্দর পশম উদ্গত হয়।

পশম পরিশুদ্ধ করিবার রীতি এইরূপ। প্রথমে মেষকে জলে নিমজ্জিত করিয়া লয়। পরে এক ব্যক্তি বাম হস্ত দ্বারা উহার পশ্চাদ্ভাগস্থ এবং দক্ষিণ হস্ত দ্বারা উহার সম্মুখস্থ পাদ-দ্বয় ধারণ করে। অপর একজন বিপরীত ভাগ হইতে দ্বি-মুষ্টি সমন্বিত অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি এক অস্ত্র লোমের উপর পুনঃ পুনঃ তাড়না করিতে থাকে। এতদ্দারা সংহত লোম বিচ্ছিন্ন এবং সমুদয় অতি পরিষ্কৃত ও উজ্জ্বল হয়। পরে, ছোট বড় লোম ছেদিত হইলে মেষ একবারে নগ্ন হইয়া যায়। ইহাকেই ইংরাজীতে (Shearing the sheep) কহে।

শালবাফী কর্ম্মে আদর্শ-উদ্ভাবক ব্যক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাহাকে নকাশ্ কহে। এ প্রকার লোক অতি অল্পই আছে। ক্রেতাদিগের অভিরুচ্যনুসারে নূতন নূতন আদর্শ উদ্ভাবন করাই নকাশের কর্ম্ম। আদর্শ কাগজে অঙ্কিত করে। পরে যথাস্থলে উপযোগী বর্ণ সন্নিবেশ করিয়া লয়। এইরূপে আদর্শ প্রস্তুত ও তাহা ক্রেতার মনোনীত হইলে গণকের কার্য্য আরম্ভ হয়। ইহা অতি কষ্টসাধ্য। কারণ, গণককে প্রত্যেক রঙ্গের কত তন্তু আবশ্যক. কোন্ বর্ণের তন্তুর পরে অপর কোন্ বর্ণের কত তন্তু চাহি, সমুদয় ঠিক করিয়া গণিয়া দিতে হইবে। গণক ইহা ধার্য্য করিয়া আদর্শানুসারে তন্তুবায়-দিগের উপদেশার্থে ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ডে বা কাগজে এইরূপ লিখিয়া দেয়—১ শ্বেত, ৩ লাল, ১ হরিদ্রা, ২ ঈষৎ নীল, ২ গভীরনীল, ৩ সবুজ ইত্যাদি। অনন্তর শালবাফেরা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে এক ব্যক্তি গুরুমহাশয়ের সর্দ্দার পড়ুয়ার ন্যায় উক্ত আলেখ্য উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতে থাকে এবং উহারা অনন্যমনে শ্রবণ

করতঃ তাহার উপদেশ মতে নানাবিধ রঙের তন্তু প্রয়োগ করিয়া যায়।

বস্ত্র বুনিবার যন্ত্র হইতে পশ্‌মিনার তন্তু ভিন্ন নহে। তন্তু দ্বারা যে শাল প্রস্তুত হয়, তাহাকে "কানি" বা "কানিকার" কহে। কানি কর্ম্ম টুকুরা টুকুরা অংশ রূপে প্রস্তুত করে। পরে সমুদয় একত্র যুড়িয়া দিলেই এক ফর্দ্দ শাল হইয়া যায়। এইরূপে জামেয়ার, রুমাল, পাল্লা ও হাঁসিয়া প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু আলোয়ানের কেবল মাত্র পার্শ্বদেশের (কিনারার) কানিকর্ম্ম, জিঞ্জির (ছোট পাল্লা) অথবা গলাবন্ধ প্রস্তুত করিতে হইলে অগত্যা একবারেই বুনিতে হয়। অপর, বুনিবার সময় সোজা দিক নীচে এবং উল্টা দিক উপরিভাগে রাখিয়া বুনিয়া থাকে অর্থাৎ কার্পেট বুনিবার রীতির ঠিক বিপরীত।

ছুঁচের কর্ম্মকে "আমূলি" বা "আম্‌লিকার" কহে। ইহার নক্সা অর্থাৎ আদর্শ প্রস্তুত হইলে প্রথমে উহা ছিদ্র করিয়া লয়। পরে উহা আলোয়ানের উপর রাখিয়া কালী বা চূর্ণের গুঁড়া সম্বলিত পুঁটলি দিয়া ঘসিয়া দাগ করে। পরে কলম দিয়া সেই সমুদয় চিহ্ন স্পষ্ট অঙ্কিত করিয়া লয়। পঞ্জাবে এরূপ না করিয়া একবারে ছাপ দিয়া থাকে। সূচিকর্ম্ম আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে নানাবিধ রঙ্গ যথোচিত স্থানে সন্নিবেশ পূর্ব্বক গৃহীতা বা ক্রেতার ইচ্ছানুরূপ এক টুকুরা নমুনা প্রস্তুত করে। এই আদর্শ মনোনীত হইলে উক্ত চিহ্নিত আলোয়ানের উপর কর্ম্ম আরম্ভ হয়।

শালবাফদিগের কারু কর্ম্মের ইয়ত্তা নাই। উহাদিগকে

যেরূপ আদর্শ দেখাইবে, উহারা ঠিক তাহাই প্রস্তুত করিতে পারে। কোনো কোনো শালের দুই দিক সমান বুনিয়া থাকে। অর্থাৎ উহার বিপরীত ভাগ বা উল্টা দিক থাকে না —যে দিক দেখ, সেই দিগই সোজা। আবার কোনো কোনো শালের এক দিকে মখমল এবং অপর দিকে কিংখাব বুনিতেও দেখা গিয়াছে।

আলোয়ান মর্দ্দন করাকে " মলিদা " অর্থাৎ মর্দ্দিত কহে। এরূপ করিলে আলোয়ানের অবয়ব হ্রাস হয় বটে, কিন্তু এতদ্দ্বারা উহা কোমল, সুন্দর এবং ঔজ্জ্বল্য বিশিষ্ট হয়। পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিতে হইলে আলোয়ানকে অল্প বা অধিক মলিদা করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

পূর্ব্বে নাগরিক হ্রদের বর্ণনা উপলক্ষে লেখা গিয়াছে, যে, উহার পার্শ্বৈকদেশে পশ্‌মিনা ধৌত করিবার কতিপয় প্রস্তর আছে। পৃথিবীর অপর কোনো স্থলে এখানকার ন্যায় শাল প্রস্তুত না হইবার প্রধান কারণ এই জল এবং অপর কারণ এখানকার নির্ম্মল বায়ু। পূর্ব্ব পূর্ব্ব হিন্দু এবং মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগের দৌরাত্ম্যে অনেক শালবাফ এখান হইতে পলায়ন করিয়া অমৃতসরে গিয়া বাস করিতেছে। তাহারা পূর্ব্বে যে সমুদয় উপকরণ পদার্থ দ্বারা এখানে শাল প্রস্তুত করিত, তথায় সেই সেই উপকরণ এবং সেই সব হস্ত সেরূপ শাল কোনো মতেই প্রস্তুত করিতে পারে না। অপর, অনেক শালবাফ গ্রীষ্ম ঋতুতে এখানে এবং শীতাগমে তথায় গমন পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহও করিয়া থাকে। কিন্তু দেশভেদে তাহাদিগেরও হস্তোৎপন্ন দ্রব্যের বিলক্ষণ গুণবৈষম্য ঘটে। সুতরাং

সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন, যে, কেবল জলবায়ু মাত্রই এরূপ প্রভেদ হইবার কারণ। আবার, এই জলের এমনি গুণ, যে, উহাতে পশ্‌মিনা প্রক্ষালিত হইলে যেমন কোমল ও উজ্জ্বল হইবে, উহা কিয়দ্দূরে ধৌত করিলে তেমন উৎকৃষ্ট না হইয়া বরং অপকৃষ্টই হইয়া দাঁড়াইবে।

লদাখ ও তিব্বত প্রভৃতি স্থান হইতে এক প্রকার পশ্‌-মিনা (আলোয়ান) আনিয়া থাকে। উহা অল্প মূল্যে পাওয়া যায়। কিন্তু কাশ্মীরী পশ্‌মিনার ন্যায় উহা কোমল, সুন্দর ও স্থায়ী নহে। অপর, উহাতে বৃষ্টিজল লাগিলেই দুর্গন্ধ হইয়া থাকে।

মেষলোম ও ছাগের স্থূল লোমে এক প্রকার ঊর্ণা বস্ত্র প্রস্তুত হয়। উহাকে পট্টু কহে। ইহা পশ্‌মিনা অপেক্ষা নিকৃষ্ট বটে, কিন্তু সুন্দর এবং স্থায়ী পশ্‌মিনার ন্যায় ইহার বর্ণ দ্বিবিধ ;—এক শ্বেত এবং অপর খোদ্‌রঙ্গি। শ্বেত পট্টু আবার সবুজ, লাল, প্রভৃতি নানাবিধ রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া বিক্রয় করে। উৎকৃষ্ট শ্বেত পট্টুকে দূর হইতে আলোয়ানের ন্যায় প্রতীয়মান হয় এবং উত্তম রংবিশিষ্ট হইলে পট্টু বলিয়া সহজে বুঝা যায় না। এতদ্দ্বারা কাশ্মীরী প্রভৃতি সকলেই পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া থাকে। প্রত্যেক থান ৮॥০ হইতে ৮৸০ গজ দীর্ঘ এবং এক হস্ত প্রশস্ত। ইহার মূল্য ৪ হইতে ৪৸০ টাকা পর্য্যন্ত। এক এক থানে এক পেণ্টুলন, এক কোট এবং এক ওয়েষ্টকোট অথবা এক পেণ্টুলন এবং এক চাপকান প্রস্তুত হইতে পারে। একারণ, কি ইংরাজ, কি বাঙ্গালী, যাঁহারা কাশ্মীরে ভ্রমণ করিতে আইসেন, তাঁহারাই

ইহার পরিচ্ছদ করিয়া থাকেন। সূত্র ও ঊর্ণ মিশ্রিত করিয়া আর এক প্রকার পট্টু হয়। উহা সর্ব্বাংশে পূর্ব্বোক্ত পট্টুর সদৃশ এবং তদপেক্ষা কোমল। ইহা পোষাকের পক্ষে অতিশয় উপযোগী।

আলোয়ান ও পট্টুর ন্যায় লুই বস্ত্রও তন্তু দ্বারা বুনিয়া থাকে। ইহার মূল্য তিন টাকা হইতে বারো টাকা পর্য্যন্ত। কাশ্মীরীরা দুই তিন বৎসর ধরিয়া নূতন লুই ব্যবহার করে। পরে উহাকে মলিদা করিয়া আপনাপন আলখাল্লা প্রস্তুত করিয়া থাকে। এতদ্দারা উহাদের মিতব্যয়িতার পরিচয়ও পাওয়া যাইতেছে।

পৃথিবীর স্থানে স্থানে যেরূপ দুর্জ্জয় শীত, ঈশ্বর তাহার নিবারণোপযোগী উপকরণও সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন এবং মনুষ্য আপন বুদ্ধি বলে তৎসমুদয় সংকলন পূর্ব্বক উপযোগী শীত বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া লইতেছে। এখানে যেরূপ ভয়ঙ্কর শীত, তাহাতে "পোস্তিন" ব্যতীত উহা কোনোমতেই নিবারণ হইবার নহে। কোনো কোনো জীবের সলোম চর্ম্মে ইহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা আকারে ইংরাজী কোটের সদৃশ; অধিকাংশের আস্তিন অর্দ্ধ; এবং উপরিভাগে অবস্থানুসারে আলোয়ান, কিংখাব বা ছিট যোগ করে। পোস্তিন নানাবিধ। প্রথম, নীলজু। ইহা এক প্রকার ক্ষুদ্র জলচর পক্ষী। ইহার পক্ষ নানা বর্ণের চিত্রে বিচিত্র, সুতরাং দেখিতে অতি সুন্দর। কাশ্মীরীরা ইহার মাংস ভক্ষণ করে। কেবল ইহার শির এবং গ্রীবার চর্ম্মেই পোস্তিন হইয়া থাকে। সুতরাং শত শত নিরপরাধী ক্ষুদ্র প্রাণীর প্রাণ বধ না করিলে আর একটী

পোস্তিন প্রস্তুত হয় না। একারণ, ইহা দুষ্প্রাপ্য এবং মহার্ঘ। এপ্রকার এক একটী পোস্তিনের মূল্য ২০০ হইতে ৫০০ মুদ্রা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়, সোমুর। ইহা এক প্রকার সুন্দর লোম বিশিষ্ট প্রাণীর চর্ম্ম। ইহাও অতি সুদৃশ্য ও সুকোমল। ইহা ইয়র্কন্দ প্রভৃতি স্থান হইতে আইসে। ইহার মূল্য ৫০ হইতে ১৫০ মুদ্রা পর্য্যন্ত।

তৃতীয়, কল্‌হুন্। ইহার অপর নাম উদ্রু বা উদড়্। ইহাকে আমাদের দেশে উদ্বিরাল কহে।

চতুর্থ, উৎগোগ্র্। ইহা ইন্দুর জাতীয় অথবা বাবু অক্ষয়-কুমার দত্ত মহাশয়ের সুপ্রসিদ্ধ চারুপাঠ বর্ণিত বিবর নামা জীবশ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া বোধ হয়। ইহার পোস্তিন দীর্ঘকাল স্থায়ী নহে—ইহার লোম দুই তিন বৎসরের মধ্যেই শিথিল হইয়া যায় এবং দুর্গন্ধ হইয়া উঠে।

পঞ্চম পেরু। ইহা মেষশাবক। ইহার পোস্তিন সর্ব্বা-পেক্ষা স্থায়ী এবং স্বল্প মূল্যেই অর্থাৎ ৫ হইতে ১৫ মুদ্রায় পাওয়া যায়।

নবম পরিচ্ছেদ।

কেশর বা জাফ্রান্।

কাশ্মীর প্রদেশে যে জাফ্রান্ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা পৃথিবীর সমুদয় স্থানাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। একারণ, জাফ্-রাণের অপর নাম "কাশ্মীরজ" এবং "কাশ্মীর-জন্ম।" ইহা উপত্যকার সর্ব্বত্র জন্মে না। কেবল মাত্র পূর্ব্বভাগস্থ পাম্পুর নামক স্থানের নদীতটস্থ কিয়দংশে জন্মিয়া থাকে। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, শ্রীনগর হইতে পাম্পুর স্থলপথে চারি ক্রোশ। কিন্তু বিতস্তার গতি অতি বক্র এবং উজান আসিতে হয় বলিয়া নৌকায় গেলে ছয় সাত ঘণ্টা লাগে।

পাম্পুরের যেস্থানে জাফ্রান্ জন্মিয়া থাকে, উহা সুবি-স্তৃত ও উচ্চ। ইহার এক পার্শ্ব দিয়া বিতস্তা নদী প্রবাহিত হইতেছে এবং অপর দিকে গিরিমালা দণ্ডায়মান আছে। এস্থানের মৃত্তিকা ঈষৎ পীতবর্ণ এবং কঙ্করের ন্যায় কঠিন।

জাফ্রাণের ক্ষেত্র সংস্করণ, বীজবপন, পুষ্পোদ্গমন, জাফ্রাণাহরণ জাফ্রান্ তৃণ প্রভৃতি সমুদয়ই অতি বিচিত্র। সুতরাং একাদিক্রমে ইহাদের সবিশেষ বর্ণনা করা যাইতেছে।

প্রথম, ক্ষেত্র সংস্করণ। আমাদের দেশের পটল বুনিবার ক্ষেত্রের ন্যায় ইহা প্রস্তুত করে; কিন্তু উহার সদৃশ কেবল দীর্ঘ আলি ও দীর্ঘ প্রণালী বিশিষ্ট নহে। ইহা ৫ বা ৬ ফিট

পরিমাণের সমচতুষ্কোণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে পূর্ণ। শীঘ্র জল অপসৃত হইবার জন্য প্রত্যেক খণ্ডের মধ্যদেশ ঈষৎ উচ্চ ও চতুঃপার্শ্ব ঈষৎ ঢালু এবং পরস্পরের মধ্যে ন্যূনাধিক দেড় পাদ পরিমিত প্রণালী আছে। প্রতি বৎসর সব ঐ ভূ-খণ্ডের উপরিভাগ অল্প পরিমাণে খুসিয়া দিতে হয়—নচেৎ হল চালনা, সার দান বা অন্য কোনো প্রকার সংস্করণই করিতে হয় না। পরে প্রকাশ করা যাইবে, যে, বীজ বপনেরও প্রয়োজন নাই। সুতরাং একবার কেয়ারি সমুদয় প্রস্তুত হইলে অল্প বা বিনা পরিশ্রম ও ব্যয়ে অনেক বৎসর পর্য্যন্ত জাফ্রান্ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়, বীজ বপন। ইহার বীজ দেখিতে রসুনের মত। এই বীজ বপন করিতে হয় না—প্রথম রোপিত বীজ আধুনিক কাল পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। সর্ব্বাদৌ যে কোন্ পুরুষ ইহা রোপণ করেন, তাহা কোনো ইতিবৃত্তপাঠে অবগত হওয়া যায় না। মুসলমান কৃষাণেরা এতৎসম্বন্ধে আপনাদের প্যাগম্বরের গুণগান সহকৃত অনেক কল্পনা জল্পনা করিয়া থাকে। প্রত্যুত, ইহা যে ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা ও মহিমার নিদর্শন, তাহার সন্দেহ নাই। অতি প্রাচীনকাল হইতে ঈশ্বর যে প্রথম বীজ সংলগ্ন করিয়া দিয়াছেন, অদ্যাবধি তাহা হইতেই জাফ্রান্ উৎপন্ন হইয়া আসিতেছে। এক এক বীজের উৎপাদিকা শক্তি দশ হইতে পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত অবিকৃত থাকে। পরে উহা অকর্ম্মণ্য হইয়া গেলে উহার স্থানে আর একটী আপনা হইতেই জন্মে।

তৃতীয়, পুষ্পোদ্গমন। বীজ হইতে যে অঙ্কুর উদ্গত হয়,

উহার অগ্রভাগে পুষ্প বিকসিত হইয়া থাকে এবং প্রত্যেক অঙ্কুরে কেবল এক একটী পুষ্পমাত্র উদ্গত হয়; কিন্তু এক এক বীজ হইতে চারিটীর অধিক অঙ্কুর হয় না। সুতরাং পুষ্পও চারিটীর অতিরেক দেখা যায় না। অঙ্কুর সমুদয় ভূমি হইতে ন্যূনাধিক ৫ বা ৬ ইঞ্চ উন্নত হইয়া থাকে। এই সঙ্গে মূলদেশ হইতে যে তৃণ জন্মে, উহাও পুষ্প প্রস্ফুটিত হইবার কালে উক্ত পরিমাণে উন্নত হয়। পুষ্প ষট্‌দল বিশিষ্ট এবং ইহার বর্ণ ঈষৎ নীল। প্রত্যেক পুষ্পে ছয়টী করিয়া কেশর হয়। ইহাকেই কেশর বা জাফ্‌রান্‌ কহে। এতন্মধ্যে তিনটী ঘোর রক্তিমা বর্ণ এবং ইহাই আস্‌লি অর্থাৎ প্রকৃত জাফ্‌রান্‌। অপর তিনটী কেশর বাসন্তী অর্থাৎ পীত বর্ণ। ইহাকে নকৃলী অর্থাৎ কৃত্রিম জাফ্‌রান্‌ কহে। ইহা প্রকৃত কেশর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ স্থূল ও ক্ষুদ্র।

প্রকৃত রসাল কেশর চর্ব্বণ করিলে আস্য মণ্ডল রমণীয় গন্ধে পূর্ণ হইয়া যায় এবং বোধ হয়, যেন তাম্বুল চর্ব্বন করিতেছি। কোনো কোনো কাশ্মীরী কবি তিন রক্তিমা কেশরকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এবং তিন পীত কেশরকে তাঁহাদের ভার্য্যা এবং ষট্‌দলকে ছয় জনের সিংহাসন রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনা অসঙ্গত নহে!

পুষ্প প্রস্ফুটিত হইলেই চয়ন করে। একবার সংগৃহীত হইলে তৃতীয় বা চতুর্থ দিবসে পুনর্ব্বার উদ্গত ও বিকসিত হইয়া থাকে। এইরূপ প্রত্যেক অঙ্কুর হইতে একাদিক্রমে চারি বা পাঁচবার পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া তিন সপ্তাহের মধ্যেই পুষ্পোদ্গমন শেষ হইয়া যায়।

কার্ত্তিক মাসের প্রারম্ভেই পুষ্প বিকসিত হইতে থাকে। তখন ক্ষেত্রের শোভা অতি বিচিত্র। বিশেষতঃ সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে যখন উহাদের উপর শিশির-বিন্দু পতিত হয়—যখন দিবাকরের প্রখর কর দ্বারা উহাদের কমনীয় কান্তি ম্লান হয় নাই—যখন কৃষাণদিগের নৃশংস হস্তে কেহ বৃন্তচ্যুত হয় নাই—তখন দেখিতে যে কি রমণীয়, তাহা প্রকাশ করিবার শব্দ নাই! দুই ক্রোশ স্থান পর্য্যন্ত যে দিকে নয়নপাত কর, কেবলই মনোহর পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে; উহা ভূমির উপর হইতে অধিক উন্নত নহে, কেবল পাঁচ ইঞ্চ্ মাত্র উচ্চ—লঘু তৃণও লক্ষিত হইতেছে না—দেখিলে বোধ হয়, যেন নীল বর্ণের ভূমিচম্পক (ভূঁই চাঁপা) ফুটিয়া রহিয়াছে। প্রত্যুত, জাফ্রাণের পুষ্প কাশ্মীরের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে একটী অত্যুৎকৃষ্ট।

চতুর্থ, জাফ্রাণাহরণ। পুষ্প ফুটিলেই কৃষাণেরা উত্তোলন করিতে আরম্ভ করে। পরে হস্ত দিয়া ঝাড়িলেই পুষ্পদল স্বতন্ত্র হইয়া যায়। কিন্তু লাল ও পীত কেশর একত্রে থাকে। ব্যবসায়ীরা ইহাদিগকে পৃথক করে না। বরং কেহ কেহ পীত কেশর রক্তিমা বর্ণে বা রক্তিম কেশরের জলে রঞ্জিত করিয়া উভয়কেই প্রকৃত জাফ্রাণাকারে বিক্রয় করিয়া থাকে। সে যাহা হউক, ইহাদ্দিগকে স্বতন্ত্র করিতে হইলে জলপূর্ণ পাত্রে নিক্ষেপ করে। তখন লাল অর্থাৎ প্রকৃত কেশর আপনা হইতেই তলদেশে নিমগ্ন হয় এবং পীত অর্থাৎ কৃত্রিম কেশর উপরিভাগে ভাসিতে থাকে। পরে আতপ তাপে উভয়কেই শুষ্ক করিয়া লয়।

পঞ্চম, জাফ্‌রান্ তৃণ। পুষ্পোদ্গমন শেষ হইয়া গেলে তৃণ বাড়িতে থাকে। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, যে, যৎকালে পুষ্প বিকসিত হয়, তখন তৃণ অঙ্কুর অপেক্ষা উন্নত হয় না। কিন্তু পুষ্প বিকসিত হইয়া গেলেই উহা বাড়িতে আরম্ভ করে। এই তৃণের এমত গুণ, যে, গাভীগণ ইহা ভক্ষণ করিয়া যে দুগ্ধ দেয়, উহা হইতেও জাফ্‌রাণের সুগন্ধ বাহির হইয়া থাকে এবং এই দুগ্ধে অতি উৎকৃষ্ট ঘৃত প্রস্তুত হয়। একারণ, পাম্‌পুরের দুগ্ধ ও ঘৃত যেমন অত্যুত্তম ও সুস্বাদু, কাশ্মীরের কুত্রাপি তদ্রূপ নহে। অপর, সেই সুরভি তৃণভোজী মেষের মাংস ও সুমধুর। অধিক কি, জাফ্‌রান্‌ক্ষেত্রের সমীপস্থ ভূমিতে যে সমুদয় ফল মূলাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে, তত্তাবৎ অপরাপর স্থানাপেক্ষা অধিকতর রসাল ও মিষ্ট!

ষষ্ঠ, জাফ্‌রাণের ব্যবহার। কাশ্মীরী পণ্ডিত মাত্রেই ইহার দীর্ঘ তিলক সেবন করেন। পলান্ন, মাংস ও অপরাপর রন্ধনে—কি প্রধান, কি ইতর ব্যঞ্জন মাত্রেই জাফ্‌রান্ দিলে যে তাহা সুগন্ধ ও সুস্বাদু হইয়া থাকে, তাহা আমি কি বলিব, পাঠক মহাশয়েরা তাহা বিলক্ষণ অবগত আছেন।

স্বর্গগত মহাত্মা সার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরকৃত সুপ্রসিদ্ধ শব্দকল্পদ্রুমে জাফ্‌রান্ সম্বন্ধে লিখিত আছে ;—

" কুঙ্কুমং দেশভেদে ত্রিবিধং। যথা

১। কাশ্মীরদেশজে ক্ষেত্রে কুঙ্কুমং যদ্ভবেদ্ধি তৎ।
সূক্ষ্মকেশরমারক্তং পদ্মগন্ধি তদুত্তমং॥

২। বাহ্লীকদেশসংজাতং কুঙ্কুমং পাণ্ডুরং ভবেৎ।
কেতকীগন্ধযুক্তং তন্মধ্যমং সূক্ষ্মকেশরং॥

৩। কুঙ্কুমং পারসীকেয়ং মধুগন্ধি তদীরিতং।
ঈষৎপাণ্ডুরবর্ণং তদধমং স্থূলকেশরং॥

অস্য গুণাঃ।

সুরভিত্বং। তিক্তত্বং। কটুত্বং। উষ্ণত্বং।
কাস, বাত, কফ, কণ্ঠরোগ, মূর্দ্ধশূল, বিষদোষনাশিত্বং।
রোচনত্বং। তনুকান্তি করত্বঞ্চ। ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ।
রোচকত্বং। বিবর্ণতা কণ্ডুনাশিত্বঞ্চ। ইতি রাজবল্লভঃ।
স্নিগ্ধত্বং। শিরোরুগ্ব্রণ, জন্তু, বমি ব্যঙ্গ দোষ ত্রয়াপহত্বং।
বল্যত্বঞ্চ। ইতি ভাবপ্রকাশঃ।
ত্বগ্দোষ নাশিত্বং। ইতি রত্নাবলী।

দশম পরিচ্ছেদ—পরিশিষ্ট।

পর্য্যটকদিগের প্রতি উপদেশ।

যদি কোনো পাঠক এই সামান্য পুস্তক পাঠে স্বর্গসম কাশ্মীর দর্শন করিবার জন্য উৎসুকচেতা হয়েন, তাঁহার সুবিধা ও সৌকর্য্যার্থ ভুক্তভোগীর বহুদর্শন জনিত কতিপয় উপদেশ বাক্য এস্থলে অপ্রযুজ্য হইবে না। যদিও এই পুস্তকের স্থানে স্থানে বিশেষতঃ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে পথের বিবরণে কিয়ৎ পরিমাণে এরূপ উপদেশাদি আছে, তথাপি এক স্থানে কাজের কথা সমস্ত সন্নিবেশ করা আবশ্যকবোধে এই পরিশিষ্ট অধ্যায় লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

কলিকাতা হইতে লাহোর দিয়া কাশ্মীর যাইতে হইলে "জম্বু ও বন্‌হাল পথ" এবং "ভিম্বর পথ" উপাদেয়। যদি কোনো পর্য্যটক জম্বু দেখিবার মানস করেন, তিনি তথায় আসিয়া মহারাজার সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারেন। বন্‌হাল পথে যাইতে হইলে মহারাজার বিশেষ আজ্ঞা আবশ্যক বটে, কিন্তু বাঙ্গালীদিগের প্রতি কোনো নিষেধ নাই। অপিতু যদিও সমুদয় পথে ভ্রমণকারীদিগের কষ্ট নিবারণ ও সুখোৎপাদনের জন্য মহারাজার কর্ম্মচারীরা নিযুক্ত আছে, তথাপি সর্ব্বপ্রকার সুখের নিমিত্ত মহারাজার বা প্রধান সচিবের পরোয়ানা সংগ্রহ

সমগ্র পথের প্রত্যেক আড্ডাতেই উত্তম বাসগৃহ এবং মঞ্জী (চারপাই) পাওয়া যায়, তথাপি কাশ্মীর উপত্যকার সর্ব্বত্র সুখে ভ্রমণ করিবার জন্য এক ক্ষুদ্র শিবির (Hill-tent অথবা shiouldari) এবং শিবির চারপাই (Camp-bed) সঙ্গে লওয়া উচিত। আবার, যদিও প্রত্যেক আড্ডাতেই চাউল, আটা, ঘৃত, দুগ্ধ, ছাগ প্রভৃতি আহারীয় দ্রব্য পাওয়া যায়, তথাপি রন্ধনোপযোগী চূর্ণ মসলা, মুগ প্রভৃতি দ্বিদল এবং কিছু আলু (পথে কোনো প্রকার তরকারি পাওয়া যায় না) সমভিব্যাহারে রাখা অত্যন্ত আবশ্যক। কিছু শীত বস্ত্র এবং বৃষ্টি হইতে পরিত্রাণার্থ (Water-proof-cloth) কোনোরূপ বস্ত্রবিশেষ সঙ্গে লওয়াও নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ভ্রমণকারীদিগের এটী স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, যে, পথ দুর্গম ও পার্ব্বত্য। সুতরাং অপরিহার্য্য নিতান্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য সম্ভার যতই অল্প লইতে পারেন, অর্থাৎ ভার যতই লঘু হয়, ততই উত্তম।

প্রত্যেক আড্ডাতেই ঝাঁপান ও ভারবাহী পাওয়া গিয়া থাকে; কিন্তু সাহাবাদ ও বন্‌হাল নামক স্থানদ্বয়ের ঝাঁপান-বাহকেরা সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ় ও পার্ব্বত্য পথের সম্যক্ উপযোগী। জম্মুতে উত্তীর্ণ হইয়া কোনো উপায়ে ইহাদিগকে বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারিলে বড় ভাল হয়।

বাহকেরা সাধারণতঃ এক আড্ডার অধিক গমন করে না। প্রত্যেক আড্ডাতে নূতন নূতন যান ও বাহক নিযুক্ত করিতে হয়। একারণ, এক আড্ডাতে পৌঁছিয়াই অগ্রবর্ত্তী আড্ডার বন্দোবস্ত জন্য একজন চতুর ভৃত্যকে অগ্রে প্রেরণ করা

আবশ্যক। তাহা হইলে পর্য্যটককে সেখানে গিয়া কোনো বিষয়ের নিমিত্তই প্রতীক্ষাজনিত ক্লেশ পাইতে হয় না।

পথে সর্ব্বত্রই ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের মুদ্রা চলিয়া থাকে। পাহাড়ীরা নোট কখনো চক্ষেও দেখে নাই, সুতরাং কেহই লয় না।* একারণ, কেবল নগদ টাকা মাত্র এবং কিছু আধুলি, সিকি ও দুয়ানি সঙ্গে রাখা আবশ্যক।

মণ্টগোমারি সাহেবের "কাশ্মীর রুটম্যাপ" এবং "জম্বু ও কাশ্মীর ম্যাপ" এই দুইখানি মানচিত্র এবং কাশ্মীরের বিবরণ ও ভ্রমণ সম্বন্ধীয় দুই একখানি পুস্তক সঙ্গে রাখা নিতান্ত আবশ্যক। একজন চতুর পথপ্রদর্শক সঙ্গে থাকিলে পুরোবর্ত্তী পথের অবস্থা এবং জ্ঞাতব্য বিষয়াদির জ্ঞান সংগ্রহ পক্ষে অনেক উপকার হয়। সুদক্ষ বাহক এবং উপত্যকার সুচতুর নাবিকদিগের দ্বারা এ কার্য্য উত্তমরূপে সমাধা হইয়া থাকে।

কোনো আড্ডা হইতে প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে অতি প্রত্যূষে স্নান ও আহার করিয়া লওয়া উচিত। যদিও পথি মধ্যে মনোহর উৎস ও নির্ঝরিণীর নির্ম্মল জলে প্রীতিকর স্নান হইতে পারে বটে, কিন্তু আহার প্রস্তুত করিবার অনুকূল স্থান নাই। এতদ্ব্যতীত "জলখাবার" নিমিত্ত কিছু বেদানা, বাদাম, পেস্তা, কিস্‌মিস্‌ অথবা রুটী, হালুয়া প্রভৃতি (প্রস্তুত করিয়া) প্রতিদিন সঙ্গে রাখা আবশ্যক।

ভ্রমণকারীরা অশ্ব বা ঝাঁপান, যে যান আরোহী হউন, দুর্গম পথে এবং কাষ্ঠ নির্ম্মিত সেতুর উপর দিয়া যাইতে

---

* কাশ্মীর উপত্যকায় সকলেই নোট সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকে।

হইলে যান হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক পদব্রজে গমন করাই পরামর্শ; নচেৎ প্রাণনাশ হইবার সম্ভাবনা। যদি তাঁহাদের সমভিব্যাহারে কোমলাঙ্গিনীরা থাকেন, তাহা হইলে আপনাদের বাহকদিগকে তাঁহাদের ঝাঁপানে নিযুক্ত করিয়া আপজ্জনক স্থান সমূহ অতি সাবধানে বাহিত করাই শ্রেয়ঃ। পাহাড়ে ঝাঁপান দ্বারা উত্থান করিতে হইলে পশ্চাদ্ভাগে মুখ ফিরাইয়া উঠিতে এবং অবতরণ কালে সোজা হইয়া অর্থাৎ সম্মুখের দিকে মুখ করিয়া নামিতে হয়। তাহা হইলে আরোহণ ও অবরোহণের বিশেষ কষ্ট হয় না।

শ্রীনগরের পর্য্যটকদিগের জন্য মহারাজা অনেক উত্তম বাঙ্গালা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু ইংরাজদ্বারা সর্ব্বদা পূর্ণ—একটীও প্রায় শূন্য পাওয়া যায় না। নগরাভ্যন্তরে অনেক বাটী ভাড়া পাওয়া যায়। কিন্তু নগর অতি মলিন, সুতরাং বাসোপযোগী নয়। নৌকা বাসই অতি প্রীতিকর। এতদ্ভিন্ন শিবির স্থাপনোপযোগী অনেক উৎকৃষ্ট ভূমি আছে। সুতরাং সঙ্গে একটী শিবির থাকিলে 'বেদের টোলের' মত বাস করিয়া সমুদয় মনোহর স্থান অতি সুখে ও স্বাধীনতায় দেখা যাইতে পারে।

কাশ্মীর রাজ্যে প্রথম উপস্থিত হইয়াই পর্য্যটক রাজকীয় শাসন প্রণালী ও লোকদিগের আচার ব্যবহার আপনাদিগের সে সব হইতে বিষম দেখিয়া ব্যথিত-হৃদয় হইতে পারেন। কিন্তু তাঁহার এটী স্মরণ করা আবশ্যক, যে, তিনি যে প্রদেশে পদচারণা করিতেছেন, তথাকার লোক অপেক্ষাকৃত অজ্ঞ ও অসভ্য এবং তথাকার শাসনকর্ত্তা সম্পূর্ণ স্বাধীন,

প্রভূত প্রতাপশালী এবং কিয়দংশে স্বেচ্ছাচারী। সুতরাং পর্য্যটকের চরিত্র যেন কোনোরূপ দোষাবহ এবং প্রজা-পীড়ক না হয়। যদিও এস্থলে ইন্দ্রিয়সুখাভিলাষ চরিতার্থ করিবার অনেক অনুকূল পদার্থ আছে, কিন্তু ইন্দ্রিয়সংযম করাই মানুষের কাজ। অনেকে ইন্দ্রিয় দমনে অসমর্থ হইয়া নানা পাপাচরণ বশতঃ অবশেষে অপমানিত ও কাশ্মীর রাজ্যের সীমা হইতে দূরীভূত হইয়াছেন!

ভ্রমণকারীদিগের উপদেশ ও শাসনার্থ পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট যে কয়েকটী নিয়ম প্রচলিত করিয়াছেন, তাহার কতিপয় প্রয়োজনীয় ধারার অভিপ্রায় এস্থলে অনুবাদ করিয়া দেওয়া আবশ্যক বোধ হইতেছে। যথা;—

১। কাশ্মীরে যাইবার কেবল * চারিটী প্রকাশ্য রাজ-পথমাত্র আছে। বন্‌হাল পথ দিয়া যাইতে হইলে কাশ্মীরা-ধিপতির আজ্ঞাপত্র বিনা কেহই যাইতে পারে না। সিমলা পাহাড় হইতে শৈলশ্রেণী দিয়া যে পথ আছে, তদ্দ্বারা যাইতে হইলে পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের বিশেষ আজ্ঞা আবশ্যক।

৩। এক আড্ডা হইতে অপর আড্ডা পৌঁছিয়াই বাহক-দিগের মজুরি চুকাইয়া দিতে হইবে। ভার-বাহকদিগের ভার ২৫ সের এবং ভারবাহী অশ্ব বা অশ্বতরীদিগের ভার দুই মণের অধিক হইবে না।

৪। কোনো আড্ডাতে উপস্থিত হইয়া তদ্দণ্ডেই ভারবাহী পাওয়া যায় না। দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে বাহকদিগকে সংগ্রহ করিতে হয়। একারণ, প্রতীক্ষাজনিত ক্লেশ নিবারণ করিবার

* এই পুস্তকের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ দেখ।

উদ্দেশে অগ্র হইতে পুরোবর্ত্তী আড্ডাতে সংবাদ প্রেরণ করা আবশ্যক।*

৮। পথিমধ্যে থানাদার, কোতোয়াল প্রভৃতি মহারাজার কর্ম্মচারী বা প্রজাদিগের উপর কেহ কোনো অত্যাচার করিবেন না। উহারা যে বিষয়ের যে মূল্য প্রার্থনা করিবে, তদ্দণ্ডে তাহা দিতে হইবে। যদি কোনো কিছুতে মূল্য অধিক লয়, তাহা হইলে পর্য্যটক শ্রীনগরস্থ আফিসর অন্ স্পেশিয়েল ডিউটী নামক কর্ম্মচারীকে জানাইয়া প্রতীকার প্রার্থনা করিবেন।

১১ এবং ১২। যদি কোনো স্থলে মহারাজার কর্ম্মচারী, সিপাহী বা প্রজাদিগের সহিত পর্য্যটকদিগের কোনো বিবাদ বিসম্বাদ অথবা মানহানিকর ব্যাপার ঘটে, তাহা হইলে তাঁহারা কোনোমতেই আপন হস্তে আইন বা শাসন ভার লইবেন না। তথাকার প্রধান কর্ম্মচারীকে এ বিষয় জানাইবেন এবং শ্রীনগরস্থ উক্ত ইংরাজ আফিসরকে তৎক্ষণাৎ সংবাদ করিবেন। তাহা হইলেই প্রতীকার হইবে।

১৪। পর্য্যটকেরা কাশ্মীরে উপনীত হইয়া মনে রাখিবেন, যে, তাঁহারা এক স্বাধীন রাজার রাজ্যে আসিয়াছেন। সুতরাং, কোনো স্থলে মহারাজা, তৎপুত্র, তৎকুটুম্ব অথবা তাঁহার কোনো প্রধান কর্ম্মচারীদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহারা

* ইহার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বেলাবেলি কোনো আড্ডাতে পৌঁছিয়া তথাকার কর্ম্মচারীকে সংবাদ করিলে সে সাধারণতঃ পরদিন প্রাতঃকালে সমুদয় বন্দোবস্ত করিয়া দেয়। এক দিবসে দুই আড্ডা অর্থাৎ শীঘ্র শীঘ্র গমন আবশ্যক হইলে উপরোক্ত নিয়ম প্রতি দৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

তাঁহাদিগকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিবেন এবং সর্ব্বদা তথাকার নিয়ম ও ব্যবহারানুসারে চলিবেন।

১৫। কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তার অনুমতি ও আজ্ঞাপত্র বিনা কেহই আপনাদিগের সমভিব্যাহারে কোনো কাশ্মীরীকে কাশ্মীর সীমার বাহিরে লইয়া যাইতে পারিবেন না।*

১৬। পর্য্যটকেরা কাশ্মীর পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে সমুদয় লেনা দেনা অবশ্যই নিকাশ করিবেন এবং তাঁহাদিগের অনুচরবর্গ ঋণ পরিশোধ করে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

১৮। শুনা গিয়াছে, কোনো কোনো ব্যবসায়ী কাশ্মীর গবর্ণমেণ্টের মাশুল হইতে নিস্তার পাইবার জন্য ভ্রমণকারীদিগের দ্রব্যের সহিত গোপন ভাবে অনেক মাল মিশাইয়া দেয়। একারণ, জানানো যাইতেছে, যে, এ প্রকার অসদ্ব্যবহার ধরা পড়িলে ফৌজদারী আইন মতে উভয় পক্ষের যথোচিত শাস্তি হইবে।†

---

* কাশ্মীর যাইয়া অনায়াসে কাশ্মীরী ভৃত্য নিযুক্ত করা যাইতে পারে। তাহাদিগকেও কাশ্মীর রাজ্যের বাহিরে আনিতে হইলে আজ্ঞাপত্র নিতান্ত আবশ্যক। ভার ও পাল্কী বাহকদিগের পক্ষে এই ধারা প্রয়োগশীল নহে। কারণ, তাহারা যে আপনা হইতেই শীঘ্র প্রত্যাগমন করিবে, তদ্বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। এস্থলে পাঠকদিগকে স্পষ্টাক্ষরে বলা উচিত, যে, কাশ্মীর হইতে কোনো রমণী লইয়া আসা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কয়েক বৎসর হইল, একজন ইউরোপীয় এক রমণীকে প্রচ্ছন্ন বেশে লইয়া আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে ধৃত হইয়া তিনি অশেষ প্রকারে অপমানিত, প্রতারিত এবং ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট দ্বারা লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন এবং তিনি আর কোনো কালে উপত্যকায় প্রবেশ করিতে পারিবেন না, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এমন আজ্ঞা প্রচার করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং পর্য্যটকেরা যেন আপনাদের উষ্ণ মাথা হেঁট না করেন এবং আপনাদের পায়ে আপনারাই কুঠার না মারেন—এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকিবেন।

† কাশ্মীর হইতে প্রত্যাগমন কালে সকল পথে নির্দ্দিষ্ট স্থানে এক এক জন

২০। যদি কেহ এই সমুদয় নিয়মের একটীও উল্লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে আফিসর অন্ স্পেশিয়েল ডিউটী পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টকে রিপোর্ট করিবেন।

২১। যদি কেহ অত্যুৎকট অসভ্যতাচরণ, অথবা কাশ্মীর রাজ্যের নিয়ম লঙ্ঘন এবং তথাকার আচার ব্যবহারের বিপরীতাচরণ, অথবা অন্য কোনো অকর্ম্ম করেন, তাহা হইলে আফিসর অন্ স্পেশিয়েল ডিউটী তদ্দণ্ডেই কাশ্মীর রাজ্যের সীমা হইতে তাহাকে দূর করিয়া দিবেন।

করিয়া মহারাজার কর্ম্মচারী পথিকদিগের দ্রব্যাদির তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া থাকে। যদি প্রকাশ পায়, যে, উহার মধ্যে বিনা মাশুলে কাশ্মীরজাত কোনো দ্রব্য (পশ্মিনা, জাফ্রান্ প্রভৃতি) নীত হইতেছে, তাহা হইলে পর্য্যটকদিগকে অপমানিত হইতে এবং অধিক মাশুল দিয়া যাইতে হয়। ইহার প্রতি সকলের দৃষ্টি রাখা নিতান্ত আবশ্যক।

সমাপ্ত।

তৃতীয়। ভিম্বর ও পুঞ্চপথ

লাহোর এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে আসিতে হইলে এই পথও প্রশস্ত। কিন্তু বন্‌হাল পথের ন্যায় ইহা অতি দুর্গম্য। বিশেষতঃ কেহুটা হইতে উড়ী আড্ডা পর্য্যন্ত অতিশয় দুর্গম। ইহা কোনো কালে বরফে বন্ধ হইয়া যায় না। সুতরাং কার্ত্তিক মাসের প্রারম্ভ হইতে বৈশাখের শেষ পর্য্যন্ত যখন পীরপঞ্জাল পথ তুষারজন্য অগমনীয় হইয়া উঠে, তখন এই পথ দিয়া গতায়াত করা পরামর্শসিদ্ধ।* ভিম্বর হইতে থন্নামণ্ডী নামক আড্ডা অতিক্রম পূর্ব্বক প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ আসিয়া বামদিগে এই পথ প্রাপ্তব্য। রতনপীর ও হাজীপীর নামক দুই পর্ব্বতের মধ্য ভাগস্থ রাজ্য পুঞ্চাধিপতি রাজা মতিসিংহের শাসনাধীন। ইনি মহারাজা গোলাব সিংহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজা ধ্যান সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র। ধ্যান সিংহের মৃত্যুর পর গোলাপ সিংহ আপনার এই রাজ্যাংশের স্বত্ব ত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাকে ইহার শাসনকর্ত্তা করিয়া দেন। ইনিও পর্য্যটকদিগের সবিশেষ তত্ত্বাবধারণ করিয়া থাকেন এবং আপন রাজ্যের সমুদায় আড্ডাতে উত্তম বিশ্রামগৃহ ও উপাদেয় দ্রব্যাদি আয়োজন করিয়া রখেন।

৬। থন্নামণ্ডী হইতে সুরন—১৬ মাইল।

থন্নামণ্ডী হইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ আসিয়া এই পথ

---

* ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী পাঁচ আড্ডার বৃত্তান্ত (ভিম্বর হইতে থন্নামণ্ডী) দ্বিতীয় পথ বর্ণনায় লিখিত হইয়াছে।

বাম দিগে গমন করিয়াছে এবং পীরপঞ্জাল পথ দক্ষিণ দিকে গিয়াছে। কিয়দ্দূর যাইয়া রতনপীরে উঠিতে হয়। ইহার চড়াই ও উতরাই দুর্গম নহে। পরবর্ত্তী পথ অতি গভীর ও সংকীর্ণ স্থান দিয়া গিয়াছে। ইহার উভয় পার্শ্বে অতি বিজন অরণ্যময়। ইহার প্রান্ত ভাগে এক ক্ষুদ্র নির্ঝরিণীকে অনেকবার অতিক্রম করিতে হয়। পরে সুরন্‌-নদীর গর্ভে প্রবেশ করা আবশ্যক। এইনদী এই স্থানে ন্যূনাধিক তিন শত হস্ত প্রশস্ত এবং ইহার উভয় পার্শ্বে সরল ও অত্যুচ্চ পর্ব্বতমালা দণ্ডায়মান। উত্তর ভাগস্থ গিরিশ্রেণী অবিরল তরুরাজিপূর্ণ এবং দক্ষিণ ভাগের শৈলমালা পরম শোভায়মান দূর্ব্বাদলাচ্ছন্ন। নদীগর্ভে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই নদী পার হইতে হয়। ইহাতে একটীও সেতু নাই। কিন্তু জলোচ্ছ্বাস না হইলে পার হওয়া ভয়ের বিষয় নহে। কিয়দ্দূরে বিফ্লিয়াজ নামক পল্লী। ইহা পর্ব্বতের গাত্রে স্থিত বলিয়া দূর হইতে অতি সুন্দর দেখায়। অনন্তর অবশিষ্ট পথ উক্ত নদী-গর্ভ দিয়া গমন করিয়াছে। ইহা সাধারণতঃ অতি সরল ও সমতল, একারণ অতি সুগম। কেবল নদীর জল বৃদ্ধি হইলেই কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধদেশ দিয়া গমন করিতে হয়। পথ প্রথমে চারি মাইল পর্য্যন্ত নদীর দক্ষিণ তট দিয়া গিয়াছে। পরে সুরণের প্রায় সার্দ্ধ দুই মাইল থাকিতে ইহাকে পদব্রজে পার হইয়া ইহার বাম তট দিয়া যাইতে হয়।

সুরন্‌ একটী ক্ষুদ্র পল্লী এবং সুরন্‌ নদীর বাম তটে স্থিত। এখানে পথিকদিগের বিশ্রামের জন্য মৃত্তিকা ও প্রস্তরের গৃহ আছে।

৭। সুরন হইতে পুঞ্চ—১৪ মাইল।

এই পথও অতি সুগম এবং সুরন নদীর গর্ভবাহী। সুরন পল্লী পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে এই নদী পার হইতে হয়। এস্থলেও কোনো সেতু নাই। পরে উক্ত নদীর দক্ষিণ তট দিয়াই পথ। এ পথ সর্ব্বত্রই সরল ও সমতল, স্থানে স্থানে সামান্য অরণ্যময়, শেষ ভাগের অধিকাংশই শস্য-ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া গমনশীল এবং মধ্যে মধ্যে উত্তম উৎস দ্বারা সজ্জিত ও শ্রান্তিহর। মধ্য পথে এক বৃহৎ নির্ঝরিণী উল্লঙ্ঘন করিতে হয়। ইহার অঙ্গ হইতে যে এক উপপথ গিয়াছে, তদ্দ্বারা চারি আড্ডা যাইয়া সুপ্রসিদ্ধ ও অতি মনো-হর গুলমর্গ নামক স্থানে উপনীত হওয়া যায়। ষষ্ঠ পরি-চ্ছেদের দ্বিতীয় অংশে ইহার বর্ণনা করা যাইবে। পুঞ্চ নগরটী রাজা মতি সিংহের রাজধানী এবং উত্তম জনপদ। ইহা অতি বিস্তৃত অধিত্যকায় স্থিত এবং সুরন বা লেয়ার নদী ইহার পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ইহার চতুঃপার্শ্বই গিরি-সঙ্কুল বলিয়া স্থানটী অতি রমণীয়। এখানকার বিশ্রামভবন উৎকৃষ্ট।

৮। পুঞ্চ হইতে কেহুটা—৯ মাইল।

এই পথও অতি সুগম। প্রথমে নদীগর্ভ দিয়া গমন করিতে হয়। পরে শনৈঃ শনৈঃ উচ্চ ভূমি আরোহণ করিয়া প্রায় দেড় মাইল শস্যক্ষেত্রমধ্য দিয়া গিয়া পুনরায় নদীগর্ব্ভেই অবতরণীয়। ন্যূনাধিক এক মাইল বালুময় নদীগর্ব্ভ দিয়া যাইয়া নদী অতি-ক্রম পূর্ব্বক ইহার বামতটে আরোহণ করিতে হয়। এই চড়াই অতি দীর্ঘ নহে, কিন্তু কিয়ৎ পরিমাণে দুর্গম্য বটে। অনন্তর দেইগোয়ার নামক এক ক্ষুদ্র পল্লী। তথা হইতে

কিয়দ্দূর যাইয়া পুনরায় নদীগর্ভে অবতরণ আবশ্যক। পরে প্রায় চারি মাইল পর্য্যন্ত সমতল ভূমির উপর দিয়া গিয়া চারি বা পাঁচ বার নদী পার হইতে হয়। অনন্তর নদী পরিত্যাগ করিয়া ইহার দক্ষিণতটে অবরোহণ পূর্ব্বক কিয়দ্দূর যাইয়া কেহুটা পল্লীতে উপস্থিত হওয়া যায়।

কেহুটা অতি ক্ষুদ্র পল্লী। এখানকার বিশ্রামভবন কেবল মাত্র একটী গৃহ। কিন্তু তাহার চারিদিকে বারাণ্ডা আছে এবং তাহার অধিষ্ঠান স্থানটী অতি মনোহর।

৯। কেহুটা হইতে আলিয়াবাদ—৮ মাইল।

এই পথ দুর্গম। প্রথমে সরল চড়াই দ্বারা এক গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করিতে হয়। পরে বামদিকে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পর্ব্বতের পার্শ্ব দিয়া গমনীয়। ইহার কোনো কোনো স্থানে উভয় পার্শ্বে অত্যুচ্চ গিরিমালা থাকাতে পথ অতি সংকীর্ণ। অনন্তর অনতিদীর্ঘ উতরাই দিয়া এক নির্ঝরিণীতে নামিতে হয়। ইহার গর্ভ বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডে পরিপূর্ণ। ইহা পার হইয়া বামতটে পথ। অনন্তর যদিও অবশিষ্ট পথের অধিকাংশ শস্যক্ষেত্রমধ্য দিয়া গমন করিয়াছে, তথাপি উহা স্থানে স্থানে অতি অসরল ও দুর্গম। পরে আলিয়াবাদের যতই নিকটবর্ত্তী হওয়া যায়, ততই উপত্যকা ও নির্ঝরিণী সংকীর্ণ এবং পার্শ্বস্থ গিরিমালা উত্তরোত্তর উচ্চ ও ভীষণ-মূর্ত্তি। অগ্রবর্ত্তী পথ হাজীপীর ভূধরের উপর সর্পাকারে পড়িয়া আছে।

আলিয়াবাদ অতি ক্ষুদ্র পল্লী। কিন্তু বিশ্রামগৃহ নিতান্ত নিন্দনীয় নহে।

১০। আলিয়াবাদ হইতে হাইদ্রাবাদ—৭ মাইল।

এই পথে হাজীপীর শৃঙ্গ অতিক্রম করিতে হয়। ইহা সমুদ্রতল হইতে ৮,৫০০ ফিট উচ্চ। এই পথের প্রথমার্দ্ধে আরোহণ এবং অপরার্দ্ধে অবরোহণ। আরোহণ সাধারণতঃ অতি সুগম, কেবল স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ অসরল ও দুরারোহ। আরোহণ পথে কোনো বৃক্ষ নাই। শৃঙ্গদেশে জনৈক ফকিরের প্রস্তরনির্ম্মিত আশ্রম আছে। এই শেখর তৃণাচ্ছাদিত এবং কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত সমভূমি। অনন্তর যতই নিম্নে অবতরণ করা যায়, ততই পথ কঠিন ও দুর্গম এবং স্থানে স্থানে এমন অসরল, যে, প্রকৃত পথই নাই—অতি কষ্টে অবরোহণ করিতে হয়। শিখরদেশ হইতে কিয়দ্দূরে আসিয়া এক উত্তম উৎস ও প্রাচীন মন্দিরের কয়েকটী ভগ্ন স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। এই গিরির তলদেশে একটী নির্ঝরিণী প্রবাহিতা হইতেছে। ইহা পার হইয়া হাইদ্রাবাদে উপনীত হইতে হয়।

হাইদ্রাবাদ অতি ক্ষুদ্র পল্লী এবং কাশ্মীর রাজ্যে স্থিত। এখানে দুইটী উত্তম বিশ্রামভবন আছে।

১১। হাইদ্রাবাদ হইতে উড়ী—১০ মাইল।

এই পথ সর্ব্বাপেক্ষা দুর্গম। ইহাতে কেবলমাত্র অপরিমিত চড়াই উতরাই। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি যেমন দীর্ঘ, তেমনি দুর্গম। হাইদ্রাবাদ পরিত্যাগ করিয়া প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ পরিমিত এক চড়াই। অনন্তর এক সুগম উতরাই। পরে এক নির্ঝরিণী পার হইয়া অপর এক চড়াই চড়িতে হয়। ইহার প্রথমাংশ সুগম, কিন্তু শেষভাগ অপেক্ষাকৃত অসরল। পরে এক অতি দীর্ঘ ও দুর্গম উতরাই। ইহার অধি-

কাংশই অতিশয় বন্ধুর ও সংকীর্ণ। কিন্তু তলদেশে একটী অতি উৎকৃষ্ট জলপ্রপাত আছে। উহা যেমনি অত্যুচ্চ স্থান হইতে পতনশীল, তেমনি আয়তনে বৃহৎ। সুতরাং দেখিতে বিস্ময়কর ও মনোহর। অনন্তর আবার কিছু ঊর্দ্ধে উঠিয়া পথটী কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গম আরোহণ বিশিষ্ট হইয়া তলাবারী নাম্নী ক্ষুদ্র পল্লীতে গিয়াছে। এই পল্লী হাইদ্রাবাদ হইতে ন্যূনাধিক ছয় মাইল হইবে। এস্থান হইতে কিয়দ্দূর সমতল ভূমির উপর দিয়া গিয়া একটী চড়াই পাওয়া যায়। ইহা যেমনি সরলোচ্চ ও বন্ধুর, তেমনি সংকীর্ণ এবং দৈর্ঘ্যে প্রায় অর্দ্ধ মাইল। ইহারি সদৃশ এক দুর্গম উতরাই দিয়া ইহা হইতে নামিতে হয়। পরে কিয়দ্দূর সরল পথ দিয়া যাইয়া এক ক্ষুদ্র নদী পার হওয়া আবশ্যক। অনন্তর কতিপয় মাইল শস্য-ক্ষেত্রোপরি গমন করতঃ পথটী উড়ী জনপদের নিকটবর্ত্তী হইয়া কাশ্মীরের চতুর্থ অর্থাৎ মরী পথের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে।

উড়ী একটী বিশিষ্ট পল্লী। ইহার চারিদিক অত্যুচ্চ ভূধর বেষ্টিত। ইহার উত্তর ভাগে ঝিলম অর্থাৎ বিতস্তা নদী এমনি ভীষণ বেগে প্রবাহিত হইতেছে, যে, যাঁহারা কেবল মাত্র কাশ্মীর বা পঞ্জাবের সমতল ভূমিতে উহার সাম্য মূর্ত্তি দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মনে উহা সেই বিতস্তা বলিয়া সহসা প্রতীতি হয় না। অতি দূর হইতে ইহার বজ্র-নিনাদ সদৃশ গভীর শব্দ শ্রুত হইতে থাকে। ইহার বাম তটে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীন দুর্গ এবং ইহার সমীপে এক অত্যাশ্চর্য্য রজ্জুর সেতু আছে। এখানকার বিশ্রামভবন অতি উপাদেয়।

১২। উড়ী হইতে নাওসেরা—১৪ মাইল।

উড়ী পরিত্যাগ করিয়া এক দীর্ঘ, বন্ধুর ও ক্লেশকর পথ দিয়া সা কাকুটা নামা নদীর তট পর্য্যন্ত যাইতে হয়। এই নদী দ্বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। উভয় শাখার উপরেই কাষ্ঠ নির্ম্মিত সেতু আছে। এই প্রকার সেতু কাশ্মীরের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। নদী পার হইয়া যে চড়াই পাওয়া যায়, তাহাও প্রথমোক্ত অংশের ন্যায় অতি দুর্গম। অনন্তর কিয়দ্দূর যাইয়া এইরূপ আর একটী কঠিন চড়াই অতিক্রম পূর্ব্বক এক ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী পার হইতে হয়। পরে দুই মাইল মধ্যে আরো দুইটী দুর্গম চড়াই ও উতরাই ছাড়াইলে যে পথ পাওয়া যায়, তাহা অতিশয় সুগম। এই পথ দুর্গম বটে, কিন্তু চতুর্দ্দিগের শোভা অতি বিচিত্র। উভয় পার্শ্বে অত্যুন্নত পর্ব্বতশ্রেণী জলধর ভেদ করিয়া গগনস্পর্শ করিবার জন্য মস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছে; উহার গাত্রে কৃষিজাত শস্য ও নৈসর্গিক মহীরুহ অপূর্ব্ব শোভায় সজ্জিত আছে; সহস্র সহস্র হস্ত নীচে বিতস্তা নদী বন্‌হাল পথের চন্দ্রভাগার ন্যায় ভীষণ মূর্ত্তিতে প্রবাহিত হইতেছে। উহার দুগ্ধফেণনিভ বক্ষের ক্রমান্বয়ে উত্থান ও পতন দেখিয়া বোধ হয়, পার্শ্বস্থ পর্ব্বত-শৃঙ্গের সমান হইবার জন্য সে যেন প্রয়াস করিতেছে; স্থানে স্থানে উহার শব্দে কর্ণ বধির হইয়া যাইতেছে; ইত্যাকার রমণীয় শোভা দর্শনে পথ-ক্লেশ অনেক পরিমাণে দূর হয়।

এই পথের সপ্তম অংশের (সুরন হইতে পুঞ্চ) ন্যায় এস্থান হইতেও সুবিখ্যাত গুলমর্গে যাইবার এক পথ আছে। যথাস্থলে তাহার বর্ণনা করা যাইবে।

নাওশেরা অতি ক্ষুদ্র পল্লী। এখানে দুইটী উত্তম বিশ্রাম-ভবন আছে।

১৩। নাওশেরা হইতে বারমুলা—১০ মাইল।

এই অংশ সর্ব্বাপেক্ষা সুগম। ইহাতে চড়াই ও উতরাই নাই বলিলেই হয়। ক্রমাগত ৮ মাইল পর্য্যন্ত সমতলভূমি ও ক্ষেত্রের উপর দিয়া আসিয়া বারমুলা পাহাড় অতিক্রম করিতে হয়। ইহা সমতল ভূমি হইতে প্রায় পাঁচ শত ফিট উচ্চ। ইহার আরোহণ অতি সুগম। বন্‌হাল পথে পীর পাহাড়ের শিখরদেশ হইতে কাশ্মীর উপত্যকা দর্শনে মনে যেরূপ আনন্দের উদয় হইয়া থাকে, এই গিরিশৃঙ্গ হইতেও তদ্রূপ দৃশ্য-জনিত অনির্ব্বচনীয় প্রীতি অনুভব করা যায়। এস্থান হইতে বারমুলা দুই মাইল মাত্র। আরোহণের ন্যায় অবরোহণও অতি সুগম।

বারমুলা কাশ্মীর উপত্যকার পশ্চিম প্রান্তে স্থিত এবং বৃহৎ জনপদ। বিতস্তা নদী ইহার নিকট দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এখানকার বিশ্রামভবন অত্যুত্তম। এস্থান হইতেও গুলমর্গে যাইবার পথ আছে।

১৪। বারমুলা হইতে শ্রীনগর—৩০ মাইল।

বারমুলা হইতে শ্রীনগরে যাইবার দুই পথ আছে। প্রথম স্থল পথ। দ্বিতীয় জল পথ। স্থল পথে দুই আড্ডা—বারমুলা হইতে পত্তন ১৪মাইল এবং পত্তন হইতে শ্রীনগর ১৬ মাইল। এই পথ সমতল ভূমি এবং ইহাতে অশ্বারোহণ পূর্ব্বক চারিদিগস্থ নৈসর্গিক শোভা বিলোকন করিতে করিতে গমন করা অতি প্রীতিদায়ক। পরন্তু এতদিন অসীম পাহাড় উল্লঙ্ঘন

জনিত দুর্ব্বিসহ কষ্ট সহ্য করিয়া কোন্ ব্যক্তি সোৎফুল্ল চিত্তে অধিকতর প্রীতিদায়ক নৌকাযান অবলম্বন না করিবে? নদী জলের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে জল পথে ন্যূনাধিক ২০ ঘণ্টা লাগে।

এই পথে যে সমুদয় জনপদ, হ্রদ ও অপরাপর দ্রষ্টব্য পদার্থ আছে, কাশ্মীরের পাশ্চাত্য বিভাগের বর্ণনাকালে তৎসমুদয়ের বিশেস বিবরণ বর্ণিত হইবে।

চতুর্থ—মরিপথ।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, এইপথ সর্ব্বাপেক্ষা সুগম ও হ্রস্ব এবং রাউলপিণ্ডি ও পেশোয়ার প্রভৃতি স্থানবাসীদিগের পক্ষে অতি উপাদেয়। এই পথ কোনো কালে নীহার পাত জন্য অগম্য হইয়া উঠে না। এই পথেও উত্তম উত্তম বিশ্রামভবন আছে এবং অনায়াসে যান ও বাহকাদি পাওয়া যায়।

১। মরি হইতে দেউল—১০ মাইল।

এই পথ অতিশয় সুগম। ইহা সরল ও প্রশস্ত এবং মনোহর উপত্যকা ও অরণ্য মধ্য দিয়া গমন করিয়াছে। ইহাতে সৃষ্টির শোভা অতি বিচিত্র।

দেউল ক্ষুদ্র পল্লী এবং ইংরাজ রাজ্যের অন্তর্গত। এখানকার বিশ্রামভবন উত্তম। কিন্তু এখানে বিশ্রাম না করিয়া এক দিবসে অনায়াসে দ্বিতীয় আড্ডায় যাওয়া যাইতে পারে।

২। দেউল হইতে কোহালা—১০ মাইল।

এই অংশও পূর্ব্বের ন্যায় সুগম। প্রথম ৪ বা ৫ মাইল অতি সুগম উতরাই দিয়া বিতস্তা নদী গর্ভে অবরোহণ করিতে হয়। পরে উহার দক্ষিণ তট দিয়া ক্রমাগত যাইয়া কোহালা আড্ডাতে উপনীত হইতে হয়।

কোহালা অতি ক্ষুদ্র পল্লী। ইহাও ইংরাজ রাজ্যের সীমান্তর্গত। ইহার সম্মুখ দিয়া বিতস্তা নদী প্রবাহিত হইয়া ইংরাজ ও কাশ্মীর রাজ্যকে পৃথক্ করিয়াছে।

কোহালা হইতে দুই পথ বাহির হইয়াছে। প্রথম প্রাচীন, দ্বিতীয় নূতন। উহাদিগের তালিকা এইরূপ।

প্রাচীন পথ।		নূতন পথ।	
দন্না	৬ মাইল	চত্রকলাশ	১১ মাইল
ময়রা	৮॥০ ,,	রাড়	১২ ,,
চিক্কড়	৭॥০ ,,	ত্রিণালী	১২ ,,
হত্তী	১০ ,,	ঘরী	১০ ,,
		হত্তী	১২ ,,
	৩২ মাইল।		৫৭ মাইল

পূর্ব্বোক্ত তালিকা দৃষ্টে প্রতীতি হইবে প্রাচীন পথ অনতিদীর্ঘ। কিন্তু উহা অতিশয় দুর্গম। মরীপথের এই অংশ এবং চকোতী হইতে উড়ী কেবল কষ্টসাধ্য ও বন্ধুর চড়াই ও উতরাই বিশিষ্ট বলিয়া দুর্গম পদে বাচ্য হইতে পারে। সুতরাং উহা পরিত্যাগ করিয়া নূতন পথে গমন করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। বর্ত্তমান পথ অতি সুগম। উহাতে চড়াই ও উতরাই নাই বলিলেই হয়। মধ্যে মধ্যে যাহা আছে,

তাহাও অতি দীর্ঘ ও অসরল নহে। সমুদয় আড্ডায় বিশ্রাম ভবন উত্তম।

৭। হত্তী হইতে চকোতী—১৫ মাইল।

এই পথ তরঙ্গাকারে বিতস্তা নদীর বাম তট দিয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে ইহা নদীগর্ভের সহিত মিলিত হইয়াছে এবং কোনো কোনো স্থানে উহা হইতে ঊর্দ্ধে গমন করিয়াছে। এই পথে অনেক ক্ষুদ্র ও পাঁচটী বৃহৎ নির্ঝরিণী অতিক্রম করিতে হয়। শেষোক্তের উপরিভাগে সেতু আছে এবং তথাকার সমীপবর্ত্তী পথ অন্যান্য স্থানাপেক্ষা কিয়ৎ পরিমাণে বন্ধুর ও সরলোচ্চ, নচেৎ এই অংশও সাধারণতঃ সরল ও সুগম।

চকোতী অতি ক্ষুদ্র পল্লী। এখানকার বিশ্রাম-গৃহ নিন্দনীয় নহে।

৮। চকোতী হইতে উড়ী—১৬ মাইল।

মরী পথের এই অংশ সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ, দুর্গম ও কষ্টপ্রদ। প্রথম দশ মাইলের মধ্যে ন্যূনাধিক আটটী চড়াই ও উতরাই অতিক্রম করিতে হয়। উড়ী হইতে দুই মাইল দূরে এক বৃহৎ নদী অতিক্রম পূর্ব্বক যে চড়াই দ্বারা বিশ্রামভবনে উপনীত হইতে হয়, উহা যেমনি দীর্ঘ, তেমনি অসরল ও কষ্টদায়ক।

উড়ী আড্ডার সমীপবর্ত্তী হইয়া এই পথ পূর্ব্ববর্ণিত পুঞ্চ পথের সহিত মিলিত হইয়াছে। সুতরাং ইহার অবশিষ্টাংশ বর্ণনা করা দ্বিরুক্তি মাত্র।

পঞ্চম। আবোটাবাদ পথ।

যখন কাশ্মীর রাজ্য পাঠানশাসনকর্ত্তাদিগের অধীন ছিল, তখন তাঁহারা এই পথ দিয়া গতায়াত করিতেন। ইহা মরি পথের ন্যায় সুগম। কিন্তু বন্‌হাল পথের ন্যায় অতি দীর্ঘ। ইহার সমুদয় অংশই সুপ্রশস্ত এবং ইহা সাধারণতঃ সরল ও সমতল ভূমির উপর দিয়াই গিয়াছে। সুতরাং সর্ব্বত্র নির্ভয়ে অশ্বারোহণ পূর্ব্বক যাইতে পারা যায়। ইহাতে যে চড়াই ও উৎরাই আছে, তাহা অধিক সংখ্যক ও অতি বন্ধুর নহে। চতুর্থ আড্ডা অর্থাৎ মোজাফেরাবাদ হইতে বারমুলা পর্য্যন্ত কেবল বিতস্তানদীর দক্ষিণ তট দিয়া গমন করিতে হয়। ইহার সর্ব্বত্র বিশেষতঃ উপরোক্ত আড্ডা কয়টীতে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তাপে দগ্ধ হইতে হয় এবং ইহাতে সৃষ্টির শোভা অপরাপর পথের ন্যায় মনোমোহিন নহে। ইহা কোনো সময়ে নীহার-পাত জন্য অগম্য হয় না।

১। আবোটাবাদ হইতে মানসেরা—১৩॥০ মইল।

এই অংশ অতিশয় সুগম। পথ প্রশস্ত, সরল এবং ক্ষেত্রের উপর দিয়া গিয়াছে। মানসেরা বৃহৎ পল্লী এবং এক বৃহৎ নির্ঝরিণীর বাম তটে স্থিত। তথাকার বিশ্রামভবনও উত্তম।

২। মানসেরা হইতে ঘরী—১৭ মাইল।

এ পথও অতি সুগম। প্রথমার্দ্ধ পূর্ব্বোক্ত পথের সদৃশ

এবং অপরার্দ্ধ পার্ব্বত্য দেশ দিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু সরল ও প্রশস্ত, সুতরাং কোনো প্রকারেই কষ্টদায়ক নহে। ঘরী বৃহৎ পল্লী এবং এক বৃহৎ নির্ঝরিণীর বাম তটে স্থিত। এখানকার বিশ্রামভবনও উত্তম।

৩। ঘরী হইতে মোজাফেরাবাদ—৯ মাইল।

এই অংশ দুর্গম। প্রথমে এক মাইল পথ অতি সুগম। পরে দুব্বল্লী নামক পাহাড় আরোহণ করিতে হয়। ইহা ঘরী হইতে ন্যূনাধিক তিন মাইল দূরবর্ত্তী। চড়ায়ের প্রথমার্দ্ধ অতিশয় বন্ধুর এবং কষ্টগম্য। কিন্তু অপরার্দ্ধ অপেক্ষাকৃত অনেক সরল ও সুগম। উতরাই প্রায় তিন মাইল দীর্ঘ, কিন্তু দুর্গম নয়। প্রথমে এক নির্ঝরিণীর পার্শ্ব দিয়া, পরে উহার তলদেশ দিয়া গমন করিতে হয়। এই নির্ঝরিণী কৃষ্ণগঙ্গা (কিসেণ্ গঙ্গা) নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই নদী ন্যূনাধিক একশত হস্ত প্রস্থ এবং অতি ভয়ানক বেগে গমনশীল। ইহার উপরে এক রজ্জুর সেতু এবং পার হইবার জন্য এক নৌকাও আছে। কিন্তু যখন নদী সাম্য মূর্ত্তি ধারণ করে, তখন ব্যতীত নৌকা চালাইবার যো নাই। ইহার বামতটে পাঠানদিগের নির্ম্মিত এক দুর্গ আছে।

উক্ত সেতু হইতে মোজাফেরাবাদ প্রায় দুই মাইল দূরবর্ত্তী। ইহা বিশিষ্ট জনপদ এবং পর্ব্বতের গাত্রে স্থিত। ইহার কিয়দ্দূরে উৎকৃষ্ট বিশ্রামভবন। এস্থলে স্নান করিবার জন্য একটী উত্তম ঘাট আছে। কিন্তু নদীজল অতিশয় শীতল।

৪। মোজাফেরাবাদ হইতে হত্তীয়ান—১৭ মাইল।

এই পথ যেমনি দীর্ঘ, তেমনি কষ্টপ্রদ। ইহার প্রথমার্দ্ধে

কতিপয় অতি দুর্গম ও বন্ধুর চড়াই ও উতরাই আছে, কিন্তু অপরার্দ্ধ অপেক্ষাকৃত অনেক উত্তম। মোজাফেরাবাদ হইতে প্রায় এক মাইল দূরে কৃষ্ণগঙ্গা বিতস্তার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে এবং এস্থান হইতে বারমুলা পর্য্যন্ত শেষোক্ত নদীর দক্ষিণতট দিয়া ক্রমাগত গমন করিতে হয়।

হতীয়ান অতি ক্ষুদ্র পল্লী এবং পর্ব্বতের তলদেশে স্থিত। এখানকার বিশ্রামভবন পূর্ব্বোক্ত আড্ডার সদৃশ।

৫। হতীয়ান হইতে কণ্ডা—১১ মাইল।

এই অংশ নিতান্ত দুর্গম নহে। যদিও ইহাতে অনেক চড়াই ও উতরাই আছে, তৎসমুদয় অসরল ও অধিক কষ্টদায়ক নহে। কেবল হতীয়ান হইতে ন্যূনাধিক তিন মাইল আসিয়া এক দুর্গম উতরাই দিয়া এক নির্ঝরিণীতে নামিতে হয় এবং শেষাংশে আরো দুই বা তিনটী কষ্টপ্রদ উতরাই আছে। শেষার্দ্ধে যাইতে যাইতে দেখা যায়, যে, বিতস্তা নদীর অপর তট দিয়া মরিপথ গিয়াছে এবং এই দুই পথ নদীর উভয় তট দিয়া পরস্পর সমরেখানুসারে বারমুলা পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে।

কণ্ডা অতি ক্ষুদ্র পল্লী। এখানকার বিশ্রামভবন উত্তম।

৬। কণ্ডা হইতে কথাই—১২ মাইল।

এই অংশ পূর্ব্বোক্ত অংশের ন্যায় উভধর্ম্মাক্রান্ত। ইহাতে তিন চারিটী অতি বন্ধুর ও দুর্গম স্থান আছে। বিশেষতঃ কণ্ডা হইতে চারি ও আট মাইল দূরবর্ত্তী স্থানদ্বয় সর্ব্বাপেক্ষা দুর্গম। এই পথে কয়েকটী পার্ব্বত্য নদীও অতিক্রম করিতে হয়। উহাদের উপরে সেতু আছে।

কথাই অতি ক্ষুদ্র পল্লী এবং অতি বিস্তৃত অধিত্যকার মধ্য ভাগে স্থিত। ইহার সমীপে এক মৃত্তিকা নির্ম্মিত দুর্গ আছে। এখানকার বিশ্রামগৃহ পূর্ব্বোক্ত স্থানের তুল্য।

৭। কথাই হইতে সাহদেরা—১২ মাইল।

এই অংশও পূর্ব্ব পথ দ্বয়ের শদৃশ। চারি মাইল দূরে এক অত্যুৎকৃষ্ট জল-প্রপাত আছে।

কথাই পল্লীর ন্যায় সাহদেরা অতি ক্ষুদ্র এবং বিস্তৃত অধিত্যকার মধ্য দেশে স্থিত। এখানকার বিশ্রাম ভবনও উত্তম।

৮। সাহদেরা হইতে গিংগল—১৪ মাইল।

এই পথ অতি সুগম। প্রথমার্দ্ধে তিন বা চারিটী চড়াই ও উতরাই আছে। কিন্তু উহা অতি সামান্য এবং অবন্ধুর। অপরার্দ্ধ সাধারণতঃ সমতল ভূমি।

গিংগল অতি ক্ষুদ্র পল্লী। এস্থান হইতে সৃষ্টির শোভা অতি রমণীয়। এখানকার বিশ্রামভবন উত্তম।

৯। গিংগল হইতে বারমুলা—১৮ মাইল।

এই অংশ অতি দীর্ঘ বটে, কিন্তু অতিশয় সুগম। প্রথম ১৩ মাইল বিতস্তা নদীর দক্ষিণ তটস্থ সমতল ভূমির উপর দিয়া যাইতে হয়। পরে বাম ভাগে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কতিপয় ক্ষুদ্র পর্ব্বত শ্রেণী আরোহণ পূর্ব্বক অনুচ্চ, অনতিদীর্ঘ ও সংকীর্ণ শিখর দেশে উঠিতে হয়। এস্থান হইতে কাশ্মীর প্রদেশ নয়ন পথে পতিত হইয়া থাকে। অনন্তর সমতল ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার নদীর দক্ষিণ তট দিয়া গমন করত বারমুলাতে উপনীত হওয়া যায়।

১০। বারমুলা হইতে শ্রীনগর—৩০ মাইল।

এই অংশের বিবরণ পূর্ব্বে প্রকটন করা গিয়াছে। তৃতীয় অর্থাৎ ভিম্বর ও পুঞ্চ পথের শেষ ভাগে দেখুন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রীনগর এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানাদি।

প্রথম অংশ

শ্রীনগর। বিতস্তা নদী। নগরের অভ্যন্তর। শঙ্করাচার্য্যের টিব্বা। দুর্গ বা হরিপর্ব্বত।

পুরাকালিক শাসনকর্ত্তাদিগের অভিলাষানুসারে অথবা সাময়িক প্রয়োজনানুরোধে কাশ্মীরের রাজধানী সতত এক স্থান হইতে স্থানান্তরে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। পাণ্ড্রেতন একদা রাজধানী ছিল। ইং ৬৩০ খৃষ্টাব্দে কান্যকুব্জাধিপতি অভিমন্যু ইহা অগ্নিসাৎ করিলে নরপতি অবন্তীবর্ম্মা এক নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। ইহা তাঁহার নামানুসারে অবন্তীপুর নামে খ্যাত হয় এবং বহুকালাবধি ইহাই রাজপাট হইয়া আসিতেছিল। পরে ইহা পরিত্যক্ত হইয়া মটন অর্থাৎ মার্ত্তণ্ড এবং সোপুর নামক জনপদ দ্বয় একাদিক্রমে সমুদয় উপত্যকার উপর নিয়ম ও শাসন প্রচারণ করিতেছিল। কিন্তু

বর্ত্তমান কালে শ্রীনগর কাশ্মীরের রাজধানী। অনেকে এই নগরকে কাশ্মীরও কহিয়া থাকে।

ন্যূনাধিক পঞ্চদশ শত বৎসর অতীত হইল, রাজা প্রবরসেন এই নগর সংস্থাপন করেন। পূর্ব্বে ইহার নাম সূর্য্যনগর ছিল এবং বোধ হয়, শ্রীনগর শব্দ উহারই অপভ্রংশ হইবে। শ্রীনগরের অক্ষাংশ ৩৪°-৪′-৩০″ ল্যাটিচিউড এবং ৭৪°-৫০′-৫৪″ লংগিচিউড। ইহা কাশ্মীর উপত্যকার মধ্যভাগে স্থিত এবং বিতস্তানদীর উভয় তটে দুই মাইল বিস্তৃত। ইং ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে গণনা করিয়া দেখা যায়, ইহার লোকসংখ্যা ১,৩২,০০০ এক লক্ষ বত্রিশ সহস্র। তন্মধ্যে হিন্দু কেবল ৪০,০০০ চল্লিশ সহস্র, অবশিষ্ট মুসলমান।

বিতস্তানদী শ্রীনগরের মধ্য দিয়া মন্দ মন্দ বেগে প্রবাহিত হইতেছে। উহা প্রস্থে ন্যূনাধিক ১৭৬ হস্ত। ইহার জল অতি স্বাদু, স্বচ্ছ এবং স্বাস্থ্যকর। ইহা সম্বৎসর সমগভীর থাকে না। কিন্তু সচরাচর ১২ হস্তের অধিক গভীর নহে। একে তো সহরটী নদীদ্বারা দ্বিভাগে বিভক্ত, তাহাতে আবার মিরা কদল (কদল অর্থাৎ সেতু) হাবা কদল, ফতে কদল, জানা কদল, আলী কদল, নয়া কদল এবং সাফা কদল নামে কাষ্ঠনির্ম্মিত সপ্ত সেতু দ্বারা উভয় তট সংযুক্ত, এবং কোনো কোনো সেতুর উপরিভাগে আপণ-শ্রেণী দেখিতে অতি সুন্দর। নদীর উভয় পার্শ্বে অনেকানেক সুবিস্তৃত খাল সুদীর্ঘ বাহুর ন্যায় নিঃসৃত হইয়া কোনো কোনোটী হ্রদের সহিত মিলিত এবং কোনো কোনোটী বা নগর অতিক্রম করিয়া পুনরায় নদীর সহিত সংযুক্ত হইয়াছে।

এখানে নৌকাযান দ্বারা গতায়াত হইয়া থাকে। নদী ও প্রণালী সমুদয়ের উপরিভাগে সেতু আছে বটে, কিন্তু কার্য্য-সৌকর্য্যার্থ দরিদ্রলোকেরাও নৌকা দ্বারা গমনাগমন করে! নদীর স্রোত নাই বলিলেই হয় এবং কুম্ভীর প্রভৃতি কোনো প্রকার হিংস্র জলজন্তুরও ভয় নাই। একারণ, নৌকাভ্রমণ অতি প্রীতিপ্রফুল্লকর এবং সম্যক্ প্রকারেই আপদশূন্য। দূর-বর্ত্তী রম্য স্থানাদির কথা দূরে থাকুক, শ্রীনগরের সন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে যে কোনো সময়ে নৌকারোহণ পূর্ব্বক ভ্রমণ করিবে, তখনই শরীর ও মন প্রফুল্ল হইতে থাকে। গর্ভিণী তরুণীর ন্যায় তরণী মন্থর গতিতে গমন করিতেছে—মন্দ মন্দ দক্ষিণানিল বহিতেছে—উভয়পার্শ্বে সফেদা নামক বৃক্ষশ্রেণী সুশিক্ষিত সৈন্যদলের ন্যায় সমদূরে সরলভাবে দণ্ডায়মান রহি-য়াছে—সুশ্রাব্য বিহগগণ বৃক্ষশাখায় বসিয়া সুমধুর গান করি-তেছে—তটস্থ উপবনে সুধার আধার পুষ্পরাশি বিকসিত হইয়া প্রমত্ত মধুকরকে আলিঙ্গন দান করিতেছে, ইত্যাকার নৈসর্গিক শোভা বিলোকন করিলে যে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপলব্ধ হয়, তাহা যে সৌভাগ্যবান্ পুরুষ উপভোগ করিয়াছেন, তিনিই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। প্রত্যুত, যিনি এখানে সৃষ্টির রমণী য়তা দর্শনে মানবজীবন সার্থক করিতে আইসেন, অথবা স্বাস্থ্য-কর জলবায়ু সেবনে রুগ্নশরীর সুস্থ করিতে চাহেন, তাঁহার পক্ষে নৌকাবাস চিকিৎসা-তত্ত্বানুসারে যেমন পরামর্শসিদ্ধ, সাদা বুদ্ধির মতে তেমনি প্রীতিকর। অপর ইহা বহুব্যয়সাধ্য নহে। প্রত্যেক নাবিকের মাসিক বেতন তিন টাকা এবং নৌকাভাড়া এক টাকা মাত্র। সুতরাং চারিজন নাবিক এবং

দুই খানা নৌকা (এক খানা ডুঙ্গা এবং এক খানা শিকারী) নিযুক্ত করিলে পরম সুখে জলে বাস করা যায় এবং ইচ্ছামতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ পূর্ব্বক অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে।

এখানকার বাটী সকল কাষ্ঠনির্ম্মিত। কেবল মহারাজা, দেওয়ান এবং কতিপয় ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের সুদৃশ্য অট্টালিকা আছে। নদীতটে রম্য রাজবাটী; মনোহর অট্টালিকা; দ্বিতল, ত্রিতল বা চারিতল দারুময় আলয় এরূপ ভাবে নির্ম্মিত, যে, বোধ হয়, যেন উহারা নদীগর্ভ হইতে মস্তকোত্তলন করিতেছে। ইহা দেখিতে অতি রমণীয় বটে, কিন্তু সাময়িক জলোচ্ছ্বাসে একবারে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়—তখন গৃহ সকল বৃক্ষপত্রস্থ জলবিন্দুর ন্যায় ভূমিসাৎ হইতে থাকে। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের জুনৈ মাসে যখন কাশ্মীর গমন করি, তখন এইরূপ হৃদয়-বিদারক ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটিয়াছিল। অন্যূন চব্বিশ ঘণ্টা টিপ্‌টিপিনী বৃষ্টি হওয়াতে শৈলশিখরস্থ তুষার রাশি দ্রবীভূত হইয়া নদীর জল একবারে এত উচ্ছ্বসিত করিল, যে, ত্রিংশৎ বৎসরের মধ্যে সেরূপ আর ঘটে নাই। নদীর উভয় তট ভাঙ্গিতে লাগিল—তটস্থ গৃহ সকল মড়্‌মড়্ শব্দে ভূতলে পতিত হইতে লাগিল—দেখিতে দেখিতে চারিদিক এরূপ প্লাবিত হইয়া উঠিল, যে ভূমির চিহ্নমাত্রও রহিল না বলিলেই হয়। সকলেই স্ব স্ব ভবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেহ কেহ বা শঙ্করাচার্য্যের টিব্বা নামক উচ্চ স্থানে এবং অধিকাংশ লোক নৌকায় আশ্রয় গ্রহণ করিল—চারি দিকে হাহাকার রব উঠিল এবং বোধ হইল, যেন প্রলয়কাল উপস্থিত। শ্রীনগরের অনতিদূরে একটী হ্রদ আছে। উহার জল বৃদ্ধি হইলে নগর এককালে প্লাবিত ও

উচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। এ কারণ উভয়ের মধ্যে একটী বাঁধ আছে। ঐ প্রলয় জলস্রোত ঐ বাঁধকেও অতিক্রম পূর্ব্বক নগর মধ্যে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল। কিন্তু প্রজাহিতবৎসল সহৃদয় নরেশ্বর তৎকালে ঐ স্থানে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া উহাকে রক্ষা না করিলে শ্রীনগরের চিহ্নমাত্রও থাকিত না। যখন তিনি এই ভয়াবহ সংবাদ শ্রবণ করিলেন, তখন তাঁহার শরীর অসুস্থ ছিল। কিন্তু আপন শরীর রক্ষার দিকে দৃক্‌পাতও না করিয়া চিকিৎসকদিগের পরামর্শ অবহেলন পূর্ব্বক পুত্রসম প্রজাগণের প্রাণ রক্ষার্থ বাঁধে উপস্থিত হইয়া স্বহস্তে মৃত্তিকা খনন পর্য্যন্ত করিতেও উদ্যত হইলেন। তখন সকলেই আপনাপন প্রাণ রক্ষার্থ ব্যস্ত ছিল। কিন্তু মহারাজার এই অনুপম প্রজাবাৎসল্য দেখিয়া সকলেই তথায় উপনীত হইল এবং অনতিবিলম্বেই বাঁধকে আপদশূন্য ভাবে উচ্চ করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। ইহাতেই নগর রক্ষা পায়। তথাপি এই জলোচ্ছ্বাস বিস্তর অনিষ্ট উৎপাদন করে এবং চারি দিবস সমভাবে থাকিয়া অপসৃত হয়। ইহার কিয়দ্দিবস পরে আরো দুইবার উচ্ছ্বাস হইয়াছিল। কিন্তু অগ্রজ ভাই অগ্রেই সমুদয় শস্যক্ষেত্র, লোকের ঘর দ্বার প্রভৃতি জলসাৎ করিয়া গিয়াছিলেন—কনীয়ানদিগের আগমন প্রতীক্ষায় কিছুই প্রায় রাখিয়া যান নাই; সুতরাং ইহাঁরা আর কি করিবেন? কেবল দর্শন দিয়াই অন্তর্দ্ধান করেন।

গত বৎসরেও এইরূপ জলোচ্ছ্বাস হইয়া গিয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে প্রায় এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটিয়া থাকে।

শ্রীনগরে উত্তীর্ণ হইয়া নৌকারোহণ পূর্ব্বক এক প্রান্ত

হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত গমন করিলে ইহার সমুদয় সৌন্দর্য্য অবলোকন করা যায়। সহরের অভ্যন্তরে স্থলপথে দ্রষ্টব্য বিষয় কিছুই নাই এবং উহা এত মলিন, যে নাসিকারন্ধ্র বন্ধ না করিয়া পাদবিক্ষেপ করা যায় না। কাজেই আমরা জল-পথেরই পক্ষপাতী। অতএব বিতস্তা নদীর গতি অনুসরণ পূর্ব্বক একাদিক্রমে বিশেষ বিশেষ সমুদয় স্থলের বর্ণনা করা যাইতেছে।

নগরের প্রবেশ পথে দক্ষিণ দিগে যে সমুদায় বাংলা অর্থাৎ বিশ্রাম ভবন আছে, মহারাজা উহা ইংরাজ পর্য্যটক দিগের জন্যই নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ইহা ত্রি-শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথমশ্রেণী বিবাহিত পুরুষ দিগের নিমিত্ত নির্ম্মিত এবং মুনসি-বাগ নামক উপবনে স্থিত। দ্বিতীয় শ্রেণী অবিবাহিত দিগের নিমিত্ত এবং হরি সিংহ-কা-বাগ, গুরুমুখ সিংহ-কা-বাগ ও হারা সিংহ-কা-বাগ নামক স্থানাদিতে প্রতিষ্ঠিত। ইহাদের মধ্যস্থলে যে উৎকৃষ্ট ভবন আছে, উহাকে "রেসিডেন্সি" কহে। প্রতি বৎসর যিনি ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট দ্বারা "অফি-সর্ অন্ স্পেশিয়েল ডিউটী" অভিধেয় হইয়া মনোনীত হয়েন তিনিই এই স্থলে বাস করিয়া থাকেন। ইহার ঠিক দক্ষিণ পার্শ্বে কতিপয় মহীরুহ সমন্বিত একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। এস্থান হইতে প্রথম সেতু ন্যূনাধিক ৫০০ হস্ত দূর-বর্ত্তী এবং এই অংশের জল এত অগভীর, যে আশ্বিন মাসের প্রথমেই দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে অপসৃত হইয়া চড়া বাহির হয়। শীতকালে নদীটী বাম দিকে এক সংকীর্ণ প্রণালীর আকারে বহিতে থাকে।

কিয়দ্দূরে যাইয়া সুবিস্তৃত ময়দানের উপর ও নদীর বাম তটে একটী রমণীয় হর্ম্ম্য দেখিতে পাওয়া যায়। উহাকে বারাদরী কহে। তিন বৎসর হইল, মহারাজা ইহা প্রস্তুত করিয়াছেন এবং মধ্যে মধ্যে সমাগত ইংরাজ পর্য্যটক দিগকে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক এস্থলে নৃত্য ও ভোজ দ্বারা অতিথি-সৎকার করিয়া থাকেন। পঞ্জাবের লেফ্‌টেন্যাণ্ট গবর্ণর বা অপর কোনো উচ্চ পদারূঢ় সম্ভ্রান্ত ইংরাজ অথবা অপর কোনো জাতীয় মান্য লোক আসিলে এখানে তাঁহাদের বাস নিয়োজিত হইয়া থাকে।

এ স্থান হইতে কয়েকপাদ গমন করিলেই বাম তটে মহা-রাজার দাতব্য চিকিৎসালয়। সম্মুখে যে সেতু দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাকে মিরা কদল কহে। এই সেতু হইতে প্রারম্ভ হইয়া সাফা কদল অর্থাৎ শেষ সেতু পর্য্যন্ত বিতস্তা নদী নগ-রের মধ্য দিয়া গমন করিয়াছে। পূর্ব্বকালে এই অংশের উভয় তট প্রস্তর রক্ষিত ছিল। সুতরাং উহা দেখিতে যেমন সুন্দর, তেমনি তীরসমাশ্রিত লোকের নির্ভয়ে বাসযোগ্য ছিল। কিন্তু এক্ষণে স্থানে স্থানে উহার ভগ্নাবশেষ মাত্র আছে এবং কোনো কোনো স্থলে তট এমনি শিথিল হইয়া গিয়াছে, যে স্পর্শমাত্রেই ভাঙ্গিয়া যায় এবং জলোচ্ছ্বাসে ও তরঙ্গাঘাতে দিন দিন নদীগর্ভে লীন হইতেছে। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, লড়ী সমূহের দ্বার নদীর দিকে স্থিত বলিয়া সকলেরই পৃথক পৃথক ঘাট আছে। এই ঘাটকে ইয়ারবল কহে। মধ্যে মধ্যে কয়েকটী অত্যুৎকৃষ্ট পাষাণ নির্ম্মিত ইয়ারবল দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন প্রায় প্রত্যেক ঘাটে মুসলমানদিগের

কাষ্ঠ নির্ম্মিত স্নান গৃহ, বস্ত্র ধৌত করিবার জন্য উদুখল সদৃশ প্রস্তরের গর্ত্ত, স্ত্রীলোকদিগের অপরূপ রূপ মাধুরী, উহা-দিগের বিবসনা হইয়া স্নান, কোমল করে মুদ্গর ধারণ পূর্ব্বক সাবান দিয়া বস্ত্র ধৌত করণ ও মুসল দ্বারা উদুখলে ধান্য সংস্করণ, উহাদের জঘন্য কলহপ্রিয়তা প্রভৃতি অনেক লৌকিক আচার ব্যবহার নয়নপথে পতিত হইয়া থাকে।

মিরা কদল অতিক্রম পূর্ব্বক বাম তটে যে কয়েকটী সুন্দর লড়ী দৃষ্টিগোচর হয়, উহা দেওয়ান ও উজীর দিগের বাস গৃহ। ইহাদিগের সংলগ্ন যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রাসাদ আছে, উহা সের-গড়ী অর্থাৎ রাজবাটী। ইহাতে আরোহণ করিবার নিমিত্ত আদৌ কয়েকটী অত্যুত্তম কৃষ্টবর্ণ প্রস্তরের সোপান আছে। পরে এক দীর্ঘ কাষ্ঠময় অধিরোহিণী দ্বারা উঠিয়া রাজবাটীতে প্রবেশ করিতে হয়। এখানকার রাজবাটী জম্বুর অপেক্ষা অনেকাংশে নিকৃষ্ট। কিন্তু ইহা নদীগর্ভে স্থিত, প্রস্তর নির্ম্মিত ও কোণ-বিশিষ্ট বলিয়া অতি রমণীয় দেখায়।

রাজবাটীর পার্শ্বৈক দেশে ও নদী তটে গদাধর দেবের উৎ-কৃষ্ট মন্দির আছে। ইহার উপরিভাগ নির্ম্মল স্বর্ণে মণ্ডিত।

ইহার পার্শ্ব দিয়া এক খাল প্রবাহিত হইতেছে। ইহাকে কুট কোল কহে। উহার উপরিভাগস্থ সেতুর নাম টেকী কদল। এই প্রণালী নগরের পশ্চিম বিভাগ পরিক্রম পূর্ব্বক নয়া কদল অর্থাৎ ষষ্ঠ সেতুর নীচে গিয়া বিতস্তার সহিত পুন-র্মিলিত হইয়াছে।

সের গড়ীর সম্মুখে অর্থাৎ নদীর দক্ষিণ তীরে যে আর একটী খাল পূর্ব্বদিকে চলিয়া গিয়াছে, উহাকে চুঁটকোল

কহে। ইহা প্রায় ৬০ হস্ত প্রস্থ এবং ইহার জল অধিক গভীর নহে বটে, কিন্তু কোনো কালেই শুষ্ক হয় না। ইহা ডল্ অর্থাৎ নাগরিক হ্রদে যাইবার পথ। ইহার প্রবেশ পথে মহারাজার বিচিত্র তরণী সমুদয় অবস্থিতি করে।

এই প্রণালীর বামভাগে অর্থাৎ বিতস্তা নদীর দক্ষিণ তটে বসন্ত বাগ। ইহা রাজবাটীর বিপরীত ভাগে স্থিত এবং যেমন উহাতে আরোহণ করিবার কতিপয় কৃষ্ণপাষাণের সোপান আছে, এখানেও তদ্রূপ থাকাতে অতি সুন্দর দেখায়। ইহার উপরিভাগে কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের এক সিংহাসন আছে। এস্থলে প্রতি বৎসর মহারাজা কার্ত্তিক মাসীয় শুক্লপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে গদাধর দেবকে আনয়ন পূর্ব্বক গো গবর্দ্ধন পূজা ও অন্নকূট উৎসব সমাপন করেন। এই উৎসব উপলক্ষে মহারাজা বিস্তর অর্থ ব্যয় পূর্ব্বক প্রজাদিগকে অন্নদান করিয়া থাকেন। কাশ্মীরী হিন্দু ও মুসলমানদিগের অন্ন প্রস্তুত হইবার জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। এই স্থানে রাজবংশীয়দিগের, ডোগ্রা জাতির এবং প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদিগেরও রন্ধন হইয়া থাকে। অপরাহ্ণে মহারাজা সমুদায় প্রজাদিগের পাক তত্ত্বাবধারণ করিয়া আসিয়া ডোগ্রা, অমাত্য ও রাজপুত্রদিগকে লইয়া এস্থলে ভোজন করিয়া থাকেন।

বসন্ত বাগের সংলগ্ন যে এক লড়ী আছে, উহা ছোট আদালত বাটী। ইহাকে পার আদালত কহে। এই দক্ষিণ তটে কিয়দ্দূর অগ্রবর্ত্তী হইয়া কয়েকটী উত্তম মন্দির দেখা যায়।

পরে হাবা কদল দ্বিতীয় সেতু। ইহার উপরিভাগে সুদৃশ্য

আপণশ্রেণী ছিল। ইং ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে অগ্নি লাগিয়া তত্তাবত দগ্ধ হইয়া গিয়াছে।

কিয়দ্দূরে বামভাগে প্রধান রাজপুত্রের অত্যুচ্চ ও উৎকৃষ্ট বাস মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। অনন্তর ফতে কদল তৃতীয় সেতু।

এস্থান হইতে কয়েক পাদ অগ্রসর হইলে দক্ষিণ তটে সাহ হম্দানের জেয়ারৎ অর্থাৎ মসজিদ। ইহা কাশ্মীরের অতি প্রাচীন ও অত্যুৎকৃষ্ট মসজিদের মধ্যে একটী। কিম্বদন্তী আছে, পূর্ব্বে এই স্থলে হিন্দুরাজাদিগের শাসন কালে কালী দেবী স্থাপিতা ছিলেন। পরে মুসলমানদিগের রাজত্ব ও প্রভুত্বের প্রাদুর্ভাব হইলে তাহারা তাঁহাকে নীচে প্রোথিত করিয়া এই মসজিদ নির্ম্মাণ করে। সেই অবধি ইহার নিম্নতল হইতে এই অভিপ্রায়ে এক শব্দ আসিয়া থাকে, যে "যদি কেহ হিন্দু থাকিস, তবে আমাকে উদ্ধার কর্"। মহারাজা গোলাপ সিংহ নাকি ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিবার কল্পনায় ছিলেন। কিন্তু মসজিদ খনন করিলে রাজবিপ্লব ঘটিবার সম্ভাবনা। একারণ. তিনি ঐ মানস ত্যাগ করেন; সুতরাং অদ্যাবধি দেবীর পরিত্রাণ হয় নাই! এই প্রবাদ সত্য মিথ্যা যাহাই হউক, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়, যে মসজিদের বহির্দ্দেশস্থ নিম্ন প্রাচীরে (নদীর দিকে) একটী দেবীমূর্ত্তি খোদিত আছে। প্রত্যহ সহস্র সহস্র হিন্দুরা সিন্দূর ও কুঙ্কুম দিয়া তাঁহার পূজা করিয়া থাকে।

শাহ হম্দানের বিপরীত ভাগে নদীর বামতটে আর একটী উত্তম মসজিদ আছে। উহার নাম নয়া মসজিদ বা পত্তর মসজিদ। বিখ্যাত বেগম নুরজেহান ইহা স্থাপিত করেন।

কিয়দ্দূরে জানা কদল—চতুর্থ সেতু। ইহার উপরিভাগে কতিপয় বিপণি আছে। দক্ষিণ তটে যে একটী উত্তম ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয় উহাকে বাদশাহ কহে। ইহা বিখ্যাত জানালব উদ্দীনের গোর। ইনি ১৪২৩ খৃস্টাব্দে কাশ্মীরের অধিপতি হইয়া অত্যন্ত প্রতাপ ও গৌরব সহকারে তিপ্পান্ন বৎসর রাজত্ব করেন। ইনি শিল্পবিদ্যা ও সাহিত্য প্রভৃতি অনেক বিষয়ের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। কথিত আছে, ইনিই প্রথমে তুর্কিস্থান হইতে তন্তুবায় আনাইয়া কাশ্মীরে শাল প্রস্তুত করান এবং প্রসিদ্ধ কলমদানি কর্ম্ম ও কাচ প্রস্তুত করিবার প্রথা প্রভৃতি শিক্ষা দেন। প্রত্যুত, অদ্যাবধি কাশ্মীরীরা মান্য ও ভক্তিসহকারে ইহাঁর নামোচ্চারণ করিয়া থাকে এবং ইহাঁর নামানুসারে পূর্ব্বোক্ত সেতুকে জানা কদল কহে।

বাদশাহ ঘাট হইতে কয়েকপাদ স্থলপথে গমন করিলে একটী উৎকৃষ্ট মসজিদ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে জুম্মা মসজিদ বা প্রধান মসজিদ কহে। সাহজেহান বাদশাহ ইহা স্থাপিত করেন।

জনাকদল অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ তটে একটী অতি সুন্দর নূতন বাজার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা বর্ত্তমান শাসন কর্ত্তা প্রস্তুত করিয়াছেন। এ কারণ, ইহাকে মহারাজ গঞ্জ কহে।

কিয়দ্দূরে আলী কদল—পঞ্চম সেতু। সেতু অতিক্রম করিয়া যে একটী অতি প্রাচীন মসজীদ দেখা যায়, উহাকে বুল্‌বুল্‌ লঙ্কর কহে। লোকে কহিয়া থাকে, যে, কাশ্মীর প্রদেশে এই মসজিদ সর্ব্বাদৌ নির্ম্মিত হয় এবং বুল্‌বুল্‌ সাহ নামক জনৈক ফকীর মহম্মদীয় ধর্ম্ম উপত্যকামধ্যে প্রথম প্রচার

করেন এবং এই মসজিদে তাঁহার অস্থি রক্ষিত আছে। হুই। এক্ষণে ধ্বংশ হইয়া যাইতেছে এবং ইহার উপরিভাগে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে।

অনন্তর নয়া কদল—ষষ্ঠ সেতু। ইহা পার হইয়া কিয়দ্দূর গমন করিলে দক্ষিণ তটে পণ্ডিত রাজকাকের উত্তম লড়ী দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি অতি সম্ভ্রান্ত ও ধনশালী ছিলেন। ইহার বিপরীত ভাগে অর্থাৎ নদীর বাম তটে যে প্রণালী আছে, উহা কুট্‌কোল। উহা সেরগড়ী হইতে বাহির হইয়া এই স্থলে নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

কিয়দ্দূরে যাইয়া দক্ষিণ তটে লচ্‌মন্‌জু-কা-ইয়ারবল নামে এক ঘাট। এই ঘাটে উঠিয়া কয়েক পদ গমন করিলেই ইদ্‌গা নামক অতি রমণীয় স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দৈর্ঘ্যে এক মাইল এবং প্রস্থে এক মাইলের চতুর্থাংশ। ইহার চতুঃপার্শ্বে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ আছে এবং ইহার পূর্ব্বদিক দিয়া মার প্রণালী প্রবাহিত হইতেছে। ইহার উত্তর প্রান্তে এক অত্যুত্তম কাষ্ঠ-নির্ম্মিত মসজিদ। উহার নাম আলী মসজিদ।

পরে সাফা কদল—সপ্তম সেতু। ইহাই শ্রীনগরের শেষ সীমা। সেতু পার হইয়া বামতটে সাহ নেইমাতুল্লার মসজিদ। ইহার এক প্রস্তরাঙ্কিত উৎকীর্ণ পাঠে জানিতে পারা যায়, যে, দুইশত বৎসরের কিঞ্চিদধিক হইল, সেফ খাঁ এই সেতু নির্ম্মাণ করেন। একারণ, ইহাকে সাফা কদল কহিয়া থাকে।

শঙ্করাচার্য্যের টিব্বা।

কাশ্মীরে বহুসংখ্যক পৌরাণিক কীর্ত্তিস্তম্ভ আছে। ভিগ্নি সাহেব ইহা অশীতি সংখ্যক নির্ণয় করিয়াছেন। কোন্ কালে

যে তৎসমুদায় নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয় করা সুকঠিন ; কিন্তু পাণ্ডুপুত্রেরা যখন এ দেশে আইসেন, তখন যে তাঁহারা ইহার অধিকাংশ নির্ম্মাণ করিয়া যান, তাহার কোনো সন্দেহ নাই। সুবিখ্যাত প্রাচীন কীর্ত্তিস্তম্ভের মধ্যে "শঙ্করাচার্য্যের টিব্বা" (টিব্বা অর্থাৎ পাহাড়) একটী প্রধান। মুসলমানেরা ইহাকে "তক্ত-হি-সলিমান" অর্থাৎ সলোমনের সিংহাসন কহিয়া থাকে। উহারা কহে, যে, এই অনুচ্চ শৈলশিখরে সলোমনের সিংহাসন অধিষ্ঠিত ছিল। প্রবাদ আছে, পুরা-কালে এক সময় কাশ্মীর প্রদেশ জলে প্লাবিত হইলে কয়েক জন এখানে পলায়ন করিয়া রক্ষা পায়। পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, কোনো কোনো ভূতত্ত্ববেত্তা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যে, কাশ্মীর মনুষ্যের আদিম নিবাস ছিল। সুতরাং বোধ হয়, এই জনপ্রবাদ ঐ বাক্যের সপক্ষতা করিতেছে। সে যাহা-হউক, ভারতবর্ষের অলঙ্কার স্বরূপ সুপণ্ডিত শঙ্করাচার্য্য আপন বিদ্যাবলে এবং জনৈক নরপতির মন্ত্রবলে বৌদ্ধদিগকে ভারতবর্ষ হইতে দূরীভূত করিয়া দেন এবং ক্রমে ক্রমে সমু-দয় খণ্ড জয় করিয়া পরিশেষে এই স্থলে আগমন পূর্ব্বক এই টিব্বাতে বাস করেন। একারণ, ইহা তাঁহার নামানুসারে খ্যাতাপন্ন হইয়াছে। এখানকার লোকে তাঁহার অসামান্য বিদ্যা, বুদ্ধি এবং ঐশিক ক্ষমতা সম্বন্ধে অনেক প্রকার অলৌ-কিক উপন্যাস কল্পনা করিয়া থাকে। উল্লিখিত টিব্বা শ্রীনগ-রের সমতল ভূমি হইতে ১০৩৮ ফিট উচ্চ এবং রাজবাটী হইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। ইহা এমত স্থলে স্থিত, যে সকল দিক হইতে উহা সম্যক প্রকারে দৃষ্টি গোচর হয়।

এজন্য কাশ্মীরীরা শঙ্করাচার্য্যের লোকাতীত গুণানুবাদ সম্বন্ধে কহিয়া থাকে, যে, যেখান হইতে এই টিব্বা দেখা যায়, তথায় সর্প দংশনের ভয় নাই।

ইহাতে উঠিবার দুইটী পথ আছে। কিন্তু পশ্চিমদিগেরটী অপেক্ষাকৃত উত্তম। মহারাজা গোলাপ সিংহ পরলোক গমন করিবার কিছু দিবস পূর্ব্বে ইহা প্রস্তুত করিয়া দেন। সোপান-শ্রেণী এই পর্ব্বতের প্রস্তরেই নির্ম্মিত, সুবিস্তৃত এবং অতি উচ্চ। সর্ব্বশেষে প্রায় চত্বারিংশ হস্ত পরিমিত পথ অতি ভয়ানক। উহা কাটিয়া সোপান হইবার উপায় নাই। সুতরাং এমন দুর্গম, যে, আরোহণ বা অবরোহণ কালে দুই হাত দিয়া ধরিয়া ধরিয়া অতি সাবধানে হামাগুড়ি ভাবে পাদ বিক্ষেপ করিতে হয়। শিখর দেশে উপনীত হইতে আমাদিগের ৪৫ মিনিট লাগিয়াছিল।

এই শৈলশিখরে একটী অত্যুৎকৃষ্ট প্রস্তর-নির্ম্মিত মন্দির আছে। ইহা খৃষ্টাব্দের দুইশত বৎসর পূর্ব্বে অশোক রাজার পুত্র জলোকা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রথমে দ্বাদশ সোপান অতিক্রম করিয়া একটী ক্ষুদ্র খিলানের মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। ইহা প্রস্থে ২২ ইঞ্চ এবং উচ্চতায় ৬৷৷০ ফিট। দুই পার্শ্বে দুর্ভেদ্য পাষাণ-প্রাচীর এবং সম্মুখে একটী কাষ্ঠের দ্বার থাকাতে ইহা রমণীয় গৃহ রূপে প্রতীয়মান হয়। মন্দিরে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত ইহার অভ্যন্তরে সুচিক্কণ প্রস্তরনির্ম্মিত ১৮টী সোপান আছে। এক একটী আট ফিট দীর্ঘ, এক ফুট উচ্চ এবং এক ফুট প্রশস্ত। ইহার অধিকাংশ কেবল মাত্র এক এক খানি প্রস্তর। মন্দিরের অভ্যন্তরে দেড় ফুট উচ্চ এবং

আড়াই ফিট পরিধিবিশিষ্ট এক শিবলিঙ্গ স্থাপিত এবং তাঁহার গাত্রে একটী সর্প খোদিত আছে। মহারাজার আদেশানুসারে প্রত্যহ ইহাঁর পূজা হইয়া থাকে। বাম পার্শ্বস্থ স্তম্ভদ্বয়ের একটীতে দুই উৎকীরণ পারস্যভাষায় খোদিত আছে। একের তাৎপর্য্য এই, যে, সম্বৎ ৫৪ সালে হাজিহস্তি নামক স্বর্ণকার এই লিঙ্গ প্রস্তুত করেন। অপরটীতে লিখিত "যিনি এই লিঙ্গ স্থাপিত করেন, তিনি মৃজার পুত্র কোয়াজা রুকম, সংবৎ—।" ইহার অবশিষ্টাংশ নিম্নে প্রোথিত, সুতরাং পাঠ করা সুকঠিন। মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে নয় ফিট প্রশস্ত বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরের রক আছে। এবং তদ্দ্বারা উহার শোভা দ্বিগুণ হইয়াছে।

এই গিরিস্থলে পূর্ব্বোক্ত মন্দির ব্যতীত আরো কয়েকটী প্রস্তরালয়ের ভগ্নাংশ দেখা যায়। এই মন্দিরের নির্ম্মাণ-কৌশল বিষয় অনুধাবন করিয়া দেখিলে বিস্ময়সাগরে মগ্ন হইতে হয় এবং নিশ্চয়ই বুঝা যায়, যে, এককালে ভারতবর্ষে শিল্পবিদ্যানুশীলনের একশেষ হইয়া গিয়াছে। কারণ, যে সমুদয় প্রস্তরে ইহা নির্ম্মিত, তাহার একখানিও শৈলাধারের নহে—সমস্তই বহু দূর হইতে আনীত হইয়াছে। এক এক খণ্ড (যেমন সোপান ও রকের) এত বৃহৎ, যে, অনুমান হয়, পাঁচ শত লোকেও নাড়িতে পারে না। তাৎকালিক লোকদিগের পদার্থবিদ্যা প্রভৃতিতে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি না থাকিলে এত উচ্চ শিখর দেশে এমন মনোহর নির্ম্মাণ কিরূপে সম্ভবে? প্রত্যুত, ইহা পৌরাণিক জনগণের অসাধারণ বুদ্ধি এবং বিচিত্র নির্ম্মাণ কৌশলের স্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

এস্থান হইতে সমুদয় কাশ্মীরপ্রদেশ দৃষ্টিগোচর হয়। সৃষ্টির

রমণীয়তা এককালে নয়ন পথে পতিত হইয়া অতুল আনন্দ উৎপাদন পূর্ব্বক গিরিশিরোত্থান-কষ্ট দ্বিগুণ প্রতিশোধ করে। সৌধশিখর তৃণাচ্ছাদিত এবং বৃক্ষগণ নবপল্লবিত বলিয়া নগরটী একখানি হরিদ্বর্ণের গালিচা বলিয়া বোধ হয়। সম্মুখে বিতস্তা নদী বক্রভাবে গমন করিতেছে (যদ্দৃষ্টে এখানকার শালের দৌড়দার কল্কা প্রথম আবিষ্কৃত হইয়া থাকিবে)—উত্তর পশ্চিমভাগে হরিপর্ব্বতোপরি অভেদ্য দুর্গ রহিয়াছে—উত্তর দিকে ডল্ অর্থাৎ নাগরিক হ্রদ—তাহার মধ্যে মধ্যে বিচিত্র বিচিত্র দ্বীপপুঞ্জ ও ভাসমানক্ষেত্র—পার্শ্বে পার্শ্বে মনোরম ক্রীড়া উপবন শ্রেণী—দেখিতে অতি চিত্তবিমোহিতকর। এই স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া কাশ্মীরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত সুন্দর লক্ষ্য হইয়া থাকে। সুতরাং কি নিকটস্থ, কি দূরস্থ, সকল রমণীয় স্থান একাদিক্রমে নয়নগোচর হওয়াতে বিমলানন্দ উৎপন্ন হয়। যাঁহারা এখানে ভ্রমণোদ্দেশে আসিবেন, তাঁহাদিগের উচিত, যে সর্ব্বাদৌ এই শঙ্করার্য্যের টিব্বা এবং নিম্ন লিখিত হরিপর্ব্বত (দুর্গ) আরোহণ করিয়া কাশ্মীর প্রদেশের রমণীয়তা ও দর্শনীয় স্থানের পরস্পর দূরতা অনুভব করেন।

হরিপর্ব্বত বা দুর্গ।

হরি পর্ব্বত একটী অসংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র পর্ব্বত। ইহা নগরের উত্তর প্রান্তে স্থিত এবং ঊর্দ্ধে প্রায় ২৫০ ফিট। ১৫৯০ খৃঃ অব্দে দিল্লীর অধিপতি আকবার বাদসাহা ইহার চারি দিক অভেদ্য প্রস্তর প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত করেন। উহা দৈর্ঘ্যে প্রায় দেড়ক্রোশ, ঊর্দ্ধে ১৮ হস্ত, প্রস্থে ৮ হস্ত এবং তাহাতে ন্যূনাধিক এক এক শত হস্ত অন্তরালে এক এক প্রহরী-স্থান আছে।

ইহার তিনটী প্রবেশ দ্বার; দক্ষিণ পূর্ব্বভাগে কাচী দরোয়াজা, পশ্চিমে বাচী দরোয়াজা এবং উত্তর-পশ্চিমে সঙ্গিণ দরোয়াজা।

এই পর্ব্বতের শিখরপ্রদেশে প্রস্তর নির্ম্মিত দুর্গ সংস্থাপিত আছে। ইহাতে প্রবেশ কালে এখনকার শাসনকর্ত্তার আজ্ঞাপত্র আবশ্যক। ইহাতে উঠিবার দুইটী পথ আছে। উত্তরদিকেরটী প্রশস্ত ও সুগম এবং দক্ষিণেরটী অতিশয় বন্ধুর ও দুর্গম। দূর হইতে দুর্গ দুর্ভেদ্য এবং অতি সুন্দর দেখায়। কিন্তু অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে হতাশ হইতে হয়। তথায় কয়েকটী যৎসামান্য কুটীর, দুইটী কদর্য্য ক্ষুদ্র জলাশয় এবং মহাদেবের লিঙ্গ ও কালীমূর্ত্তি সমন্বিত একটী দেবালয় ভিন্ন আর কিছুই নাই। প্রবেশদ্বারে এক কামান এবং প্রত্যেক রক্ষণীয় স্থলে তিন তিন ক্ষুদ্র ও দুই দুই বৃহৎ কামান স্থাপিত আছে। তৎসমুদয়ের নির্ম্মাণ কৌশল অতীব প্রশংসনীয়। এতদ্ব্যতীত কয়েকজন সুশিক্ষিত সৈন্য প্রহরী রূপে নিযুক্ত আছে। যে অভেদ্য শৈলপ্রাকার কাশ্মীরকে শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিতেছে, তাহাতে মনুষ্যের ক্ষীণ বল তিলার্দ্ধমাত্র আবশ্যক নহে; এই কারণেই এখানকার নরেশ্বর দুর্গ সুরক্ষিত করিতে উপেক্ষা করিয়া থাকেন।

শঙ্করাচার্য্যের টিব্বার ন্যায় এখান হইতেও কাশ্মীরের শোভা স্পষ্ট লক্ষ্য হয়। সুতরাং পর্য্যটকেরা যেন দুর্গ দর্শনচ্ছলে এই অনুপম আনন্দ উপভোগ করেন।

দ্বিতীয় অংশ

ডল্ অর্থাৎ নাগরিক হ্রদ।

পাঠক চল, এখন একবার নাগরিক হ্রদের রমণীয়তা দর্শন করিয়া আসি। ইহার সমুদয় দর্শনীয় স্থান তন্ন তন্ন করিয়া সন্দর্শনপূর্ব্বক সম্যক প্রকারে পরিতোষ লাভ করা এক আধ দিনের কাজ নহে। কোনো মনোহর ক্রীড়া উপবনে কিয়দ্দিবস বাস করত ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিলে তৃপ্তিপূর্ব্বক ক্ষুন্নিবৃত্তির সম্ভাবনা বটে। পাঠক, না হয়তো আর এক কাজ কর; উপর্য্যুপরি এক পক্ষ গতায়াত করত সমুদয় স্থানে পরিচিত হও। পরে কোনো পৌর্ণমাসী শরৎশশীর সুশীতল সুবিমল কিরণে প্রিয়তম সুহৃদের সহিত কোনো উপবনের প্রস্তরাসনে আসীন হইয়া হৃদয় দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক প্রকৃতির শোভা বিলোকন কর এবং প্রেমাভিসিক্ত চিত্তে সৃষ্টিকর্ত্তার মহিমা ও গুণানুবাদ কীর্ত্তন দ্বারা মানবজীবন সার্থক কর।

সের-গড়ী অর্থাৎ রাজবাটীর সম্মুখে চুঁটকোল নাম্নী প্রণালী পূর্ব্ববাহিনী হইয়া বিতস্তা নদীর সহিত এই হ্রদকে সংলগ্ন করিতেছে। প্রণালীর প্রবেশ দ্বারে দেখিতে পাইবে, মহারাজার পালিত হংস ও রাজহংসকুল নির্ভয়ে কেলি করিয়া বেড়াইতেছে এবং নানাবিধ মনোহর রাজ-তরণী ভাসমান রহিয়াছে। অনুমান ৪০০ ফিট যাইয়া একটী সেতু দেখিতে পাইবে। উহার নাম গাওকদল। সেতু পার হইয়া বাম পার্শ্বে

সুদৃশ্য সফেদা শ্রেণী এবং সূর্য্যাতপ বর্জ্জিত একটী সুন্দর উপবন। এই উপবনে প্রণালীতটে যে কাষ্ঠ নির্ম্মিত দ্বিতল লড়ী (বাটী) দেখিতেছ, উহাতে লেখক কিয়দ্দিবস বাস করিয়াছিল। দক্ষিণ পার্শ্বে বারুদ খানা। কিয়দ্দূর গমন করিলে বাম ভাগে মনোহর চেনার বাগ। ইহাতে শিবির স্থাপনপূর্ব্বক বাস অতি প্রীতিদায়ক। কিন্তু নদীর জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

অনতিদূরে দ্রোগজন্ অর্থাৎ হ্রদের দ্বার। সেরগড়ী হইতে ইহা অর্দ্ধক্রোশ দূরে স্থিত এবং নৌকা দ্বারা এখানে আসিতে ৩৬ মিনিট লাগে। হ্রদের দ্বার এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত, যে, যৎকালে নদীর জল নিম্ন থাকে, তৎকালে কবাট উদ্‌ঘাটিত, এবং যখন জল কিয়দ্দূর উর্দ্ধে উত্থিত হয়, তখন উহা আপনা হইতেই রুদ্ধ হইয়া যায়। সুতরাং নদীর জলোচ্ছ্বাসে হ্রদের মধ্য ও পার্শ্বস্থ গ্রাম নগর ও ভূমি প্লাবিত হইবার ভয় নাই। দ্বারের উপরিভাগে সেতু আছে এবং তথা হইতে একটী সুদৃঢ় বাঁধ (যে বাঁধের বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে) নির্গত হইয়া নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। পাঠান নরপতিরা এই সেতু ও বাঁধ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কোন্ জাতীয় শাসন-কর্ত্তাদিগের রাজত্ব কালে যে দ্বার নির্ম্মিত হয়, তৎ সম্বন্ধে কেহ একবাক্য নহে। সুতরাং নিশ্চয় করা সুকঠিন। পরন্তু ইহা যে অতি প্রাচীন, তাহার কোনো সন্দেহ নাই। দ্বারদেশ মৎস্য ধরিবার প্রিয়স্থান এবং ইহার জল ১০ হইতে ৩০ হস্ত পর্য্যন্ত গভীর।

হ্রদ দৈর্ঘ্যে প্রায় তিন ক্রোশ এবং প্রস্থে দেড় ক্রোশ। ইহার গভীরতা সকল স্থানে সমান নহে, কিন্তু গড়ে ছয়

হস্তের অধিক হইবে না। ইহার জল অতিশয় স্বচ্ছ ও স্বাস্থ্য-কর। নিম্নদেশ ও পার্শ্বস্থ অসংখ্য অসংখ্য উৎস হইতে ইহার জল উৎপন্ন বা নিঃসৃত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত উত্তর পশ্চিম ভাগস্থ অত্যুন্নত গিরিমালা হইতেও অনেক বারিধারা নির্গত হইয়া ইহাতে পতিত হইতেছে। ইহাতে অনেক জল-জলতা, পানীফল, কমলিনী এবং কুমুদিনী প্রভৃতি আছে। এখানকার অনেকে থাল পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুলভ ও সুবিস্তৃত পদ্মপত্রে আহার করিয়া থাকে। ইহাতে মৎস্য প্রচুর। মধ্যে মধ্যে দ্বীপ, তদুপরি লোকালয় এবং চতুঃপার্শ্বে বাসবের নন্দন কানন সদৃশ মনোহর ক্রীড়া উপবন থাকাতে হ্রদটী দেখিতে অতি রমণীয়।

পাঠক, হ্রদে প্রবেশ করিয়া অত্যুচ্চ জলজলতার মধ্য দিয়া অনেক মার্গচিহ্ন দেখিতে পাইতেছ। কোন্‌টীকে অবলম্বন করিবে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছ না। আইস, আমার সহিত আইস। এই যে বামপার্শ্বস্থ নালামার নাম্নী প্রণালী উত্তরবাহিনী হইয়া ইহার সহিত আঞ্চার হ্রদকে সংযুক্ত করিতেছে, চল, ইহাই অবলম্বন করিয়া দর্শনীয় স্থান সমুদয় একাদিক্রমে শৃঙ্খলা পূর্ব্বক দর্শন করি।

দ্রোগ্‌জন্‌ হইতে ১৫ মিনিট আসিয়া বাম ভাগে যে একটী ক্ষুদ্র পল্লী দেখিতে পাইতেছ, উহার নাম বুদমর্গ। উহার সম্মুখে যে বড় বড় বিংশতি খানি প্রস্তর পড়িয়া রহি-য়াছে, উহাতে শাল ধৌত হয়। এস্থানের জলের এমনি গুণ, যে, উহাতে শাল ধৌত করিলে যেরূপ কোমল ও চিক্কণ

হইবে, উহার এক হস্ত পরিমিত দূরে ধৌত করিলে তদ্রূপ উৎকৃষ্ট না হইয়া বরং অপকৃষ্ট হইয়া যাইবে।

কিয়দ্দূরে ক্রালিয়ার নামক গ্রাম। এস্থলে কয়েকটী পুরাতন ঘাট এবং হর্ম্ম্যের ভগ্নাংশ ব্যতীত আর কিছুই দ্রষ্টব্য নাই।

এস্থান অতিক্রম করিয়া সম্মুখে যে প্রস্তর নির্ম্মিত সেতু দেখিতেছ, ইহার নাম নেউইদিয়ার। ইহাতে তিনটী খিলান আছে এবং মধ্যস্থলের দুই পার্শ্বে পারস্য ভাষায় যাহা লিখিত ছিল, তাহা স্পষ্ট লক্ষ্য হইতেছে না।

অদূরে সতু নামক বাঁধ। ইহা প্রাগুক্ত সেতুর দক্ষিণদিক হইতে আরম্ভ হইয়া হ্রদের অপর পার্শ্বস্থ নিষাৎবাগ নামা তপোবনের সমীপবর্ত্তী হওতঃ হ্রদকে দ্বিখণ্ডে বিভক্ত করিতেছে। ইহা দৈর্ঘ্যে দুই ক্রোশ এবং প্রস্থে গড়ে আট হস্ত। ইহার এই দীর্ঘ দেহের মধ্যে মধ্যে সেতু আছে—সমষ্টির সংখ্যা নয়টী। দুইটী প্রস্তর এবং সাতটী কাষ্ঠ নির্ম্মিত। অতিশয় প্রাচীনত্ব বশতঃ এবং জীর্ণ সংস্কারভাবে ইহার স্থানে স্থানে খণ্ডিত হইয়াছে। পরন্তু কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক ইহার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিলে (যাহাতে ন্যূনাধিক ১।০ ঘণ্টা লাগে) যে অনুপম আনন্দ উপলব্ধ হয়, তাহাতে অনুরোধ করা যাইতে পারে, যে, পাঠক সাবকাশমতে তাহা উপভোগ করিতে কদাচ বিস্মৃত হইও না। কিন্তু আপাততঃ এস্থল পরিত্যাগ করিয়া অগ্রসর হও। সম্মুখে কত কত চিত্ত-বিমোহিত-কর ঐশিক ব্যাপার দেখিয়া পুলকিত ও চমৎকৃত হইবে।

এই দেখ আমরা কমল বনে প্রবেশ করিলাম। কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে পদ্মপত্র সমুদয় জলে শয়িত ছিল। এক্ষণে জলের অধোগমন ও নীহারপাতের হ্রাসতা নিবন্ধন পত্রগুলি গাত্রোত্থান করিয়াছে। বোধ হইতেছে যেন নিম্ন দেশস্থ সুকোমল ভোগবিলাসী পানীফলকে আতপ তাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্যই প্রকৃতি দেবী ছত্রধারণ করিয়াছেন। কমলিনী বিকসিতা হইয়াছে। ইহা যেরূপ বিপুল-শরীরা, সুবাসিতা ও মনোহারিণী, তেমন বোধ হয়, আর কুত্রাপি নাই। জলসীমা হইতে দুই হস্ত ঊর্দ্ধে মৃণালাসনে গর্ব্বিতা রাজ্যেশ্বরীর ন্যায় অধিষ্ঠিতা হইয়া নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিতেছে। কিন্তু নির্ব্বিবাদেই বা কিরূপে বলি? তাহা হইলে পবনভরে মৃদু মৃদু দোদুল্যমানা হইবারই বা কারণ কি? কল্পনা অনুমান করেন, পাছে কেহ ইহাকে এখানকার মহিলাগণের অনুপম বদন-মণ্ডলের সহিত তুলনা করতঃ ইহার গর্ব্ব খর্ব্ব করে, সুদ্ধ এই ভয়েই কাঁপিতেছে!

পাঠক, কিঞ্চিৎ অগ্রসর হও। সম্মুখে ঐ যে কয়খানি ক্ষেত্র দেখিতেছ, উহা কি বোধ হয়? উহাতে মহোল্লাসে কৃষকগণ কৃষিকর্ম্ম করিতেছে; কাঁকুড়, শসা, তরমুচ, বেগুণ প্রভৃতি আহার্য্য দ্রব্য অতিসুন্দর জন্মিয়া রহিয়াছে; বিক্রয়ার্থ মহিলাগণ ফল সঞ্চয় করিতেছে; কোনো কোনো ক্ষেত্রের উপর পর্ণকুটীর রহিয়াছে, ঠিক যেন আমাদিগেরই দেশের শস্য ক্ষেত্র। কিন্তু এত অগাধ জলে ক্ষেত্র কিরূপে আইল? চল, আরো কিছু সমীপবর্ত্তী হইয়া ইহার তত্ত্ব অনুধারন করিয়া দেখা যাউক। স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, ইহা ছিন্ন-

মূল ভাবে অর্থাৎ নিম্নদেশস্থ মৃত্তিকার সহিত অসংলগ্ন অবস্থায় জলের উপর ভাসিতেছে। কেননা, ঐ যে উহা কৃষকদিগের পদভরে কম্পিত হইতেছে! ইহার একাংশ জলে নিমগ্ন করিবার জন্য আমরা এত প্রযত্ন করিলাম, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। ইহাই সেই চিরশ্রুত কাশ্মীরের ভাসমান ক্ষেত্র। মেক্সিকোর ভাসমান উপবন পৃথিবীর সপ্ত অদ্ভুতকাণ্ডের মধ্যে পরিগণিত—ইহাও কি সেই শ্রেণীতে গণ্য হইতে পারে না?

কাশ্মীরীরা নিম্নলিখিত রূপে ভাসমান ক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। হ্রদে অনেক জলজলতা আছে। যে স্থানের জল গভীর নহে, তথাকার লতা সকল জলের নীচে প্রায় দেড় হস্ত পরিমাণ রাখিয়া কাটিয়া দেয়। জলের গতি মন্দ বলিয়া লতাগুলি ছিন্নমূল হইলেও কোনো স্থানে যাইতে না পারিয়া এক স্থলেই পরস্পরে সংলগ্ন রহে। কৃষকেরা তদুপরি ক্রমে ক্রমে ক্ষুদ্র লতা ও মৃত্তিকা জমাইতে থাকে। চারি বা পাঁচ স্তর করিতে করিতে উহা বিলক্ষণ দৃঢ় এবং কৃষিকর্ম্মোপযোগী হইয়া উঠে। এই রূপেই ভাসমান ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। পাছে জলে ভাসিয়া যায়, অথবা হ্রদের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে কোনো অনিষ্ট ঘটে, এইজন্য কয়েকটা লম্বা মোটা কাষ্ঠ ইহার স্থানে স্থানে দিয়া মৃত্তিকাতে প্রোথিত করিয়া রাখে। পাঠক, শুনিয়া থাকিবে "কাশ্মীরে জমি চুরি হইয়া থাকে"—ইহা তাই। কোনো ক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত উর্ব্বরা বা ফলবতী হইলে দুষ্ট লোকে সুবিধা পাইলেই অপহরণ করিয়া আপন ক্ষেত্রের সহিত এমন অলক্ষিত রূপে সংলগ্ন করিয়া দেয়, যে, অপহরণ কার্য্য

ধৃত করা দুষ্কর। মধ্যে মধ্যে এইরূপ রহস্য জনক অনেক অভিযোগ রাজদ্বারে উপস্থিত হয়। এমন কি, ক্ষেত্র ক্ষুদ্র হইলে কখনো কখনো আকর্ষিত হইয়া হ্রদ ও প্রাণালী অতিক্রম পূর্ব্বক উহা বিচারালয়েও আনীত হইয়া থাকে। ভাসমান ক্ষেত্র কেবল মাত্র এই হ্রদে আছে, অপর কোনো জলাশয়ে নাই।

কিয়দ্দূরে হজরৎবল নামে একটী গ্রাম। ইহা হ্রদের ঠিক পশ্চিম দিকে। এস্থলে মুসলমানদিগের একটী বৃহৎ মসজীদ্ আছে। উহার অভ্যন্তর সুবিস্তৃত, অত্যুচ্চ, নানাবর্ণের বস্ত্রাচ্ছাদিত এবং ঝাড় লাণ্ঠন দ্বারা শোভিত। এক প্রান্তে একটী প্রকোষ্ঠ। উহাতে কাচের আচ্ছাদন বিশিষ্ট ক্ষুদ্র রজত বাক্সে এক গাছি কেশ আছে। মুসলমানেরা কহিয়া থাকে, ইহা মহম্মদের শ্মশ্রু-লোম। প্রতিবৎসর এস্থলে চারিটী মেলা হইয়া থাকে। তন্মধ্যে শ্রাবণমাসে সর্ব্বাপেক্ষা মহত্তর মহোৎসব হয়। পাঠক মনে কর, আ'জ্ সেই মেলার দিন উপস্থিত। সুতরাং চল, একবার অবতরণ পূর্ব্বক উহার কৌতুক দর্শন করা যাউক। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি ধনী, কি নির্দ্ধন, এত লোকের সমাগম হইয়াছে, যে, সহর ও চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সকল শূন্য-প্রায় হইয়া গিয়াছে। ঐ দেখ, আপণশ্রেণীতে কত প্রকার মনোহর দ্রব্য বিক্রয় হইতেছে। ক্রেতা ও বিক্রেতাদিগের কলকলরবে এত উচ্চরব হইতেছে, যে আমাদিগের পরস্পরের বাক্য শ্রবণগোচর হইতেছে না। ঐ দেখ, স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড উষ্ণীষধারী মৌলবীরা উচ্চ কাষ্ঠাসনে উপবেশন করতঃ দোদুল্যমান হইয়া কোরাণ

পাঠ করিতেছে—কেহ কেহ বা দণ্ডায়মান হইয়া শ্রোতৃবর্গকে স্বধর্ম্মের সনাতনত্ব ও মুক্তিদাতৃত্ব মাহাত্ম্য প্রতিপন্ন করিতেছে। মসজীদাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখ লোলচর্ম্ম, বিগলিতদন্ত, শুভ্রকেশ, শুভ্রবাস, সুচিত্র উষ্ণীষধারী এক অশীতিপর বৃদ্ধ ভক্তি সহকারে সকম্পহস্তে পূর্ব্বোক্ত মহম্মদের শ্মশ্রুলোম ঊর্দ্ধদেশে ধারণ করতঃ দর্শকদিগকে দেখাইতেছে এবং অর্দ্ধস্ফুট স্বরে মহম্মদের গুণগান করিতেছে। দর্শকদিগের মধ্যে অনেকে ভক্তিরসে দ্রব হইয়া গদ্‌গদ ভাবে আপাদমস্তক বাহু বিস্তার পূর্ব্বক প্রণিপাত করিতেছে—চারিদিক "আল্লা আল্লা" রবে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। এদিকে দিবা অবসান প্রায়। পাঠক, চল, একবার হ্রদে নৌকাদৌড়ের রঙ্গ দেখা যাউক। উৎসব উপলক্ষে অন্যূন পাঁচশত তরণী একত্র হইয়াছে। উহার মধ্যে যে সমুদয় বাহকদিগকে মল্লবেশে ও রণ সজ্জায় সজ্জিত দেখিতেছ, তাহাদিগেরই নৌকাদৌড় হইবে। সম্মুখে হ্রদের জল ধূ ধূ করিতেছে। তথায় মধ্যস্থলে বিশ হস্ত পরিসর স্থান রাখিয়া দর্শকদিগের তরণীমালা দুই অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী হইল। মধ্যস্থলে নৌকাদৌড় হইতে লাগিল। পবন বেগে নৌকা সকল দৌড়িতেছে, চাপ্‌পার * আঘাতে হ্রদ কম্পিতা হইতেছে, জয়ীদিগের জয়ধ্বনিতে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে, দেখিতে শুনিতে অতি আনন্দজনক। দেখিতে দেখিতে দিঙ্‌মণ্ডল তমসাচ্ছন্ন হইল। বিহগকুল নীড়ে প্রত্যাগমন কালে কলরব করিতেছে—বোধ হইতেছে, তাহারা যেন সন্ধ্যা আগত দেখিয়া মানবগণকেও

* নৌকার দাঁড়কে এখানে চাপ্‌পা কহিয়া থাকে।

জনতা ভাঙ্গিয়া স্ব স্ব ভবনে গমন করিতে বলিতেছে! অতএব পাঠক, চল, আমরাও আপনাপন আশ্রমে বিশ্রাম করিতে যাই। অদ্য ক্রীড়া উপবনের একটীও দেখা হইল না। সুবিধামতে কল্য তাহা হইবে।

[নসীম বাগ] (পারস্য ভাষায় নসীম শব্দের অর্থ মন্দ মন্দ বায়ু) দ্রোগ্‌জন হইতে ১।০ ঘণ্টা নৌকাপথে আসিলে হজরৎবলের অনতিদূরে নসীম বাগ। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় এক ক্রোশের চতুর্থাংশ এবং প্রস্থে এক ক্রোশের অষ্টমাংশ। ইহা আকবর বাদসাহ নির্ম্মাণ করেন এবং ভগ্নাংশ দেখিয়া বোধ হয়, ইহা আদৌ প্রস্তর প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত ছিল। অধুনা ইহাতে কেবল মাত্র অন্যূন পাঁচশত অতি বৃহৎ ও পুরাতন চেনার বৃক্ষ আছে। এক একটী এত স্থূলায়তন, যে, পাঁচ জন লোকে হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক পরিবেষ্টন করিতে পারে না। বৃক্ষশ্রেণী শৃঙ্খলা পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া সুশীতল ছায়া দান করিতেছে বলিয়া স্থানটী অতি রমণীয়।

চা'রচেনার অর্থাৎ চারিটী চেনার সম্বলিত দ্বীপ। ইহাকে রূপা লং অর্থাৎ রজতদ্বীপও কহিয়া থাকে। ইহা নসীম বাগের সম্মুখে এবং হ্রদের উত্তর প্রান্তের মধ্যস্থলে স্থিত। পরিমাণে এই দ্বীপ ৯২ চতুরস্র হস্ত এবং জল হইতে প্রায় দুই হস্ত উচ্চ। নির্ম্মাণ কালে ইহার চারিকোণে চারিটী চেনার বৃক্ষ ছিল। এইজন্য ইহার নাম চা'রচেনার হইয়াছে। কিন্তু অধুনা কেবল দুইটীমাত্র বিদ্যমান আছে। ইহার মধ্যস্থলে তিন হস্ত উচ্চ ৩৬ হস্ত দীর্ঘ এবং ৩০ হস্ত প্রশস্ত প্রস্তর-নির্ম্মিত আসন রহিয়াছে। তদুপরি ১।০ হস্ত উচ্চ এবং ১৭ চতুরস্র হস্ত আয়-

তন বিশিষ্ট আর একটী ক্ষুদ্র প্রস্তরাসন দৃষ্ট হয়। তদুপরি উপবেশন পূর্ব্বক দর্শন করিলে হ্রদের কি রমণীয়তা!! চারিদিকে জলরাশি ধূ ধূ করিতেছে—ছয় হাত জলের নীচে মৎস্যগণ ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে—জলজলতা জল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার জন্য যেন প্রয়াস পাইতেছে, স্পষ্ট লক্ষ্য হয়—নীলবর্ণ আকাশ পবিত্র হ্রদগর্ভে প্রতিফলিত—তটস্থ বৃক্ষ, উপবন, পর্ব্বত সমূহ মূলদেশ ঊর্দ্ধে সংস্থাপন পূর্ব্বক নতশিরে প্রতিবিম্বিত—সমাগত তরণীর চাপ্‌পাঘাতে সমুদয় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া আর এক প্রকার নূতন আকারে পরিণত—সম্মুখে ক্ষেত্র সমুদয় জলের উপর ভাসমান—দক্ষিণ পার্শ্বে হজরৎবল ও নসীমবাগ শোভায়মান—পশ্চাৎ ও বামভাগে শালামার, নিষাৎ ও চশমাসাহী প্রভৃতি মনোহর ক্রীড়া উপবনের কিয়দংশমাত্র প্রত্যক্ষীভূত—পাছে তৎসমুদয় ঝটিকারূপ অনিবার্য্য নৈসর্গিক দস্যু দ্বারা উচ্ছেদদশা প্রাপ্ত হয়, একারণ করুণাময় ঈশ্বর উহাদিগের পশ্চাদ্ভাগে অভেদ্য ও অনুল্লংঘনীয় শৈলপ্রাকার নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, এ সব দেখিলে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হয়।

পূর্ব্বতন ভ্রমণকারীরা বর্ণনা করিয়াছেন, যে, এই চা'রচেনারের মধ্যদেশস্থ আসনোপরি একটী প্রস্তরের মন্দির এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বে পুষ্পবাটিকা ছিল। কিন্তু অধুনা তাহার নিদর্শন মাত্রও নাই। মহারাজা রণজিৎ সিংহের অধিকার কালে দেওয়ান কৃপারাম * নামক এক জন শাসনকর্ত্তা এই ক্রীড়াদ্বীপ নির্ম্মাণ করেন।

* কৃপারাম অতিশয় ইন্দ্রিয়-ভোগ-বিলাসী ছিলেন। তিনি যে সমুদয় তরণীতে বিহার করিতে যাইতেন, তাহার অধিকাংশ তরুণ-বয়স্কা পরমা সুন্দরী

[রঘুনাথপুর] হ্রদের উত্তর প্রান্তে এই ক্ষুদ্র পল্লী। ইহাতে একটী উৎস আছে। উহার জল অতিশয় স্বাদু ও শীতল। এখানে মহারাজার চাউল, ময়দা প্রভৃতির জলযন্ত্র আছে। এবং এখানে বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয় জলযন্ত্র দ্বারা রেসম প্রস্তুত করিবার কারখানা নূতন প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপন অসীম বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন ও রেসমের প্রচুর উন্নতি সাধন করিয়াছেন।*

[শালামার বাগ] (শালা—গৃহ এবং মার—কন্দর্প) প্রত্যুত ইহা যেরূপ মনোহর, তাহাতে ইহার এই নাম প্রকৃতই হইয়াছে। ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ক্রীড়া উপবন এবং জাহাঙ্গীর বাদসাহ দ্বারা নির্ম্মিত। ইহা হ্রদের উত্তর-পূর্ব্ব-কোণে স্থিত এবং ২৪ হস্ত প্রশস্ত ও প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দীর্ঘ এক কৃত্রিম প্রণালী দ্বারা সংযুক্ত। এই প্রণালীর উভয় পার্শ্বে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষচ্ছায়াময় ও দূর্ব্বাদল-শোভিত সুবিস্তৃত বর্ত্ম আছে। হ্রদ ও প্রণালীর সঙ্গম-স্থানে ভগ্নাংশ দেখিয়া বোধ হয়, পূর্ব্বকালে প্রস্তর নির্ম্মিত মনোহর দ্বার ছিল।

শালামার দৈর্ঘ্যে ১১৮০ হস্ত এবং প্রস্থে নিম্ন দেশে ৪১৪

মহিলাবৃন্দের সুকোমল হস্তে বাহিত হইত। আবার কোনো কোনোটাতে মাঝিরা স্ব স্ব প্রণয়িণী সমভিব্যাহারে উপবেশন পূর্ব্বক বাহিত। তিনি নাবিকদিগকে প্রণয় সম্বলিত নূতন প্রকারের চাপ্ পা আঘাত করিতে শিখাইয়াছিলেন। একারণ অদ্যাপি তৎসমুদয় "কৃপারামী চাপ্ পা" নামে খ্যাত আছে। সেই সমুদায়, বিশেষতঃ চাপ্ পা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবলমাত্র পদাঘাতে নৌকা চালন, ভোগবিলাসী প্রণয়ী জনগণের অতি প্রিয়। যেহেতু তদ্দারা আরোহীদিগের শরীরে রোমাঞ্চ প্রভৃতি সাত্ত্বিকভাবের লক্ষণ আবির্ভূত হইয়া থাকে।

ও উপরিভাগে ৫৩৪ হস্ত। ইহার চারিদিকে ইষ্টক ও প্রস্তর নির্ম্মিত ছয় হস্ত উচ্চ প্রাচীর আছে। ইহা চারিতল। সকল তলই প্রায় সম-আয়তন।

এই উপবন এবং পশ্চাল্লিখিত কয়েকটী যেরূপ প্রণালীতে প্রণীত এবং কৃত্রিম উৎস ও জল-প্রপাতাদি থাকাতে যেরূপ প্রীতিকর, তাহা বিনা দৃষ্টিতে বোধগম্য হওয়া সুকঠিন। কেননা আমাদিগের দেশে এমন কোনো পদার্থই নাই, যাহার সহিত ইহাদিগের তুলনা হইতে পারে। বোধ করি, বাগান যে আবার ত্রিতল, চারিতল, দশতল হয়, ইহাই অনেকের কল্পনা পথে আইসে না। ইহা দ্বিতল কি ত্রিতল কোটার ন্যায় এক তলের উপরি অপর তল সংস্থাপিত, এরূপ ভাবে নহে। মনে কর, কোনো অত্যুচ্চ অনরল পর্ব্বতের নিম্নদেশ প্রথম তল, তদুপরি স্তবক দ্বিতীয় তল, তদুপরি তৃতীয় তল, এই ভাবেই উপবন সমূহের তল কথিত হইতে পারে। যিনি কখনো কোনো পর্ব্বতের গাত্রে স্তর-বিশিষ্ট শস্যক্ষেত্রের শ্রেণীপরম্পরা দেখিয়াছেন, তিনি ইহাদিগের নির্ম্মাণ কৌশল কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

পূর্ব্বোক্ত উদ্যানের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, ঠিক মধ্যদেশ দিয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় শ্রেণী আছে; এবং এক হস্ত গভীর ও ১৮ হইতে ২৮ হস্ত পর্য্যন্ত প্রশস্ত প্রণালী দ্বারা একের সহিত অপরটী সংমিলিত। এই সমুদয় জলাশয় ও প্রণালী সুচিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং বৃহৎ বৃহৎ অতি সুন্দর কৃত্রিম উৎস (ফোয়ারা) পরিপূরিত। সমুদয়ে ১৬৭ ফোয়ারা আছে। ইহার অধিকাংশই উপরিতন অর্থাৎ

চতুর্থ তলে স্থিত। উদ্যানের পশ্চাদ্ভাগস্থ গিরিদেশ হইতে জলধারা নিঃসৃত হইয়া উপরিতন তলে প্রবেশ করিতেছে। তথাকার ফোয়ারা সমুদয়কে বিবিধ প্রকার ক্রীড়াশালী করিয়া চিত্ত-বিমোহিতকর প্রপাত দ্বারা ঐ জলধারা নিম্নতলে পতিত হইতেছে। এইরূপে একাদিক্রমে সমুদয় তল পরিভ্রমণ পূর্ব্বক উদ্যান পরিত্যাগ করিয়া বহির্দ্দেশস্থ প্রণালীতে পতিত এবং পরিশেষে হ্রদে মিলিত হইয়া যাইতেছে।

উপরিতন তল সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ, মনোহর এবং প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। ইহাতে বিচিত্র প্রস্তর-নির্ম্মিত বিলাস-ভবন আছে। এখানকার জলাশয় এমন প্রণালীতে নির্ম্মিত, যে, দণ্ডায়মান হইলে কোনো স্থলে কটি, কোনো স্থলে বক্ষঃ ও কোনো স্থলে বা গ্রীবাদেশ জলে নিমগ্ন থাকে। সুতরাং পাঠক, বুঝিয়া লও, ইন্দ্রিয়সুখাসক্ত বাদশাহগণ এস্থলে অপরূপ রূপ-লাবণ্যবতী শত শত কামিনীগণকে উলঙ্গিনী করিয়া কিরূপ নির্লজ্জ আমোদ সহকারে জলবিহার করিতেন। সমুদয় ফোয়ারা ক্রীড়া করিতেছে—তাহাদের প্রত্যেকের মুখ হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জলধারা নিঃসৃত হইতেছে—কতক ধারা ঠিক সরলভাবে উত্থিত—কতক বা অতি সুন্দর বক্রভাবে পতিত। আবার কোনো কোনো ফোয়ারার মুখ অপ্রশস্ত করিয়া দেওয়াতে নিম্নলিখিত পারস্য কবিতার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিতেছে;—

হিম্মতে সাহেব দিলাঁ দর্ তঙ্গ্ দস্তী তঙ্গ্ নেস্ত।
আবে ফব্বরা যে তঙ্গী ম্যাল্ বালা মে কুনদ্ ॥

অর্থাৎ মহানুভব লোকের সদাশয় সমুদয় বিপন্নকালে

ম্রিয়মাণ না হইয়া অধিকতর উন্নত হইয়া থাকে। যেমন ফোয়ারার মুখ যত অপ্রশস্ত করিয়া দিবে, ততই জলের তেজ ঊর্দ্ধগামী হইবে।

আবার ঊর্দ্ধোত্থিত জলধারা সমুদয়ের উপরে সূর্য্যরশ্মি প্রতিবিম্বিত হওয়াতে সহস্র সহস্র ইন্দ্রধনু উৎপন্ন হইতেছে—নিক্ষিপ্ত জলকণা কতক বা উৎকৃষ্ট নীলবর্ণে, কতক বা উজ্জ্বল পীতবর্ণে, কতক বা অপর কোনো মনোহর বর্ণে শোভা ধারণ করিয়া পতিত হইতেছে—উদ্গত বাষ্পরাশি তরল অলক মেঘ বা কুজ্ঝটিকার ন্যায় চারিদিক আবৃত করিতেছে—এক তল হইতে অপর তলে জল গম্ভীর শব্দে পড়িতেছে—দেখিতে যে কি মনোহর, তাহা প্রকাশ করিবার শব্দ নাই। কথিত আছে, একদা শারদীয় রজনীযোগে সাহ আলম বাদসাহ এইউপবনে বিহার করিতেছিলেন; এমত সময় সহসা দেখিতে পাইলেন, কোনো বৃক্ষশাখায় একটী উজ্জ্বল পদার্থ চন্দ্রকিরণে প্রতিবিম্বিত হইয়া মনোহর কিরণজাল বিস্তারা করিতেছে। তদ্দর্শনে প্রীতিপ্রফুল্ল মনে অনুসন্ধানের পর অবগত হইলেন, যে. উহা সোণার ঝগ্ঝগা মাত্র, কোনো পতাকাচ্যুত হইয়া বৃক্ষশাখায় সংলগ্ন রহিয়াছে। মনে মনে আন্দোলন করিলেন, যখন এক বিন্দু ঝগ্ঝগাতে এত বিচিত্র শোভা উৎপাদন করিয়াছে, তখন উপবনস্থ সমুদয় বৃক্ষ স্বর্ণে মণ্ডিত হইলে অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিবে। বাদশাহদিগের যে চিন্তা, সেই কাজ। প্রধান সচিবকে আদেশ করিলেন, যে আগামী পৌর্ণমাসী রজনীতে এই উপবনের সমুদয় বৃক্ষ সুবর্ণপাতে মণ্ডিত হয়। সচিব এই আজ্ঞা কার্য্যে পরিণত

করিল। প্রত্যুত, অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ভোগবিলাসী বাদশাহগণ ঈদৃশ নন্দনবন সদৃশ উপবনে ইন্দ্রিয়সুখের একশেষ করিয়া গিয়াছেন।

[নিষাংবাগ] পারস্য ভাষায় নিষাৎ শব্দের অর্থ আনন্দ। এই উপবন শালামার উদ্যানের অদূরে স্থিত এবং উহারি ন্যায় সুরম্য ক্রীড়াকুঞ্জ। ইহাও জনৈক মোগলসম্রাট দ্বারা প্রণীত। ইহা হ্রদের পূর্ব্বভাগের মধ্যদেশে স্থিত। চতুষ্পার্শ্বে গগনস্পর্শী সফেদাশ্রেণী এবং সম্মুখে প্রথমতলে সুরম্য হর্ম্ম্য থাকাতে ইহা দূর হইতে স্পষ্টাক্ষরে দৃষ্টিগোচর হয় এবং দেখিতে অতি সুন্দর। ইহা ন্যূনাধিক সহস্র হস্ত দীর্ঘ, ৭২০ হস্ত প্রশস্ত এবং ইষ্টক ও প্রস্তরনির্ম্মিত অত্যুচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত। ইহা দশ তল। উপরিতন তিন তল অপেক্ষাকৃত উচ্চতর। শালামারের ন্যায় ইহারও মধ্যদেশ দিয়া জলাশয়শ্রেণী আছে এবং ৮ ইঞ্চ গভীর ও ৮ হস্ত প্রশস্ত প্রণালী দ্বারা পরস্পরে মিলিত। জলাশয় সমূহ ও প্রণালীটী সুচিক্কণ প্রস্তরনির্ম্মিত এবং সমুদয়ে ১৬৪টী ফোয়ারা আছে। যে জলধারা শালামার উদ্যানে প্রবেশ করিয়া তথাকার ফোয়ারা সমুদয়কে জল প্রদান করিয়া থাকে, উহারি এক প্রবাহ এস্থলে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তদ্রূপ প্রণালীতেই সমুদয় ফোয়ারাকে ক্রীড়াসক্ত করে। কিন্তু এখানকার প্রপাতগুলি ৮ হস্ত হইতে ১২ হস্ত পর্য্যন্ত উচ্চ, ঈষৎ ঢালু এবং খোদিত নানাবিধ প্রতিমূর্ত্তিতে শোভনীয়। সুতরাং এক-তল হইতে অপরতলে জলপতনকালে অনির্ব্বচনীয় শোভা উৎপন্ন হয় এবং এমন গভীর শব্দ হইতে থাকে, যে, কর্ণ বধির করিয়া ফেলে।

ইহাতে দুইটী মনোহর বিলাসভবন আছে। একটী নিম্নতলে, অপরটী সর্ব্বোচ্চতলে স্থিত। ইহাদিগের নির্ম্মাণকৌশল প্রশংসনীয় এবং ইহাদিগের মধ্যদেশস্থ ও চতুষ্পার্শ্বস্থ ফোয়ারাশ্রেণী অতীব মনোহর।

[সোণা লং অর্থাৎ সুবর্ণদ্বীপ] ইহা হ্রদের দক্ষিণ ভাগের মধ্যস্থলে এবং নিষাৎবাগ হইতে ২০ মিনিটের নৌকা পথে স্থিত। জনৈক মোগলসম্রাট রূপা লঙের সহিত সমকক্ষ করিবার জন্য এই দ্বীপ নির্ম্মাণ করেন। ইহা দৈর্ঘ্যে ৮০ হস্ত, প্রস্থে ৭২ হস্ত এবং জলের উপরিভাগ হইতে প্রায় দুই হস্ত উচ্চ। ইহার চতুঃপার্শ্ব দূর্ব্বাদলরঞ্জিত এবং অতি সরলভাবে জলের সহিত মিলিত। ইহাতে যে সমুদয় ইষ্টক ও প্রস্তরালয় ছিল, (যাহা পূর্ব্বকালে কারাগার স্বরূপে ব্যবহৃত হইত) এক্ষণে তাহাদিগের ভগ্নাবশেষ মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

[চশমাসাহী] (চশমা—উৎস) হ্রদের দক্ষিণপূর্ব্ব তট হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরবর্ত্তী এক অত্যুচ্চ পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে একটী মনোহর ক্ষুদ্র উপবন আছে। তথায় একটী অতি সুন্দর চশমা অর্থাৎ উৎস থাকাতে উহার নাম চশমাসাহী হইয়াছে। উদ্যানের দৈর্ঘ্য ২২৬ হস্ত, প্রস্থ ৮৪ হস্ত এবং চারি দিকে প্রায় ৪ হস্ত উচ্চ প্রাচীর আছে। শালামার ও নিষাৎবাগ যে প্রণালীতে প্রণীত, ইহাও তদ্রূপ। ইহা ত্রিতল। উদ্যানের দক্ষিণ প্রান্তে উক্ত উৎস স্থিত। উহার জল অতিশয় স্বচ্ছ ও স্বাদু এবং এমন শীতল, যে " জলের উঠেছে দাঁত, কার সাধ্য দেয় হাত ? " জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ় মাসেও পান করা দুষ্কর। ইহার জল উপবনস্থ সমুদয় ফোয়ারাতে গমন পূর্ব্বক

হ্রদে পতিত হইতেছে। এস্থলে দুইটী লড়ী অর্থাৎ কাষ্ঠনির্ম্মিত দ্বিতল বিলাসভবন আছে।

[পরী-মহল] হ্রদের দক্ষিণদিগস্থ অত্যুচ্চ পর্ব্বতের গাত্রে ইহা স্থিত এবং তট হইতে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরবর্ত্তী। ইহাতে উঠিতে ২০ মিনিট লাগে। নামটী শ্রবণ করিলেই সহসা বোধ হয়, ইহা কোনো বিচিত্র রম্য স্থান হইবে! পূর্ব্বে হয় তো তাহাই ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় অধুনা ইহার সৌভাগ্য-সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে—এখন কেবল ভগ্নাংশ পড়িয়া রহিয়াছে। ইহা ত্রিতল। প্রত্যেক তলে এক এক সুদীর্ঘ প্রাচীর এবং বারাণ্ডার কিয়দংশ ব্যতীত আর কিছুই নাই। জেহাঙ্গীর বাদশাহ স্বীয় গুরু আখুন মোল্লা সাহের পরামর্শে ইহাকে বিদ্যালয়ের জন্য নির্ম্মাণ করেন।

পরীমহলের উপরিভাগ হইতে হ্রদটী দেখিতে অতি সুন্দর। অতএব পাঠক চল, একবার ইহার সর্ব্বোপরি প্রাসাদে আরোহণ পূর্ব্বক উহার রমণীয়তা বিলোকন করা যাউক। ঐ দেখ, চারিদিকে অগাধ জলরাশি ধূ ধূ করিতেছে, মধ্যে মধ্যে ক্ষেত্র, দ্বীপ, কমলবন জলের উপর ভাসিতেছে; তটদেশে স্থানে স্থানে লোকালয় রহিয়াছে; গমনশীল তরণী (ব্যবধান জন্য) কখনো লক্ষ্য ও কখনো অদৃশ্য হওয়াতে বোধ হইতেছে, যেন গঙ্গা নদীতে শশক ভাসিতেছে; অতি দূরে হ্রদপুলিনে নসীম, শালামার, নিষাৎ প্রভৃতি উদ্যান সমূহ মস্তকোন্নত করিয়া যেন হ্রদের গভীরতা একতান-নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছে, ইত্যাকার নানাবিধ চিত্তাকর্ষণীয় পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়।

[থীড়] পরী মহলের বাম ভাগে হ্রদতটে এই পল্লী। এস্থান হইতে পরীমহলে উঠিবার এক সুগম চড়াই আছে।

[সেখ সফীবাগ] এই উপবন উক্ত পল্লীর নিকটবর্ত্তী। ইহা বাদশাহদিগের দ্বারা প্রণীত নয় বলিয়া অতি সামান্য। ইহার দুই প্রান্তে জনৈক পণ্ডিতের দুইটী ইষ্টকনির্ম্মিত অট্টালিকা আছে।

[চা'র-চেনার] পূর্ব্বোক্ত স্থান হইতে বাম ভাগে কিয়দ্দূরে অগ্রসর হইয়া কতিপয় ক্ষুদ্র ভাসমান ক্ষেত্র অতিক্রম পূর্ব্বক এই স্থানে উপনীত হইতে হয়। ইহা সুপ্রশস্ত ক্ষেত্রবক্ষে স্থিত এবং কোনো ক্রীড়া উপবন নহে। ন্যূনাধিক ৩০ চতুরস্র হস্ত পরিমিত ভূমির চারি কোণে চারিটী বৃহৎ চেনার বৃক্ষ আছে। একারণ, ইহাকে চা'র-চেনার কহে। এস্থানটী অতি রমণীয় এবং ইহাতে শিবির সংস্থাপন পূর্ব্বক বাস অতি উপাদেয় ও প্রীতিকর।

এস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাম ভাগে কিঞ্চিদ্দূর যাইলে সেই দ্রোগ্জন্ অর্থাৎ হ্রদ দ্বারে উপনীত হইতে হয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অদ্ভুত নৈসর্গিক ব্যাপার।

ক্ষীরভবানী। জটগঙ্গা। চলৎশক্তি বিশিষ্ট দ্বীপ। ত্রিসন্ধ্যা। রুদ্রসন্ধ্যা বা পবনসন্ধ্যা। কাঁস'রে কুঠ্ অর্থাৎ প্রস্তরভক্ষণ গৃহ। দশক্রোশ দূরবর্ত্তী চশমাদ্বয়ের পরস্পর সংযোগ। প্রস্তরের জলদান।

কাশ্মীরে কতিপয় সংখ্যক অদ্ভুত নৈসর্গিক ব্যাপার আছে। উহা এমত অলৌকিক, যে, দর্শন করিলে মুগ্ধ এবং হতজ্ঞান হইতে হয়। অনাদি অনন্ত বিশ্বপাতা ধরণীতলে কত স্থানে যে কত বিচিত্র ভৌতিক কাণ্ড সৃজন করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু এক স্থলে অনেকের সমবেত দর্শন অতিশয় বিস্ময়কর। অধিকন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে, অদ্যাপি উহাদিগের (দুই একটীর ব্যতীত) প্রকৃত কারণ স্থিরীকৃত হয় নাই এবং কোনোকালে যে মনুষ্যের ক্ষীণবুদ্ধি এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবে, এমত আশা তো এখন করা যায় না। অনেক স্থলে উষ্ণ প্রস্রবণ বা গন্ধকের আকর, অথবা অপর কিছু, কারণ স্বরূপে নিরূপিত হইয়াছে—কোনো স্থলে বা স্বার্থপর প্রতারণাজীবী পুরুষদিগের প্রবঞ্চনা প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু এখানকার নৈসর্গিক ব্যাপার সমূহ এরূপ স্বভাবাপন্ন, যে, যিনি স্বীয় মার্জ্জিত বুদ্ধিবলে যত কিছু কারণ নির্দ্দেশ করিতে প্রয়াস করিয়াছেন, তাহার একটীও প্রয়োগ-

শীল হয় নাই এবং কোনো কালে যে হইবে, এমনও বোধ হয় না। এ কারণ এখানকার লোকে এতৎসমুদয়কে ঐশিক বলিয়া স্বীকার করে এবং এই কারণেই তন্মধ্যে কয়েকটী হিন্দুদিগের তীর্থস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে পাঠক সাধারণের গোচরার্থ প্রকাশ করা উচিত, যে, আমি ইহার, অনেক গুলি চক্ষুষ দর্শন করিয়াছি এবং সাবকাশ বিরহে বা অপর কোনো প্রতিবন্ধকতা বশতঃ যে কয়েকটী দেখিতে বঞ্চিত আছি, (সম্পূর্ণ মানস, সুবিধামতে অবশিষ্টগুলি দেখিয়া চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিব এবং তজ্জনিত অনুপম বিস্ময়-রসে মগ্ন হইব) তৎসমুদয়ের প্রকৃত বিবরণ (যাহা এস্থলে প্রকটিত হইতেছে) সব্বিদ্বান ও কুসংস্কার বর্জ্জিত বান্ধব মহোদয়গণের মুখেই শ্রবণ করিয়াছি। তাঁহারা আপনাপন চক্ষেই সে সব দর্শন করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের বাক্যে বিশ্বাস না করিলে প্রত্যবায় আছে। তাঁহাদিগের দেখা ও আমার নিজের দেখা, প্রায় একই কথা। কুসংস্কারাপন্ন অজ্ঞ লোকে এতৎসমুদয় সম্বন্ধে যে কত অলৌকিক কাল্পনিক আখ্যায়িকা প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহার সীমা নাই। আমি তৎসমুদয় উপেক্ষা পূর্ব্বক প্রত্যেকের প্রকৃত বিবরণ বিবৃত করিতেছি।

[প্রথম, ক্ষীরভবানী] ইহা উত্তরভাগস্থ সায়ের মোয়াজ-পাইঁ (নিম্ন দেশস্থ) পরগণায় স্থিত এবং শ্রীনগর হইতে সেস্থান ন্যূনাধিক তিন ঘণ্টার নৌকাপথ। শ্রীনগর অতিক্রম করিয়া বিতস্তা নদী পরিত্যাগ পূর্ব্বক দক্ষিণ পার্শ্বস্থ প্রণালী দ্বারা গমন করা আবশ্যক। তদনন্তর নল, হোগলা প্রভৃতি জলজলতা পূর্ণ কতিপয় জলপথ উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক একটী ক্ষুদ্র

দ্বীপে উপনীত হইতে হয়। উহাতে কয়েকখানি সামান্য লোকালয় আছে। উপকূল সন্নিকটে প্রবেশ দ্বারে একটী ক্ষুদ্র কুণ্ড। উহা আনুমানিক দশ চতুরস্র হস্ত পরিমিত এবং তিন হস্ত গভীর। মধ্যস্থলে ইষ্টক নির্ম্মিত ক্ষুদ্র উচ্চাসনে ধ্বজ-পতাকা সংস্থাপিত। ইহাই ক্ষীরভবানী দেবী। ইহা হিন্দু-দিগের প্রধান তীর্থ। যাত্রীগণ ক্ষীর অর্থাৎ পায়সান্ন প্রস্তুত করিয়া ইহাতে নিক্ষেপ পূর্ব্বক দেবীর উপাসনা করিয়া থাকে, একারণ ইহার নাম ক্ষীরভবানী হইয়াছে। এখানকার আশ্চর্য্য বিষয় এই, যে, কুণ্ডের জলের বর্ণ নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কোনো কোনো সময়ে অহোরাত্রি মধ্যে সবুজ, গোলাপী, রক্তিমা প্রভৃতি নানাবিধ বর্ণ একাদিক্রমে দৃষ্ট হয়। আবার কোনো কোনো সময়ে বা একবর্ণই উপর্য্যুপরি বহু দিবস ব্যাপিয়া থাকে। লোকে কহিয়া থাকে, যে, যখন দেবী কুপিতা বা অপ্রসন্নাবস্থায় দীর্ঘকালব্যাপী শোণিতাক্ত মূর্ত্তি ধারণ করেন, তখন রাজ্যমধ্যে কোনো দৈব দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়া প্রজাবর্গের সমূহ বিপদ উৎপাদন করে। নিক্ষিপ্ত পায়সান্ন এবং তদাধার মৃণ্ময় পাত্রে নিম্নদেশ পূর্ণ হইয়া গেলে মধ্যে মধ্যে কুণ্ডের পঙ্কোদ্ধারও করা হয়। কিন্তু তাহাতে ইহার স্বভাবের কোনো বৈলক্ষণ্যই জন্মে না।

অনেকে এই অদ্ভুত ব্যাপারের তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কুণ্ডের মৃত্তিকার এমন কি গুণ, যে, ক্ষণে ক্ষণে জলের বর্ণকে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলে! জড়পদার্থ সমুদায়ের গুণাগুণ ভৌতিক নিয়মাধীন। উহা সেই নির্দ্দিষ্ট নিয়মের সীমা তিল্লা-

র্দ্ধমাত্রও উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না। নীল, পীত, লোহিতাদি বর্ণ সমূহ সকল স্থানে ও সকল সময়েই আপনাপন স্বাভাবিক গুণ প্রকাশ করিয়া থাকে এবং পরস্পরে মিশ্রিত হইলে এক নূতন বর্ণ উৎপন্ন করে। সুতরাং যদি জলের বর্ণ কোনো নির্দ্দিষ্ট নিয়মে পরিবর্ত্তিত, অথবা তাহাতে বিশেষ বিশেষ সময়েই বিশেষ বিশেষ বর্ণ লক্ষিত হইত, তাহা হইলে স্বীকার করা যাইত, যে, এই কুণ্ডে নানাবিধ বর্ণোৎপাদক দ্রব্য সংস্থাপিত আছে। কিন্তু তাহা তো নয়—সময় ও নিয়মের কিছুমাত্র স্থিরতা নাই—একাধারে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ একাদিক্রমে প্রত্যক্ষ হইবার কারণ কি? এবং কেনই বা এক এক বর্ণ অপরকে অতিক্রান্ত করিয়া দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া থাকে? নিম্নদেশ পঙ্কে পরিপূর্ণ হইয়া গেলে তো ইহার স্বভাবের কোনো ইতর বিশেষ লক্ষ্য হয় না, ইহারই বা কারণ কি? এ সমুদয়ের সিদ্ধান্ত করা অতি দুরূহ। অপর, এই কুণ্ডের নিকটে এমন কোনো পর্ব্বত বা বৃক্ষাদি উচ্চ পদার্থ নাই, যাহার প্রতিবিম্বাদি দ্বারা ইহার জলের বর্ণের প্রতি ভ্রম জন্মিবার সম্ভাবনা। অনেকে মনে করিয়া থাকেন, যে, ইহাতে দক্ষিণাজীবী পুরোহিতদিগের প্রবঞ্চনা আছে। কিন্তু অদ্যাবধি তাহা ধৃত হয় নাই এবং একথা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়াই প্রতীত হয়। ঐন্দ্রজালিক নটীস্বরূপা প্রকৃতি দেবী ধরারূপ নাট্যশালায় যে কত সম্মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাদের দৃষ্টিভ্রম জন্মাইতেছেন, তাহার ইয়ত্তা ও সম্পূর্ণরূপ কারণ নির্দ্দেশ করা মনুষ্যের সামান্য বুদ্ধির কত সাধ্য হইবে!

[দ্বিতীয়, জটগঙ্গা] শ্রীনগরের দক্ষিণ ভাগে ডেঁসু নামক পরগণায় বনহামা নাম্নী এক গ্রাম আছে। ইহা স্থল পথে ন্যূনাধিক পাঁচ ক্রোশ; নৌকার পথ নাই। এস্থলে আনুমানিক ৫০ হস্ত ঊর্দ্ধ এক উচ্চ ভূমি আছে। উহা ঈষৎ ঢালু ও অসরল। নানাবিধ তরু, লতা ও গুল্মাচ্ছাদিত এবং বিহঙ্গম কুলের সুশ্রাব্য কণ্ঠস্বরে কূজিত হওয়াতে স্থানটী অতি রমণীয়। ইহার অধোভাগে ২০ হস্ত প্রশস্ত একটী নালা আছে। উহা সম্বৎসর কালই শুষ্ক থাকে। কিন্তু প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষ অষ্টমী তিথিতে প্রাগুক্ত উচ্চ ভূমির নানা স্থান হইতে জলবিন্দু নিঃসৃত হইয়া এই নালায় পতিত হয় এবং ইহাকে পরিপূর্ণ করিয়া দেয়। লোকে এই অবসরে মহা সমারোহ পূর্ব্বক তথায় উপনীত হইয়া স্নানাদি করিয়া থাকে। ইহাকেই জটগঙ্গা কহে।* আহা! কি আশ্চর্য্য! যে স্থান সম্বৎসর শুষ্ক, তথায় কোথা হইতে কেবল মাত্র এক নির্দ্দিষ্ট দিবসেই যে বারিধারা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, ইহার তত্ত্ব কে নির্ণয় করিয়া দিবে?

[তৃতীয়, চলৎশক্তি-বিশিষ্ট দ্বীপ] পূর্ব্বোক্ত পরগণার সান্নিধ্য মাচিহামা নামক পরগণায় একটী বৃহৎ জলাশয় আছে। লোকে উহাকে 'হাকের সর' কহিয়া থাকে। এই জলাশয়ে দ্বীপাকার কতিপয় বৃহৎ বৃহৎ ভূমিখণ্ড আছে। তৎসমুদয় এরূপ দৃঢ় ও বিস্তৃত, যে, তদুপরি বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষাদি

---

* ঐ উচ্চ স্থান মধ্যে যোগীশ্বর মহাদেব বসিয়া আছেন, তাঁহারই জটা হইতে জাহ্নবী নির্গতা হন, এবং তদানুষঙ্গিক অন্যান্য কথার কল্পনায় একখানি পুরাণ যে রচিত হয় নাই, ইহাই আশ্চর্য্য!

জন্মিয়া রহিয়াছে এবং গো বৎসাদি তথায় তৃণ ভক্ষণ পূর্ব্বক বিচরণ করে। আশ্চর্য্যের বিষয়, যখন প্রবল বায়ু বহিতে থাকে, তখন এই সমুদয় ভূখণ্ড স্থান-ভ্রষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ পরিচালিত হয়। তখন উহারা স্ব স্ব উপরি ভাগস্থ ঐ বৃক্ষাদি উদ্ভিদ ঐ আশ্রিত পশ্বাবলী ও তদ্রক্ষকগণকে বহন পূর্ব্বক ভারবাহী তরণীর ন্যায় মন্দ মন্দ গতিতে গমন করে, দেখিলে যেমন বিস্ময়ার্ণবে মগ্ন হইতে হয়, হর্ষে শরীর তেমনি লোমাঞ্চিত হইতে থাকে। ইহারা নিম্ন দেশস্থ মৃত্তিকা হইতে অসংলগ্ন, এজন্যই প্রবল বাত্যাঘাতে চালিত হয়। নাগরিক হ্রদের বর্ণনায় উল্লেখ করা গিয়াছে, যে, তথাকার ভাসমান ক্ষেত্র আবশ্যক মতে মনুষ্যকর্ত্তৃক ইতস্ততঃ আকর্ষিত ও নীত হইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষাদি ও মনুষ্য পশু পক্ষী-সমন্বিত বিস্তৃত ভূখণ্ড বাত্যাঘাতে স্থানান্তরিত হইতেছে, এ দৃশ্য যে কি পরমাদ্ভুত, তাহা বিজ্ঞ পাঠক ধ্যান করিয়া দেখুন। শুনিয়াছি, সুকেশ মণ্ডিত নামক স্থানে কোনো হ্রদে এই রূপ চলৎশক্তি-বিশিষ্ট দ্বীপ আছে। লোকে তৎসম্বন্ধে যে সমুদয় অদ্ভুত অলীক কল্পনা করিয়া থাকে, তাহা শুনিলে হাস্য সম্বরণ করা যায় না। কিন্তু তদ্বিষয়ের সমালোচনা এস্থলে অভিপ্রেত নহে।

[চতুর্থ, ত্রিসন্ধ্যা] দক্ষিণ ভাগস্থ ব্রিং নামক পরগণায় একটী সমকোণ চশমা অর্থাৎ কুণ্ড আছে। উহাকে লোকে সাধারণতঃ সুন্দবেরারি কহিয়া থাকে। এখানকার আশ্চর্য্য এই, যে, বৈশাখ মাসের মধ্য হইতে জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি সময় পর্য্যন্ত প্রত্যেক দিবাভাগে ঐ কুণ্ডের সপ্তস্থান হইতে জল

বিন্দু তিনবার নিঃসৃত হইয়া কুণ্ড পূর্ণ করে এবং প্রত্যেক বারে কিয়দ্দণ্ডমাত্র থাকিয়া অবসৃত হইয়া যায়। এইরূপে বারত্রয় আবির্ভূত ও তিরোহিত হয় বলিয়া হিন্দুরা ইহাকে ত্রিসন্ধ্যা কহে এবং তীর্থস্থান বলিয়া গণনা করে।

[**পঞ্চম, রুদ্র সন্ধ্যা বা পবন সন্ধ্যা**] পূর্ব্বোক্ত পরগণার দক্ষিণ পূর্ব্ব ভাগে সাহাবাদ নামক পরগণায় একটী ক্ষুদ্র চশমা অর্থাৎ কুণ্ড আছে। অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়, এই কুণ্ড সর্ব্বদা শুষ্ক থাকে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে অকস্মাৎ জল আসিয়া কিয়দ্দণ্ড মাত্র থাকিয়া অপসৃত হইয়া যায়। কখনো বা উপর্য্যুপরি কয়েক মাস পর্য্যন্ত এইরূপই চলিতে থাকে। আবার কখনো বা কতিপয় অহোরাত্রি এই ভাবে থাকিয়া একবারে শুষ্ক হইয়া যায়। আবার কিছুকাল পরে স্বকীয় স্বভাবানুযায়িক কার্য্য করিতে থাকে। একবার জল উদ্গত হইলে ক্ষণকাল অবস্থিতির পর এরূপে অন্তর্হিত হয়, যে, বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট থাকে না। পরক্ষণেই আবার প্রকাশিত, আবার লুক্কায়িত হয়! গণনা করিয়া দেখা হইয়াছে, যে, এই রূপে একাদশ বার আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে। এ কারণ ইহাকে রুদ্র সন্ধ্যা কহে। কেহ কেহ ইহাকে পবন সন্ধ্যাও বলিয়া থাকে। ইহা যে হিন্দুদিগের একটী তীর্থ স্থান, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। ত্রিসন্ধ্যার ন্যায় এস্থলে কোথা হইতে জল আসিয়া এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য জোয়ার ভাঁটা খেলিয়া থাকে, ইহা স্থিরীকৃত করিতে অনেক সুমার্জ্জিত বৈজ্ঞানিক মস্তিষ্ক ঘূর্ণিত হইয়া গিয়াছে! প্রত্যুত, এ সকল যেরূপ স্বভাবাপন্ন, তাহাতে উহাদিগের প্রকৃত গূঢ় কারণ নির্দ্দেশ করা দূরে থাকুক, অনু-

সন্ধানার্থ অনুমিতি বৃত্তি তত্ত্বপথে গমন করিতেও এককালে দিশাহারা হইয়া পড়ে!

[ষষ্ঠ, কাঁস'রে কুঠ অর্থাৎ প্রস্তর ভক্ষণ গৃহ] প্রাগুক্ত সাহাবাদ পরগণায় এক বৃহৎ গিরিগুহা আছে। ইহার নাম মণ্ডা। নামটী যেমন মধুর, এখানকার নৈসর্গিক ব্যাপারও তেমনি প্রীতিকর। পাঠক! শ্রুতিমধুর মনোহর মণ্ডা নাম শ্রবণ পূর্ব্বক অভ্যন্তরে প্রবেশ কর, সুশীতল সরস উপাদেয় ভোজ্য বস্তুতে উদর পূরণপূর্ব্বক তৃপ্তি লাভ হইবে। কিম্বদন্তী আছে, যে, ইহাতে প্রবেশ পূর্ব্বক ইহার অভ্যন্তরস্থ পদার্থ ভক্ষণ করিলে ঠিক বরফের ন্যায় শীতল স্বাদু অনুভূত হয়। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়! উহা ভক্ষণ করিতে করিতে বহির্দ্দেশে আসিলে আর সে শীতল বরফ থাকে না—এরূপ দৃঢ় প্রস্তরাকারে পরিণত হইয়া যায়, যে, আর তাহাতে কাহার সাধ্য দন্তস্ফুট করে? দুঃখের বিষয়, উপরিভাগ হইতে এক বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড পতিত হইয়া অধুনা তাহার প্রবেশ দ্বার সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তন্মধ্যে আর প্রবিষ্ট হওয়া যায় না, কিন্তু অর্দ্ধভুক্ত হিমশিলা দ্বারদেশের ইতস্ততঃ পড়িয়া রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। অনুমান হয়, এই গুহাভ্যন্তর অতি গভীর, নিবিড়ান্ধকার ও যৎপরোনাস্তি শীতল। আগন্তুক ব্যক্তি প্রবেশ মাত্রেই হয় তো শিথিলাঙ্গ ও চৈতন্যশূন্য প্রায় হইত। সুতরাং ভক্ষণ কালে গহ্বরস্থ মৃত্তিকার প্রকৃত স্বাদ অনুভব করিতে পারিত না। অথবা সূর্য্যাতপ ও বায়ু বর্জ্জিত গুহাভ্যন্তরস্থ পদার্থ সমুদয় নীহারাকারে পরিণত হইবে আশ্চর্য্য কি? পরে ভুক্ত দ্রব্য বহির্দ্দেশে

আনীত হইলে বায়ু সংস্রবে দৃঢ় হইয়া যায়। যদিও ইহার কারণ এইরূপে অনুমিত হইতে পারে এবং ইহাই প্রকৃত বলিয়া বোধ হয়, তথাপি এই ব্যাপারটী কতদূর অদ্ভুত তাহা পাঠকগণ অনুভব করুন।

[সপ্তম, দশক্রোশ দূরবর্ত্তী চশমাদ্বয়ের পরস্পার সংযোগ] দক্ষিণ বিভাগস্থ দেবসর নামক পরগণায় বাসুকিনাগ নামে এক চশমা অর্থাৎ কুণ্ড আছে। বসন্তকালের আগমন হইতে শস্য পরিপক্ক হইবার সময় পর্য্যন্ত এই চশমা জলে পরিপূর্ণ থাকে। এই সময় অতিবাহিত হইয়া গেলে আর ইহাতে বিন্দুমাত্রও জল থাকে না। ঐ জল ইহা হইতে অপসৃত হইয়া পীর-পঞ্জাল পর্ব্বতশ্রেণীর অপর পার্শ্বস্থ গোলাবগড় নামক চশমা পূর্ণ করে। তথায় ছয়মাস অবস্থিতির পর তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় এস্থলে আসিয়া আবির্ভূত হয়। এইরূপে এক এক চশমাতে ষান্মাসিক ক্রীড়া করিতে থাকে। এই চশমাদ্বয়ের পরস্পার দূরতা ন্যূনাধিক দশক্রোশ হইবে। এবং উভয়ের মধ্যে অভেদ্য পীর ভূধর ও কত কত স্রোতস্বতী, কানন, লোকালয় প্রভৃতি ব্যবধান রহিয়াছে। সুতরাং ইহা-দিগের পরস্পার সংযোগ যে কতদূর আশ্চর্য্য তাহা বলিবার শব্দ নাই। অপর, যদিও এই সংযোগ কল্পিত বলিয়া মনে করা যায়, তথাপি উঁহারা যে পর্য্যায়ক্রমে এবং নিয়মিত রূপে ছয়মাস শুষ্ক ও ছয়মাস পূর্ণ থাকে, তাহারই বা কারণ কি? বোধ হয়, এ প্রশ্নের উত্তরে কেবল এই মাত্র বলাই সঙ্গত, যে, যে অনন্ত-জ্ঞান অচিন্ত্য-শক্তি পূর্ণ-পুরুষ অনুপম কৌশল-পূর্ণ এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়াছেন, যাঁহার নির্ম্মিত

একটী রেণু হইতে অসংখ্য গ্রহ উপগ্রহ পর্য্যন্ত সকলই পরমাদ্ভুত, তিনিই বলিতে পারেন, পৃথিবীর কোন্ স্থানে কিরূপ অদ্ভুত ব্যাপার কি প্রয়োজনে সংযোজন করিয়া রাখিয়াছেন!

[অষ্টম, প্রস্তরের জলদান] উত্তরপূর্ব্ব ভাগস্থ লার পরগণায় একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর আছে। উহার নাম হলদর। উহার সন্নিকটে গমন পূর্ব্বক "হলদর জল দেও" বলিয়া কয়েকবার উচ্চৈঃস্বরে জল ভিক্ষা করিলেই হলদর স্বীয় সুশীতল গাত্র হইতে বিন্দু বিন্দু পরিমাণে জলদান করিয়া থাকে। এই ব্যাপারটী যে কতদূর অদ্ভুত, তাহা সকলে সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন—আমার বলিয়া দেওয়া বাহুল্য!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কাশ্মীরের পূর্ব্ববিভাগ।

প্রথম অংশ।

দৌড়দার কন্দার উৎপত্তি। রাম মুনসি বাগ। পাণ্ড্রেন। পাম্পুর—কেশরের জন্মস্থান। ফুক নাগ ও কালীশ নাগ। অবন্তীপুর। সমা থং। বিজ্বেহাড়া। খান্বল। অনন্তনাগ বা ইস্লামবাদ। মার্ত্তণ্ড বা মটন। বায়ন। ভূমজু গুহা।

যে সমুদয় দ্রষ্টব্য স্থানের নাম দ্বারা এই অধ্যায়ের শিরোদেশ অঙ্কিত করা গেল, ঐ সকল দেখিতে গেলে খানবল পর্য্যন্ত নৌকাপথে এবং অবশিষ্ট ভাগ (যাহা অধিকতর রমণীয়) স্থলপথেই গমন করিতে হয়।

শ্রীনগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুনসিবাগ (যথায় ইংরাজ-দিগের নিমিত্ত বিরামভবন নির্ম্মিত আছে) অতিক্রম করিয়া উজান যাইতে হইলে আদৌ কতিপয় বাঁক দৃষ্ট হয়। কোনো উচ্চ স্থান হইতে দেখিলে উহা যেন দৌড়দার কল্কা, এমন স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে এবং উহা দেখিয়াই যে দৌড়দার কল্কার সৃষ্টি হইয়াছে তাহাও মনে লাগে। এস্থানে বিতস্তানদী এমন বক্র-গতিতে গমন করিয়াছে এবং পূর্ব্ববর্ণিত শঙ্করাচার্য্যের টিব্বার স্থিতি-ভাব এরূপ আশ্চর্য্য, যে, কয়েক ক্রোশ পর্য্যন্ত যতই অগ্রসর হই এবং যেস্থান হইতেই দেখি, টিব্বাটী অমনি সেই দিগেই যেন সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে!

[রামমুনসিবাগ] কিয়দ্দূর গমন করিলেই এই উপবন। ইহাতে সেউ, নাসপাতি, তুঁত, আঙ্গুর প্রভৃতি সুস্বাদু ফলের বহুসংখ্যক বৃক্ষ আছে। সুতরাং স্থানটী অতি রমণীয় এবং এখানে শিবির স্থাপন পূর্ব্বক বাস অতি প্রীতিকর।

[পাণ্ড্রতন] বোধ হয়, "পুরাতন আদি স্থান" শব্দের অপভ্রংশ। ইহা একদা কাশ্মীরের রাজধানী ছিল। কাশ্মীরের পুরাবৃত্ত পাঠে অবগত হওয়া যায়, যে, সুপ্রসিদ্ধ নৃপতি চন্দ্র-গুপ্তের পৌত্র অশোক (যিনি খৃষ্টাব্দের ২৬৩ পূর্ব্ব হইতে ২২৬ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন) এই স্থানে একটী অত্যুৎ-কৃষ্ট মন্দির স্থাপন করেন। এবং ইহাতে বুদ্ধের এক দন্ত রক্ষিত ছিল। অনন্তর ৬৩০ খৃষ্টাব্দে কাণ্যকুব্জাধিপতি অভি-মন্যু অগ্নি সংযোগে এই জনপদ একবারে উচ্ছিন্ন করিয়াছেন। অদ্যাপি অনেকানেক দেবালয় ও হর্ম্ম্যের ভগ্নাংশ চারিদিকে নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে এবং অনুমান ৮০ চতুরস্র হস্ত পরিমিত

কুণ্ডের মধ্যে প্রস্তরনির্ম্মিত একটী অত্যুত্তম ও অতি প্রাচীন দেবালয়ও দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ হয়, ইহা কুণ্ডের মধ্যে স্থিত বলিয়া হুতাশনের সর্ব্ব-ভোগ্য প্রভাব হইতে নিস্তার পাইয়া থাকিবে।

[পাম্পুর—কেশরের (জাফরান) জন্মস্থান] ইহা নদীর দক্ষিণতটে স্থিত। শ্রীনগর হইতে ইহা স্থলপথে চারি ক্রোশ। কিন্তু নদীর গতি অতিশয় বক্র এবং উজান আসিতে হয় বলিয়া নৌকা দ্বারা ছয় বা সাত ঘণ্টা লাগে। এক সহস্র বৎসরাধিক হইল, পদ্ম নামে জনৈক নরপতি এই নগর স্থাপন করেন। পূর্ব্বে ইহার নাম পদ্মপুর (পদম্‌পুর) ছিল। আধুনিক পাম্পুর উক্ত নামের অপভ্রংশ এবং উহার পূর্ব্বতন গৌরবের ধ্বংসাবশেষ মাত্র। এই স্থানে কেশরের বিচিত্র ক্ষেত্র আছে। কার্ত্তিক মাসে উহার পুষ্প প্রস্ফুটিত হইলে অনুপম শোভা উৎপন্ন হইয়া থাকে। কেশর অর্থাৎ জাফ্‌রাণের ক্ষেত্র-সংস্করণ, বীজ-বপন, পুষ্প উদ্গমন এবং জাফরাণ আহরণ অতীব বিস্ময়কর ব্যাপার। স্বতন্ত্র অধ্যায়ে তাহার সবিশেষ বর্ণনা করা যাইবে।

[ফুক্‌নাগ ও কালীশনাগ] পাম্পুরের উত্তর-পূর্ব্ব ভাগে স্থলপথে ন্যূনাধিক দেড়ক্রোশ দূরে এক ক্ষুদ্র পল্লী আছে। তথায় তিনটী ধাতু-মিশ্রিত এবং একটী পরিষ্কার জলময় উৎস দৃষ্ট হয়। প্রথমোক্ত তিনটীকে ফুক্‌নাগ কহে। উহাদিগের জল গন্ধক-বিশিষ্ট। গন্ধ দ্বারা দূর হইতেই উহাদিগের স্থিতি অনুভব করিতে পারা যায়। উক্ত পল্লীর দক্ষিণ ভাগস্থ পাহাড়ের তলদেশের তিন স্থান হইতে জল নিঃসৃত

হইয়া এক ক্ষুদ্র প্রণালীতে পতিত হইতেছে। প্রণালী প্রস্তর নির্ম্মিত, এক ফুট গভীর ও এক ফুট প্রশস্ত। উহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য আছে। এই প্রণালী দিয়া জল নির্গত হইয়া অনুমান ষষ্ঠি হস্ত দূরবর্ত্তী মহম্মদ শার কাষ্ঠনির্ম্মিত প্রাচীন জেয়ারতের মধ্য দিয়া গমন করতঃ প্রবাহিত হইতেছে।

ঐ পরিষ্কার জলের উৎসটীকে কালীশ নাগ কহে। ইহা ফুকনাগ হইতে অল্পদূরবর্ত্তী এবং পূর্ব্বোক্ত পাহাড়ের পশ্চিম দিক হইতে নির্গত। ইহার জল একটা কুণ্ডে পতিত হই-তেছে। কুণ্ডটী এক ফুট গভীর, সমকোণ ও এক এক দিকে বিংশতি হস্ত পরিমিত। ইহার চতুঃপার্শ্ব প্রস্তর নির্ম্মিত। ইহাতেও ঐরূপ মৎস্য আছে। ইহা হইতে জল নিঃসৃত হইয়া পূর্ব্বোক্ত জেয়ারতের পশ্চিম ভিত্তির নিম্ন ভাগ দিয়া গমন করতঃ ফুক্‌নাগের সহিত মিলিত হইয়াছে এবং দক্ষিণ-বাহী হইয়া অন্য দিগে চলিয়া গিয়াছে।

ফুক্‌নাগের জলে লৌহ ও গন্ধকের অধিক পরিমাণ আছে। এ কারণ উহা অতিশয় স্বাস্থ্যকর ও ভৈষজ্য-গুণ-বিশিষ্ট। যে সমুদয় বিখ্যাত ডাক্তার ইহার জল পরীক্ষা করিয়া দেখি-য়াছেন, তাঁহারা কহেন, যে, ইহার জল পান ও ইহাতে স্নান করিলে বহুকালব্যাপী বাতরোগ, কুষ্ঠ, কণ্ডূ ও বিবর্ণতা প্রভৃতি ত্বক্‌ব্যাধি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, রক্তাতিসার ও আমাশয়াদি উদর পীড়া এবং প্লীহারোগ প্রভৃতি উৎকট উৎকট ব্যাধি উপশম হইয়া থাকে।

[অবন্তীপুর] ইহা দক্ষিণ তটে স্থিত। শ্রীনগর হইতে স্থলপথে ১৭ মাইল; নৌকাপথে গেলে ১৫ পঞ্চদশ ঘণ্টা

লাগে। নরপতি অবন্তী বর্ম্মা ইহা স্থাপন করেন বলিয়া ইহার নাম অবন্তীপুর হইয়াছে। ইহাও এককালে কাশ্মীরের রাজ-ধানী ছিল। ভগ্নাংশ সমূহ দেখিয়া স্পষ্ট প্রতীতি হয়, যে, ইহা প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং অতি উৎকৃষ্ট জনপদ ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে কতিপয় মন্দিরাদির অবশিষ্টাংশ ব্যতীত আর কিছুই নয়নগোচর হয় না।

[সমা থং] কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া বামতটে এক উচ্চ গিরি দেখিতে পাওয়া যায়। উহার শিখর দেশে একটী অতি প্রাচীন মন্দির আছে। উহাকেই সমা থং কহে। লোকে কহিয়া থাকে, যে, যখন কাশ্মীর প্রদেশ জলে মগ্ন ছিল, তখন মহাত্মা কশ্যপ এই স্থানে যোগাসনে বসিয়া সহস্র সহস্র বৎসর অতিবাহিত করেন।

[বিজ্‌বেহাড়া] বোধ হয়, ইহা "বিদ্যাবিহার" শব্দের অপভ্রংশ হইবে। এই প্রাচীন জনপদ অবন্তীপুর হইতে চারি ক্রোশ দূরবর্ত্তী। কিন্তু নৌকা করিয়া যাইতে হইলে ন্যূনা-ধিক দশ ঘণ্টা লাগে। এস্থানে একটী কাষ্ঠনির্ম্মিত সেতু আছে। খৃষ্টাব্দের ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে অশোক রাজা এই স্থলে একটী উৎকৃষ্ট মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মুসলমানদিগের শাসনকালে সিকন্দর নামা জনৈক শাসনকর্ত্তা উহা ধ্বংস করিয়া উহার প্রস্তরাদিতে মসজীদ প্রস্তুত করেন। মহারাজা গোলাপ সিংহ উক্ত মসজিদ নষ্ট করতঃ অপর এক মন্দির নির্ম্মাণপূর্ব্বক ধর্ম্মের বিজাতীয় প্রতিশোধ লইয়াছেন। নগর অতিক্রম করিয়াই এক অত্যুত্তম ক্রীড়া উপবনের চিহ্ন নয়নগোচর হয়। ভগ্নাংশ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা যায়, ইহা

নদীর উভয় তট পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং প্রস্তর-নির্ম্মিত সেতু দ্বারা সংযুক্ত ছিল।

বিজ্‌বেহাড়া পরিত্যাগ করিয়া যতই পুরোবর্ত্তী হওয়া যায়, ততই বিতস্তানদী প্রস্থে ও গভীরতায় হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। কিয়দ্দূরে (খান্‌বলের দুই এক মাইল্ থাকিতে) লিদ্দর নদী দুই সুবিস্তৃত শাখা বিস্তার দ্বারা উহার সহিত মিলিত হইয়াছে।

[খান্‌বল] ইহা বিতস্তানদীর দক্ষিণতটে স্থিত এবং অতি ক্ষুদ্র পল্লী। বিজ্‌বেহাড়া হইতে ইহা প্রায় ৪ মাইল। কিন্তু জলপথে প্রায় ৩ ঘণ্টা লাগে। এস্থলেও একটী কাষ্ঠনির্ম্মিত সেতু আছে। ইহা অতিক্রম করিয়া নদী অতি অগভীর বলিয়া নৌকা আর যাইতে পারে না। একারণ, পর্য্যটকদিগকে স্থল-পথেই, গমন করিতে হয়। বন্‌হাল পথ দিয়া কাশ্মীরে আসিলে এই স্থানে নৌকারোহণ পূর্ব্বক শ্রীনগরে যাইতে হয়।

[অনন্তনাগ বা ইস্‌লামাবাদ] অতি প্রাচীন কালাবধি হিন্দু রাজাদিগের শাসনসময়ে এই জনপদের নাম অনন্তনাগ ছিল। পরে মুসলমান অধিপতিরা ইহার নাম ইস্‌লামাবাদ রাখেন এবং এই নামে ইউরোপীয় সমাজে ও ভূগোল গ্রন্থে খ্যাত হইয়াছে। ইহা খান্‌বল হইতে প্রায় এক মাইল দূর-বর্ত্তী, অতি প্রাচীন জনপদ এবং বন্‌হাল পথের শেষ আড্ডা। কয়েকটী অত্যুত্তম উৎস থাকাতে এই স্থানটী অতি রমণীয়। উহাদের মধ্যে অনন্ত-নাগই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

অনন্তনাগ এক পাহাড়ের তলদেশ হইতে নিঃসৃত হইয়া এক কুণ্ডে পতিত হইতেছে। কুণ্ডটী ৫৫ চতুরস্র ফিট পরি-

মিত এবং প্রায় তিন ফিট গভীর। ইহার চতুষ্পার্শ্ব কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে বাঁধানো। এই অগভীর জলে অসংখ্য অসংখ্য মৎস্য নির্ভয়ে কেলি করিয়া বেড়াইতেছে, দর্শকদিগের প্রদত্ত ময়দা, চাউল, রুটি বা লুচি প্রভৃতি আহার করিবার নিমিত্ত এক স্থলে সহস্র সহস্র একত্র হইতেছে, এক অংশ লইয়া অনেক-গুলি পরস্পরে কলহ করিতেছে—দেখিতে অতি বিচিত্র। উহাদিগকে ধৃত করিলে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতে হয় এবং কেই বা এমন পামর আছে, যে, এই সুদৃশ্য ও লোচনানন্দদায়ক জীবদিগকে ধরিয়া আপন উদরপূর্ত্তির লালসা রাখে? পঞ্চাশ ফিট দীর্ঘ ও সার্দ্ধ সাত ফিট প্রশস্ত এক প্রণালী দ্বারা উক্ত কুণ্ড হইতে জল নির্গত হইয়া দ্বিতীয় কুণ্ডে পড়িতেছে। এই জলাশয়ও প্রথমোক্তের ন্যায় অতি মনোহর, বরং উহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহৎ। ইহাতেও অনেক মৎস্য আছে। অনন্তর আর একটী প্রণালী দ্বারা ইহার জল নির্গত হইয়া ৭ ফিট উচ্চ ও ৭ ফিট প্রশস্ত অতি সুন্দর প্রপাত পৃষ্ঠে সংলগ্ন ভাবে অতি প্রখর বেগে উপবনের বহির্দ্দেশে পতিত হইতেছে। এই প্রপাতের উপরিভাগে উত্তম বিশ্রাম-ভবন আছে।

অনন্তনাগের পূর্ব্বভাগে কতিপয় পাদ দূরে আর একটী উত্তম উৎস দেখা যায়। উহা গিরিতল হইতে নিঃসৃত হইয়া এক কুণ্ডে পতিত হইতেছে। ইহার জল অতিশয় স্বাদু ও স্বাস্থ্যকর এবং প্রণালী দ্বারা ইস্‌লামাবাদের অনেক স্থানে নীত হয়। এই কুণ্ডে আরো দুইটী উৎস আসিয়া সংমিলিত হইয়াছে। উহার মধ্যে একটীর জল মূলদেশে বিম্বাকারে যেন ফোয়ারা

হইতে নির্গত হইতেছে এবং অতিশয় নির্ম্মল ও স্বাদু। অপ-রটীর জল ঈষৎ গন্ধকময় এবং পূর্ব্ববর্ণিত ফুকনাগের জলের ন্যায় ভৈষজ্যগুণ-বিশিষ্ট।

[মার্ত্তণ্ড বা মটন] অনন্তনাগের উত্তরে পাঁচ মাইল দূরে ইহা স্থিত। ইহা হিন্দুদিগের অতি প্রসিদ্ধ তীর্থ। আমা-দিগের দেশে যেমন গয়াধামে স্বর্গগত পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানাদি করে, এখানেও কাশ্মীরীরা এবং আগন্তুক হিন্দু-মাত্রেই তদ্রূপ করিয়া থাকে। এখানকার জীর্ণ-দেবায়তন অতি বিচিত্র ও বিস্ময়কর। কোন্ কালে যে ইহা নির্ম্মিত হয়, তাহা নিশ্চয় করা সুকঠিন। কিন্তু বোধহয়, ইহা পাণ্ডবদিগের একটী অক্ষয় কীর্ত্তি এবং এই কারণেই কাশ্মীরীরা ইহাকে পাণ্ডুলড়ী কহে। ভিগ্নি সাহেব এতৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন, যে, এই প্রাচীন দেবালয় কেবলই যে কাশ্মীর প্রদেশের উৎসা-দনের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এমত নহে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র যে সমুদয় পূর্ব্বকালীন স্থপতি বিদ্যার অত্যুৎকৃষ্ট চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা তত্তাবতের অগ্রগণ্য। এস্থান হইতে কাশ্মীরের শোভা কি রমণীয় দেখায়!

[বায়ন] মার্ত্তণ্ড হইতে দেড় মাইল দূরে এই ক্ষুদ্র পল্লী। এস্থলে একটী উৎকৃষ্ট উৎস আছে। ইহাও হিন্দু-দিগের এক প্রধান তীর্থ। উৎসটী অনন্তনাগ অপেক্ষা অনেক বৃহৎ এবং গিরিতল হইতে নির্গত হইয়া উহার ন্যায় একাদি-ক্রমে অনেকগুলি কুণ্ড ও প্রণালী বাহিয়া প্রবাহিত হওতঃ বহির্দ্দেশস্থ মনোহর চেনার উপবনের মধ্য দিয়া ১৫ ফিট নীচে

এক জলাশয়ে পতিত হইতেছে। অনন্তনাগের সদৃশ এখান-কার জলাশয়নিচয়ে সুদৃশ্য মৎস্য আছে।

[ভূমজু গুহা] ইহাও হিন্দুদিগের প্রসিদ্ধ তীর্থ এবং পূর্ব্বোক্ত পল্লীর অনতিদূরে স্থিত। এস্থলে কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং দুইটী অতি দীর্ঘ ও অদ্ভুত গিরিকন্দর আছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুলি দেখিয়া স্পষ্ট প্রতীতি হয়, উহা পুরাকালিক যোগীদিগের আবাসস্থল ছিল। অপর দুইটী এমন বিচিত্র, যে, উহা হয় নিসর্গোৎপন্ন নয় মহাবলাক্রান্ত দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেন অথবা তৎসদৃশ কোনো মহাপুরুষ কর্ত্তৃক রচিত। প্রথম গুফা এমন দীর্ঘ ও নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন, যে, দীপালোক ব্যতীত ইহাতে প্রবেশ করা যায় না। একারণ নিকটবর্ত্তী পল্লী হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মশাল সংগ্রহ করা আবশ্যক। ইহাকে কালদেবের গুফা কহে। প্রথমে কয়েকটী অসরল সোপান শ্রেণী দ্বারা ৪০ ফিট ঊর্দ্ধে আরোহণ করতঃ প্রবেশ দ্বারে উপনীত হইতে হয়। ইহা ঊর্দ্ধে ৬॥০ ফিট এবং প্রস্থে ৩॥০ ফিট। কন্দরাভ্যন্তর ন্যূনাধিক দেড়শত হস্তের পর এমন সংকীর্ণ, যে, আর অগ্রসর হওয়া যায় না। সুতরাং ইহার প্রকৃত দৈর্ঘ্য নির্ণয় করা নিতান্তই অসম্ভব। অনেকে কহিয়া থাকে, যে, ইহার অন্ত নাই। ইহাতে বিস্তর বাদুড় বাস করে। স্থানে স্থানে ছাদ হইতে জলবিন্দু নিপতিত হইয়া সুন্দর সুন্দর বিবর নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রবেশ দ্বার হইতে কিয়দ্দূর গমন করিয়া বামভাগে এক সংকীর্ণ পথ পাওয়া যায় এবং এস্থান হইতে অনুমান ৪০ হস্ত দূরে এক ক্ষুদ্র গোল প্রকোষ্ঠ দৃষ্ট হয়। কয়েক বৎসর হইল, ডাক্তার ইন্স

সাহেব ইহাতে মনুষ্যকঙ্কাল দেখিয়াছিলেন। প্রত্যুত, এই কন্দর এবং পশ্চাল্লিখিত গুহাটী এমনি বিচিত্র, যে, ইহা-দিগকে চতুর্থ পরিচ্ছেদ অর্থাৎ অদ্ভুত নৈসর্গিক ব্যাপার অধ্যা-য়ের অন্তর্গত করা যাইতে পারিত।

এই গুহার সন্নিকটে আর একটী রমণীয় গুফা আছে। অনুমান এক শত ফিট ঊর্দ্ধে আরোহণ পূর্ব্বক উহাতে প্রবেশ করিতে হয়। প্রবেশদ্বার ১০ ফিট উচ্চ, ১০ ফিট প্রশস্ত এবং অপূর্ব্ব খিলানবিশিষ্ট। কন্দরটী ন্যূনাধিক ৪৮ ফিট দীর্ঘ, ২৭ ফিট প্রশস্ত এবং ১৩ ফিট উচ্চ। ইহা অতি পরিপাটী। ইহার মধ্যভাগে একটী প্রস্তরনির্ম্মিত উৎকৃষ্ট দেবালয় আছে। এই কন্দরের অনতিদূরেই এক জেয়ারৎ অর্থাৎ মসজিদ এবং একটী গোর দৃষ্ট হয়। এস্থান হইতেও সৃষ্টির শোভা অতি রমণীয়।

দ্বিতীয় অংশোক্ত এই গুহা বিলোকনানন্তর অনন্তনাগে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক নিম্নলিখিত স্থান সমুদয় দর্শন করা উচিত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় অংশ।

আচ্ছাবল। কুক্কুড়নাগ। বৈরনাগ। কোঁশানাগ। হ:ীাল বা হররল।

[আচ্ছাবল] ইহা অত্যুৎকৃষ্ট চশমা অর্থাৎ উৎস। ইহা অনন্তনাগের পূর্ব্বভাগে ছয় মাইল দূরবর্ত্তী। এই উৎস একটী অত্যুত্তম প্রাচীন ক্রীড়াউপবনের উপরিতন প্রান্তে স্থিত। উদ্যানে অনেক সুস্বাদু ফলের বৃক্ষ, বৃহৎ চেনার মহীরুহ এবং

কতিপয় জীর্ণ হর্ম্ম্য আছে। জেহাঙ্গীর বাদশাহ ইহা নির্ম্মাণ করেন এবং প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা পরমা সুন্দরী নূরমহল (নূর জেহান) বেগমকে লইয়া ইহাতে সর্ব্বদা বিলাসসুখ অনুভব করিতেন। উৎসের জল অতিশয় শীতল এবং অনেক ছিদ্র দ্বারা নির্গত হইয়া যাইতেছে। একটী ছিদ্র অতি বৃহৎ। উহা হইতে যে জলপ্রবাহ নিঃসৃত হইতেছে, তাহার আয়তন এক ফুট এবং প্রবাহ দেড় ফিট ঊর্দ্ধে উঠিতেছে, সুতরাং দেখিতে অতি সুন্দর। শালামার প্রভৃতি উপবনের ন্যায় ইহার জল কতিপয় প্রণালী, জলাশয় ও প্রপাত দ্বারা প্রবাহিত হইয়া বহির্দ্দেশে পতিত হইতেছে।

বাদশাহদিগের অধিকার কালে এই ক্রীড়া উপবন যে কিরূপ পরিপাটী ও মনোহর ছিল, তাহা পাঠকগণ অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে বার্ণিয়ার সাহেব এতদ্দর্শনে এই রূপ বর্ণনা করিয়াছেন—"আচ্ছাবল মোগল সম্রাটদিগের উপনগরীয় মনোহর বাসস্থান। একটী উৎস জন্য স্থানটী আরো রমণীয়। উহার জল উপবনস্থ প্রাসাদের চারিদিকে প্রবাহিত হইয়া শত শত ধারাতে বহির্গমন করিতেছে। উহা সমতলভূমি হইতে এত প্রবলবেগে এবং সহস্র সহস্র ধারাতে ঊর্দ্ধোত্থিত হইতেছে, যে, উহা উৎস অপেক্ষা নদী নামেই বাচ্য হইতে পারে। উহার জল অতি প্রশংসনীয় এবং এমন শীতল; যে, উহাতে হাত রাখা যায় না। উপবন গ্রাম্য প্রকৃতির সমুদয় শোভাবিশিষ্ট। বক্রপথমালা; সেউ, বাদাম প্রভৃতি সুস্বাদু ফলের বৃক্ষশ্রেণী; নানা প্রকারের ফোয়ারা; মৎস্যপূর্ণ জলাশয় এবং সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর

অত্যুচ্চ জলপ্রপাত থাকাতে স্থানটী অতি চিত্তবিমোহিতকর। অতি ঊর্দ্ধ স্থান হইতে প্রপাতের জল পড়িতেছে বিশেষতঃ রাত্রিকালে যখন উহার উপরিস্থ প্রাকারের উপর দীপমালা প্রজ্বালিত হয়; তখন উহার দৃশ্য নিতান্তই মনোমুগ্ধকর। আমি এই স্থান ত্যাগ করিয়া অদূরবর্ত্তী অপর এক মনোহর উপবন দেখিতে গেলাম। উহা আচ্ছাবলের ন্যায় প্রীতিকর ও মনোমোহন। উহার জলাশয় সমূহের মধ্যে একটীতে বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য আছে। উহাদিগকে ডাকিলে অথবা রুটী নিক্ষেপ করিলে উহারা জলের উপর আসিয়া দেখা দেয়। তখন দেখিতে পাওয়া যায়, বড় বড় মৎস্যের নাসিকাতে স্বর্ণের মাকড়ি ঝুলিতেছে এবং উহাতে পারসীক উৎকীরণ আছে। জেহাঙ্গীর বাদশাহের প্রাণেশ্বরী নূরমহল উহাদিগকে এই অলঙ্কার পরাইয়া দিয়াছিলেন।” কিন্তু দুঃখের বিষয়, উহা এক্ষণে অদৃশ্য হইয়াছে।

[কুক্কুড় নাগ] আচ্ছাবলের দক্ষিণ পূর্ব্ব ভাগে আট মাইল দূরে এই নাগ অর্থাৎ উৎস আছে। ইহা একটী উৎস নহে—কতিপয় অবিরল উৎসের সমাবেশ মাত্র। গিরিতলের ছয় স্বতন্ত্র স্থান হইতে জল নিঃসৃত হইয়া কয়েক পাদ দূরে একত্র মিলিত হইয়াছে এবং ন্যূনাধিক ১২ ফিট প্রশস্ত প্রণালীর আকারে পরিণত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। এই জল অতিশয় স্বচ্ছ ও শীতল।

[বৈরনাগ] ইহা কুকুড়নাগ হইতে ৭৷৷০ মাইল দূরে স্থিত এবং বন্‌হালপথের একটী আড্ডা। এস্থান হইতে অনন্তনাগে যাইবার যে সুগম পথ আছে, তাহার সবিশেষ বিবরণ পূর্ব্বে প্রকাশ করা গিয়াছে।

বৈরনাগ অতি রমণীয়, উৎকৃষ্ট ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ উৎস। ইহাকে উৎস না বলিয়া প্রকৃত জলাশয় নামেই বাচ্য করা যাইতে পারে। কারণ, এই জলাশয়রূপী উৎসের জলাধার অষ্টকোণ-বিশিষ্ট, প্রায় ১১০ ফিট প্রশস্ত এবং ৫০ফিট গভীর। উহার চতুষ্পার্শ্বে ৬ ফিট প্রশস্ত পথ এবং প্রস্তরনির্ম্মিত উচ্চ ও প্রশস্ত প্রাচীর। চিহ্ন দেখিয়া বোধ হয়, পূর্ব্বকালে প্রাচীরের উপরিভাগে অট্টালিকাদিও নির্ম্মিত ছিল। ইহার গাত্রে জলাশয়ের দিকে ১৪টী খিলান আছে। মধ্যভাগস্থ খিলানে এক খণ্ড পাষাণোপরি নিম্নলিখিত গদ্য ও পদ্য (পারসীক ভাষায়) লিখিত আছে ;—

গদ্য।

পাদশায়ে হফ্‌ৎ কিস্‌বর, সেয়েন শায়ে, আদালত গুস্তর, আবুল মুজাফ্‌ফর, নুরউদ্দীন, জেহাঙ্গীর পাদশা, ইব্‌নে আক্‌বর পাদশাহে গাজী, বিতারিখ সন ১৫ জলুস দরেঁ সর্‌ চশ্‌মে ফয়েজ আইন নজুলে ইজ্‌লাল ফরমুদন্দ্‌। তা ইঁ ইমারৎ বহকুমে আঁ হজরৎ সুরতে এৎনাম ইয়াফ্‌ৎ।

পদ্য।

আ'জ্‌ জেহাঙ্গীর শাহে আক্‌বর শা।
ইঁ বিনা সর্‌ কশীদ্‌ বর্‌ আফ্‌লাক্‌॥
বানীয়ে আকল্‌ ইয়াফ্‌ৎ তারিখস্‌।
কসর্‌ আবাদ্‌ চশমে বৈরনাগ।

সন ১০২৯।

গদ্যার্থ।

স্বধর্ম্মরক্ষক আকবর বাদশাহের পুত্র জেহাঙ্গীর বাদশাহ, যিনি সপ্ত সাম্রাজ্যের সম্রাট, অধীশ্বরের অধীশ্বর, ন্যায়পথাব-

লক্ষ্মী, জয়ের পিতা অর্থাৎ সর্ব্বত্র জয়শীল এবং ধর্ম্মের জ্যোতিঃ স্বরূপ, তিনি পঞ্চদশ বৎসর শাসনকালে এই পরমোপকারী এবং স্বচ্ছ উৎসতটে শিবির সংস্থাপন পূর্ব্বক অবস্থিতি করেন। তাঁহার আদেশক্রমে এই প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়।

পদ্যার্থ। —

আকবর শাহের পুত্র জেহাঙ্গীর শা হইতে এই হর্ম্ম্য মস্তকোত্তোলন করিয়া গগণ স্পর্শ করিয়াছে। শেষ চরণ অর্থাৎ "কসর্ আবাদ্ চশমে বৈরনাগ" শব্দ চতুষ্টয়ের সাংকেতিক গণনা হইতে বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইহার নির্ম্মাণকাল বুঝিয়া লইবেন।

প্রাগুক্ত শব্দ চতুষ্টয়ের গণনা ১০২৪ এবং পদ্যাংশের নীচে সন ১০২৯ অঙ্কিত আছে। সুতরাং স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, যে, সন ১০২৪ সালে জেহাঙ্গির বাদশাহের আদেশক্রমে এই জলাশয় ও হর্ম্ম্যাদির নির্ম্মাণ আরম্ভ হয়। সন ১০২৯ সালে উহা সম্পূর্ণ হইয়া গেলে উক্ত উৎকীরণ যথা স্থলে স্থাপিত হইয়া থাকিবে।

জলাশয়ে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অসংখ্য মৎস্য আছে। উহাদিগের বধ নিষিদ্ধ। উহারা নির্ভয়ে ক্রীড়া করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে—আহার্য্য বস্তু নিক্ষেপ মাত্রেই সহস্র সহস্র এক স্থলে পিণ্ডাকারে সংগৃহীত—একটী অপরের উপর শয়িত—উহাদিগের কল্ কল্ শব্দে ও পুচ্ছাঘাতে মনোহর ধ্বনি নিনাদিত—আহার লইয়া পরস্পরে বিবাদমত্ত—দেখিতে অতি আশ্চর্য্য—পরম রমণীয়। জলাশয়স্থ জল নীল মিশ্রিত গভীর সবজ। কিন্তু যৎকালে প্রবাহ দ্বারা বহির্দ্দেশে নিঃসৃত

হয় এবং ব্যবহারার্থ উত্তোলন করা যায়, তখন এমনি স্বচ্ছ ও স্বাভাবিক বর্ণ বিশিষ্ট দেখায়, যে, উভয় অবস্থার বৈলক্ষণ্য দর্শনে অবাক হইতে হয় এবং একই উৎসের জল নয় বলিয়া ভ্রম জন্মে। অপর, উহা এমনি শীতল, যে, দারুণ নিদাঘ কালে স্পর্শ করিলে অঙ্গ অবশ হইয়া পড়ে।

এগার ফিট প্রশস্ত ও ন্যূনাধিক তিন ফিট গভীর পাষাণ-নির্ম্মিত এক প্রণালী দ্বারা জল নিয়ত অনর্গলভাবে ও প্রবল বেগে বহির্ভাগে নিঃসৃত হইতেছে, তথাপি জলাশয়ের জল কিছুমাত্র হ্রাস হয় না। বর্ত্তমান নরপতি এই প্রণালীর উপরি-ভাগে ভ্রমণকারীদিগের নিমিত্ত এক অত্যুত্তম বারাদরি অর্থাৎ কাষ্ঠ-নির্ম্মিত অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এই প্রবাহ জলাশয় পরিত্যাগ করিয়াই দ্বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। প্রথমটী মৃত্তিকার ভিতর দিয়া কিয়দ্দূর যাইয়া দুই স্থলে ফোয়ারার ন্যায় স্ফীত হইতেছে। আরো কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া অপর প্রবাহের সহিত মিলিত হওতঃ ক্ষুদ্র নদীর আকারে প্রবাহিত হইয়া বিতস্তা নদীর আয়তন বৃদ্ধি করি-তেছে। অনেকে অনুভব করেন, যে, বৈরনাগ হইতেই বিতস্তা নদী উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু একথা ভ্রমমূলক!

উক্ত প্রণালীর বহির্দ্দারের বামভাগস্থ প্রাচীরে এক পাষাণ খণ্ডে নিম্নলিখিত সুললিত, রসপূর্ণ ও অর্থগর্ভ পারস্য-কবিতা খোদিত আছে, যথা;—

হাইদর বহুকুমে শাহে জাহান বাদশায়ে দহর্।
শুকুরে খোদা কি সাক্ত চে কিঁ আব্ সর্ জোয়ে॥
ইঁ জোয়ে দাদা অস্ত্ ব জোয়ে বেহিস্ত আব্।
জিঁ আব্সর্ ইয়াক্তা কাশ্মীর আবৃক॥

তারিখ জোয়ে আব্ বুগুফ্তা সরোসে গ্যায়েব্।
আজ্ চশমে বেহিস্ত বেক আম্দা অস্ত্ জোয়ে॥

অন্যার্থ।

হাইদর ঈশ্বরানুগৃহীত ও সার্ব্বভৌম শাহেজান সম্রাটের অনুমত্যনুসারে এই প্রণালী নির্ম্মাণ করিলেন। এই প্রবাহ স্বর্গীয় জলধারাকে বিশুদ্ধ করিতেছে এবং এতদ্দ্বারা কাশ্মীরের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে।

সুরলোকবাসীরা কহিতেছেন, " চশ্মে বেহিস্ত " হইতে " জোয়ে " উৎপন্ন হইয়াছে—(শেষ চরণ দেখ)। অর্থাৎ " চশ্মে বেহিস্ত " (স্বর্গীয় প্রস্রবণ) হইতে এই " জোয়ে " (প্রবাহ) উৎপন্ন হইয়াছে। এই চরণের অপর অর্থ এই, যে, " চশ্মে বেহিস্ত " শব্দের গণনা হইতে " জোয়ে " শব্দের সংখ্যা অন্তর করিলে এই প্রবাহের নির্ম্মাণ দিন অবধারিত হইতেছে। অর্থাৎ "চশমে বেহিস্ত" শব্দের সাঙ্কেতিক গণনা বা চিহ্ন ১০৬৩ এবং " জোয়ে " শব্দের চিহ্ন ১৯। বাদ দিয়া ১০৪৪ হইল। সুতরাং সন ১০৪৪ সালে এই প্রবাহ নির্ম্মিত হয়।

প্রভুত্যত, বৈরনাগ অতি রমণীয় স্থান। বাদশাহদিগের শাসনকালে ইহা আরো উৎকৃষ্ট ছিল। চিহ্ন নিচয় দেখিয়া স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়, এস্থলে অনেক হর্ম্ম্যাদি এবং প্রবাহে ফোয়ারা মালা শোভা বিস্তার করিত। কথিত আছে, জেহাঙ্গীর সম্রাটের প্রিয়তমা রাজ্ঞী নূরমহল বা নূরজেহান তৎসমুদয় আপন অভিরুচি অনুসারে বিন্যাস করেন। এই স্থানটী সমুদয় দিল্লীশ্বর অপেক্ষা জেহাঙ্গির বাদশাহের অধিক-

তর প্রিয় বিলাসস্থান ছিল। একদা কাশ্মীর গমন কালে পথি মধ্যে বরমগোলা নামক আড্ডাতে তাঁহার সাংঘাতিক পীড়া হয়। মৃত্যু সন্নিকট জানিয়া যাহাতে জীবদ্দশায় আপন প্রিয় বিলাসভবন বৈরনাগে যাইতে পারেন, সহচরগণকে তদ্বিধান করিতে আজ্ঞা দিলেন। পুনশ্চ বলিলেন, যদি কৃতান্ত একান্তই সে সাধ পূরাইতে না দেয়, তবে যেন সেই প্রিয়তম স্থানেই আমার মৃত দেহ সমাধিস্থ হয়। কিন্তু বেগম নূর জেহান তাঁহার মৃত শরীর লাহোরের সন্নিকটস্থ সাদেরা নামক স্থানে লইয়া গিয়া গোর দেন এবং তথায় আপন বৈধব্য জীবন অতিবাহিত করেন।

[কৌঁশানাগ এবং হরীবল বা হরবল] কৌঁশানাগ অতি সুন্দর পার্ব্বত্য হ্রদ। ইহা পীর পঞ্জাল পর্ব্বতের শিখর দেশে স্থিত এবং সমুদ্র তল হইতে ১৩০০ ফিট উচ্চ। ইহা দৈর্ঘ্যে অর্দ্ধ মাইল এবং প্রস্থে উহার অর্দ্ধাপেক্ষা কিঞ্চিদধিক। ইহার জল পশ্চিম প্রান্তস্থ পর্ব্বত বিদীর্ণ করিয়া মন্দ মন্দ বেগে নির্গত হইতেছে। কিন্তু কিয়দ্দূরে বৃহৎ বৃহৎ শিলা খণ্ডে প্রতিঘাত হইয়া অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে এবং প্রবল বেগে ও ভয়ানক গর্জ্জন সহকারে গভীর তলদেশে পড়িতেছে। তজ্জন্য কয়েকটী বিচিত্র ও মনোহর প্রপাত উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে হরবল সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বিশেষতঃ বসন্তঋতুর আগমনে যখন দ্রবীভূত তুষার ইহার অবয়ব বৃদ্ধি করে, তখন ইহার সৌন্দর্য্যের ইয়ত্তা থাকে না। যাঁহারা কখনো ঝব্বলপুরের সন্নিকটস্থ নর্ম্মদা নদীর সুবিখ্যাত পতন (যাহাকে ধূমাধার ও মার্ব্বেল রক্ কহিয়া থাকে) দেখিয়া-

ছেন, তাঁহারা এই স্থলের রমণীয়তা বিশিষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। এই কৌশানাগ হইতে যে জলধারা নিপতিত হয়, উহা নিম্নভাগে যতই প্রবাহিত হইয়া যায়, ততই অপরাপর উৎসের জলদ্বারা পুষ্টদেহ হইয়া নদীর আকারে পরিণত এবং অবশেষে বিতস্তা নদীর সহিত সংমিলিত হইয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় অংশ।

অমরনাথ তীর্থ।

অমরনাথ হিন্দুদিগের অতি প্রসিদ্ধ ও প্রধান তীর্থ। কাশ্মীরের পূর্ব্বপ্রান্তে চিরনীহারমণ্ডলস্থ বিজন প্রদেশের গুহাভ্যন্তরে মহাদেবের স্বয়ম্ভু তুষারলিঙ্গ আছে। প্রতি বৎসর কেবল মাত্র ভাদ্রমাসের রাখীপৌর্ণমাসী দিবসে ইহাঁর দর্শন হইয়া থাকে। এই স্থান যেরূপ তুষারমণ্ডিত, নিভৃত, উদ্ভিদ ও জীবশূন্য, সুতরাং ভীষণ, তাহাতে অপর কোনো দিবসে এস্থলে একাকী গমন করিতে গৃহস্থ ব্যক্তিদিগের সাহস ও সাধ্য হয় না। একারণ, উক্ত দিবসে সহস্র সহস্র যাত্রী সমবেত হইয়া দর্শন করিয়া থাকে। কিন্তু কোনো কোনো নির্ভীক উদাসীন এস্থলে উপর্য্যুপরি দুই তিনমাস বা ততোধিক দীর্ঘকাল ব্যাপিয়াও তথায় অবস্থান করে। হিন্দুস্থানের সমুদয় অংশ হইতে দর্শনাভিলাষী লোক সমাগত হয় এবং প্রতি

বৎসর স্ত্রী ও পুরুষে দ্বিসহস্রাধিক যাত্রী হইয়া থাকে। রাখী-পূর্ণিমার পঞ্চদশ দিবস পূর্ব্বে সকলকে সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত কাশ্মীরাধিপতির "ঝাণ্ডী" বা "ছড়ী" অর্থাৎ পতাকা শ্রীনগরের সন্নিকটবর্ত্তী রামবাগ নামক উপবনে উড্ডীন হয় এবং আট দিবস থাকিয়া শ্রীনগর হইতে যাত্রা করে। সন্ন্যাসী প্রভৃতি দুঃখী যাত্রীদিগকে মহারাজা পাথেয় ব্যয় দিয়া থাকেন।

অনন্ত-নাগে পতাকা পৌঁছিলে যাত্রীদিগের যে যেখানে থাকে, সকলে আসিয়া একত্র হয় এবং পথে আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য দ্রব্য কিছুই পাওয়া যায় না বলিয়া এখান হইতে সকলেই স্ব স্ব প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া লয়। পরে উড্ডীয়মান পতাকা সর্ব্বাগ্রে নীত হইতে থাকে এবং যাত্রীগণ উহার অনুসরণ করে। অনন্ত-নাগ হইতে অমরনাথ ২৮ ক্রোশ—পাঁচ আড্ডা। পথ যেরূপ দুর্গম ও কৃচ্ছ্রসাধ্য, তাহা বলিবার শব্দ নাই। ইহা যেমন কঠিন, তেমনি সমূহ বিপজ্জনক। কারণ, কোনো কোনো স্থান এমন ভয়ঙ্কর যে, তথায় পদশব্দ বা বাক্যোচ্চারণ মাত্রেই পর্ব্বত শিখরাগ্রস্থিত পতনোন্মুখ হিমশিলা ও শিলাখণ্ড সকল স্থানচ্যুত হইয়া শব্দকারীদিগের মস্তকোপরি পতিত হইয়া উহাদিগকে একবারে প্রোথিত করিয়া ফেলে। বৃষ্টির তো কথাই নাই। আবার মধ্যে মধ্যে ভয়ানক নীহারপাতও হইয়া থাকে। এই সমুদয় কারণ বশতঃ প্রতি বৎসর অনেক যাত্রী মৃত্যুগ্রাসে পতিত এবং অনেকেই পথ হইতে প্রত্যাগমন করিতে বাধিত হয়।

অমরনাথের এক ক্রোশ থাকিতে পঞ্চতরণী নামে একটী

নির্ঝরিণী পার হওয়া আবশ্যক। ইহার পাঁচটী শাখা। এই কারণেই ইহাকে পঞ্চতরণী কহে। যাত্রীগণ ইহার জলে স্নান পূর্ব্বক বসন ভূষণাদি পরিত্যাগ করে। অনন্তর সকলে ভূর্জ্জপত্রের কৌপীন ধারণ পূর্ব্বক (কেহ কেহ উলঙ্গাবস্থায়) মহাদেবের জয়ধ্বনি করিতে করিতে গুহার পুরোবর্ত্তী হয়।

কন্দরটী অতি বৃহৎ। প্রবেশ-দ্বার ৫০ ফিট প্রশস্ত। ইহাতে প্রবেশ করিয়া প্রথমে ন্যূনাধিক ৭৫ ফিট সরল পথ; পরে দক্ষিণভাগে ঈষৎ প্রত্যাবৃত্ত হইয়া প্রায় ২৫ ফিট যাইতে হয়। উহা ১০ হইতে ৫০ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ। গুহাভ্যন্তর অতিশয় শীতল এবং ছাদ হইতে সর্ব্বত্র অনবরত জলবিন্দু নিপতিত হইতেছে। এই স্থলে মহাদেবের স্ফটিকসদৃশ হিমানীর লিঙ্গ আছে। ইহা যে কাহারো দ্বারা স্থাপিত নহে, তাহা বলা বাহুল্য। যে সমুদয় মহাত্মারা এই স্থলে দীর্ঘকাল বাস করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের মুখে শুনিয়াছি, যে, প্রত্যেক পৌর্ণমাসীতে এই লিঙ্গ পূর্ণাবয়ব হইয়া থাকেন। পরে প্রতিপদ হইতে এক এক কলা করিয়া হ্রাস হইয়া অমাবস্যাতে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইয়া যান। আবার শুক্ল প্রতিপদ হইতে এক এক কলা করিয়া বৃদ্ধি পাইয়া পূর্ণিমা দিবসে পুনরায় সেই ষোলকলায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হন। এইরূপে শশধরের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে শশিভূষণেরও হ্রাস বৃদ্ধি হয়। এই লিঙ্গ ব্যতীত একটী পাষাণ নির্ম্মিত শঙ্কর বাহন (বৃষ) আছে, এবং কতিপয় দেব দেবীর ভগ্ন প্রতিমূর্ত্তিও ইতস্ততঃ দেখিতে পাওয়া যায়।

অর্ব্বাচীনেরা কহিয়া থাকে, যে, অমরনাথের ঐ লিঙ্গরূপ তো দেখাই যায়, তদ্ব্যতীত কপোতরূপ ধারণ করিয়াও

অমরনাথ দর্শন দিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা অলীক। পাণ্ডা (পুরোহিত) গণ পূর্ব্ব হইতে কতিপয় কপোত বস্ত্রাবৃত করিয়া লইয়া যায়। পরে গুহার সমীপবর্ত্তী হইয়া উহাদিগকে উড়াইয়া দেয়। যাত্রীগণ মহাদেবকে দর্শন ও পূজা করিয়া সেই দিবসেই প্রত্যাবৃত্ত হয়। এস্থলে কেহ রাত্রি যাপন করে না। একদা মহারাজা গোলাপ সিংহ রাত্রিবাস করিয়াছিলেন। কিম্বদন্তী আছে, যে, মহেশ্বর সর্পাকারে তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন। প্রত্যাগমন কালে যাত্রীরা অপর পথ অবলম্বন করে এবং তৃতীয় আড্ডা বন্ধনবাড়ী নামক স্থানে আসিয়া পূর্ব্ব পথের সহিত মিলিত হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কাশ্মীরের পশ্চিমবিভাগ।

প্রথম অংশ।

দুধগঙ্গা নদী। ফাঁসিকাষ্ঠ। ছাউনি। ক্ষীর ভবানী। নির্জ্জন চেনার। মানসবল। উলর হ্রদ। সোপুর। বারমুলা।

শিরোদেশে যে সমুদয় স্থানের নামোল্লেখ হইল, তত্তাবৎ নৌকারোহণ পূর্ব্বকই অবলোকিত হইয়া থাকে। সন ১২৭৬ সালে (ইং ১৮৬৯) জনৈক সুহৃদ সমভিব্যাহারে এই সমুদয় মনোহর স্থান দর্শন করিয়া আমার প্রিয় অনুজকে যাহা লিখিয়াছিলাম, তৎসন্নিবেশ দ্বারাই অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারিবে—স্বতন্ত্র লিপির আবশ্যকতা কি? অতএব তাহাই করিতেছি।

২৭শে আষাঢ় শনিবার। কাশ্মীরের পাশ্চাত্য বিভাগ ভ্রমণ করিবার মানসে আহার ও ব্যবহারোপযোগী সামগ্রী সম্ভার আহরণ পূর্ব্বক একজন প্রিয় মিত্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে নৌকারোহণে শ্রীনগর হইতে যাত্রা করিলাম। শেষ সেতু সাফা কদল অতিক্রম করিয়া দেখিলাম, দুধ গঙ্গা নদী বাম দিকে প্রবাহিত হইতেছে। দুধগঙ্গা নামটী পাঠ করিয়াই মনে করিতে পার, ইহা জলের পরিবর্ত্তে দুধের আধার বলিয়া বুঝি ইহার নাম দুধগঙ্গা হইয়াছে। পুরাণে বর্ণিত আছে, ইহার জল দুগ্ধই ছিল। ইহার সত্যাসত্যতা বিষয়ে কোনো কথা বলিতে ইচ্ছা করি না। প্রত্যুত, বর্ত্তমান-কালে ইহার জল যেরূপ নির্ম্মল ও পুষ্টিকর, তাহাতে ইহাকে দুগ্ধ শব্দে বাচ্য করা নিতান্ত অসঙ্গত নয়। এই নদী শ্রীনগর পরিক্রমণ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলাম, বামতটে ফাঁসি কাষ্ঠ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দর্শন মাত্রেই মনে কি ভীষণ ভাবের আবির্ভাব হয়! হায়! ইহা দ্বারা কত নর নারীর অমূল্য জীবনরত্ন হরণ করিয়া লওয়া হইয়াছে! হয়তো কত নির্দ্দোষী অভাগা ব্যক্তি অবস্থাগত প্রমাণের দোষে দোষী রূপে সাব্যস্ত হইয়া অথবা দুর্দ্দান্ত শাসনকর্ত্তাদিগের ইচ্ছানুসারে নিরপরাধেই এই দণ্ডে এক দণ্ডের মধ্যেই প্রাণদণ্ডে পড়িয়াছে! পূর্ব্বকালে ইহাতে প্রায় প্রত্যহই দুই একটী লোক ঝুলিত। কিন্তু অধুনা করুণহৃদয় রাজার গুণে ফাঁসি উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়।

কিঞ্চিৎ দূরে ছাউনি। ইহা অতি রমণীয় স্থান। ইহার

চতুঃপার্শ্বে সফেদা বৃক্ষরাজি গগণ স্পর্শ করিবার জন্য মস্তকো-ত্তোলন করিতেছে এবং মধ্য ভাগে পর্য্যটকদিগের নিমিত্ত এক উত্তম লড়ী (কাষ্ঠ নির্ম্মিত বাটী) আছে।

এই স্থানে বিভাবরী সমাগতা হইল। প্রকৃতি দেবী মনু-ষ্যের কৃত অসংখ্য পাপ ও প্রভাকরের খরতাপ আর সহিতে না পারিয়া লজ্জায় যেন তিমির রূপ অবগুণ্ঠন ধারণ করিলেন। ক্রমে ক্রমে অন্ধকার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না এবং তরণীও আর চলে না। অগত্যা এই স্থানেই রাত্রি অতিবাহিত করিতে হইল।

২৮শে আষাঢ়, রবিবার। রথযাত্রা। প্রত্যুষেই নৌকা ছাড়িয়াছিলাম এবং সপ্তম ঘটিকা কালে সুবিখ্যাত ক্ষীরভবানী নামক তীর্থ স্থানে উপনীত হইলাম। এখানে যথাবিধি স্নান, পূজা, প্রদক্ষিণ এবং আহারাদি করিয়া বেলা দুই প্রহর সময়ে যাত্রা করিলাম। এই অদ্ভুত কুণ্ডের বিবরণ ইতিপূর্ব্বে তোমাকে লিখিয়াছি ; (পাঠক ! চতুর্থ পরিচ্ছেদ দেখুন) সুতরাং তৎ-সমুদয় আর এস্থলে পুনর্ব্যক্ত করিবার আবশ্যকতা নাই। কেবলমাত্র ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে, যে যখন আমরা উপস্থিত হইলাম, তখন কুণ্ডের জল সবুজ ছিল। বেলা দশম ঘটিকাকালে দেখি, উহা গোলাপী বর্ণে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

যাইতে যাইতে নদী-গর্ভে একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ দেখিতে পাই-লাম। উহার উপরিভাগ প্রস্তর নির্ম্মিত। উহাতে একটী চেনার মহীরুহ আছে। একারণ, উহাকে নির্জ্জন চেনার শব্দে বাচ্য করা যাইতে পারে। লোকে কহিয়া থাকে ইহা কস্মিন্-

কালে বাড়ে না। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট তারিখে ডাক্তার ইন্স সাহেব পরিমাণ করিয়া দেখেন, ইহার আয়তন প্রায় ১১ ফিট। আমরা দেখিলাম, ইহার মূলদেশের আয়তন সেই "প্রায় ১১ ফিটই" আছে। কিন্তু স্কন্ধদেশ প্রায় ১৩ ফিট। ইন্স সাহেব যদি ইহার মূলের পরিমাণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বিগত চারি বৎসরের মধ্যে কিছুই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় নাই বলিতে হইবে। আর যদি তিনি স্কন্ধ মাপিয়া থাকেন, তবে ইহা অবশ্যই বাড়িয়াছে।

ইহা হিন্দুদিগের তীর্থস্থান। বৃক্ষতলে একটী শিবলিঙ্গ স্থাপিত। কথিত আছে, অতি পুরাকালে এই স্থলে অনেক পতিব্রতা স্ত্রী সহমৃতা হয়েন এবং অনেকে মোক্ষ পদ লাভার্থ আত্মহত্যা দ্বারা প্রাণত্যাগ করেন। এস্থানটী অতি ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু অতি রমণীয়। কেননা, এইখানে সিন্ধু নদী বিতস্তার সহিত সংমিলিত এবং পশ্চিম দিকে নুরুখাল প্রবাহিত, সুতরাং চতুর্ব্বাহিনী হইয়াছে। একারণ, এখানকার লোকে ইহাকে প্রয়াগ কহে। চতুর্ব্বাহিনীর ঠিক মধ্যস্থলে অট্টালিকাদির কিছু ভগ্নাংশ আছে। অতএব এক সময়ে যে ইহাতে একটী পরম রমণীয় হর্ম্ম্য ছিল, তাহার কোনো সন্দেহই নাই।

যাইতে যাইতে উভয় তটে অনেক গ্রাম দেখিতে পাইলাম। কোনো কোনো স্থানে নৌকা লাগাইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। সুশীতল চেনারের কুঞ্জবন রহিয়াছে; সুমিষ্ট পবন মন্দ মন্দ বহিতেছে; সুস্বাদু ফল পরিপক্ক হইতে আরম্ভ হইয়াছে; যেদিকে নয়নপাত করি, কেবল দূর্ব্বাদলপূর্ণ হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্র—এমন স্থান নাই, যেখানে সুকোমল শ্যামল তৃণ

দৃষ্ট হয় না—প্রকৃতি যেন নিজ হস্তে সমস্ত কাশ্মীরে দুর্ব্বার কেয়ারি করিয়া বা গালিচা পাতিয়া রাখিয়াছেন—মধ্যে মধ্যে নদী ও খাল দ্বারা বিভক্ত হওয়াতে ক্ষেত্রগুলি দ্বিগুণ শোভা-ময় হইয়াছে—ইত্যাদি সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে কাশ্মীরকে স্বর্গ না বলিয়া নিরস্ত থাকা যায় না! অপর. কোনো কোনো স্থানের জল এমনি স্বাস্থ্যকর এবং পাচক, যে. আমাদিগের আহার উত্তরোত্তর বিলক্ষণই বাড়িতে লাগিল—শরীর ও মন দ্বিগুণ স্বচ্ছন্দ ও সবল বোধ হইতে লাগিল। প্রভ্যুত, এমন রমণীয় স্থান আর কুত্রাপি নাই!

কিয়ৎক্ষণ পরে আমরা মানসবল হ্রদে উপনীত হইলাম। ইহা এরূপ রম্য, যে, বোধ হয়, ইহাই শাস্ত্রোক্ত ব্রহ্মার সেই মানসসরোবর—ভ্রষ্টকালে তাহারই অপভ্রংশে মানস-বল নাম হইয়াছে। ইহা এখানকাব সকল হ্রদাপেক্ষা সুন্দর ও গভীর। ইহা দৈর্ঘ্যে দেড় ক্রোশ ও প্রস্থে অর্দ্ধ ক্রোশ। এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাইতে হইলে ঠিক এক ঘণ্টা লাগে। কোনো কোনো স্থল এত গভীর, যে, তথায় যাইতে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। কৌতুকাবিষ্ট হইয়া আমরা সকল স্থান পরিভ্রমণ করিলাম। অতি গভীর জলই অতি রমণীয়। তথায় জলজলতা নাই এবং এমনি স্বচ্ছ, যে, দশ হাতের নীচের পদার্থও স্পষ্ট লক্ষিত হয়—তত নিম্নে মৎস্যগণ ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে, স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম। এখানকার ইতিবৃত্তে ইহা অতলস্পর্শ বলিয়া বর্ণিত আছে। কিন্তু কেহ কেহ পরিমাণ করিয়া দেখিয়াছেন, ইহা প্রায় ত্রিশ হস্ত গভীর। কথিত আছে, এক তপস্বী ইহার

গভীরতা নির্ণয় করিবার জন্য বহুকালাবধি এক পরিমাপক সূত্র প্রস্তুত করেন। কিন্তু পরিশেষে ইহার তলস্পর্শ করিতে না পারিয়া হতাশ হইয়া মনোদুঃখে ইহাতেই লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করেন। ইহার জল অতিশয় স্বাদু, নির্ম্মল ও লঘু; অত্যন্ত গভীর বলিয়া শ্যামবর্ণ দেখায়। ইহার অভ্যন্তরস্থ উৎস হইতে জল নির্গত হইতেছে। যখন সলিল হ্রাস হইয়া যায়, তখন তটস্থ বহুসংখ্যক উৎস স্পষ্ট দৃষ্ট হয়—কোনো কোনোটা হইতে বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকাকণা নিঃসৃত হইয়া থাকে। যেখানে জল গভীর নহে, তথায় জলজলতা—বিশেষতঃ শ্বেত ও রক্তিমা বর্ণের পদ্মবন আছে। অত্যল্প দিবসের মধ্যেই ইহা বিকসিত হইয়া হ্রদের শোভা দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিবে।

প্রবেশদ্বার হইতে হ্রদটী দেখিতে অনুপম মনোহর। বামপার্শ্বে কঙ্করবিশিষ্ট উপত্যকা; উহার অধোভাগে এবং হ্রদতটে মানসবল গ্রাম; কিয়দ্দূরে বাদশাহবাগের ভগ্নাংশ (ইহা জেহাঙ্গীর বাদশাহ স্বীয় প্রিয়তমা ভার্য্যা নূরমহলের জন্যই নির্ম্মাণ করেন) দক্ষিণপার্শ্বে পর্ব্বতশ্রেণী—ইহার অত্যুচ্চ শৃঙ্গের নাম আথুং এবং ইহা ৬২৯০ ফিট উচ্চ; কিঞ্চিদ্দূরে এবং এই পর্ব্বত মালার নিম্ন দেশে কুণ্ডবল নামক গ্রাম, এস্থানে সন্নিকটস্থ পর্ব্বত হইতে চূর্ণ প্রস্তুত হইতেছে; সম্মুখে অত্যুন্নত পর্ব্বত শ্রেণী, তাহা হইতে একটী সুন্দর জল-প্রপাত সপ্ত ধারায় পড়িতেছে; উহার সঙ্গম স্থানের প্রায় পাঁচ হস্ত দূরে একটী পুরাতন মন্দির জলের উপরিভাগে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। হ্রদ-সলিল শ্যামল; মধ্যস্থল পরিষ্কার এবং ধারে ধারে লতা

ও কমলবন রহিয়াছে; তটস্থ পর্ব্বত এবং গ্রামাদির প্রতিবিম্ব সরলভাবে পতিত হইয়াছিল, আমাদিগের গমনের শব্দে যেন ক্রমান্বয়ে নানা খণ্ডে খণ্ডিত, পরস্পরে মিলিত এবং বিচিত্র নূতন আকারে পরিণত হইল।

হ্রদের ঈশান কোণে এক মুসলমান ফকিরের আশ্রম আছে। তাঁহার জন্মস্থান বোখারা। তিনি কাশ্মীরের সমুদায় স্থান তন্ন তন্ন করিয়া অবশেষে এই স্থানটী মনোনীত করিয়াছেন এবং এখানে ২৭ বৎসর বাস করিতেছেন। ফলতঃ এই স্থানই তপোবনের উপযুক্ত স্থান। তিনি স্বহস্তে পর্ব্বত কাটিয়া ভূমি সমতল করিয়া এই আশ্রম প্রস্তুত করিয়াছেন। চারিদিকে সুস্বাদু ফলের বৃক্ষ—এত নিবিড় যে, সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিতে পারে না; পর্ব্বত শিখরস্থ নির্ঝর বক্রগতি ভাবে ঝর ঝরশব্দে পতিত হইতেছে; সম্মুখে হ্রদ; পশ্চাদ্ভাগে অভেদ্য পর্ব্বত-শ্রেণী; সুতরাং স্থানটী অনির্ব্বচনীয় রূপে রমণীয় ও সুশীতল। এমন সকল স্থানই পূর্ব্বকালে তপস্বীদিগের আশ্রম ছিল—তাঁহারা লোকালয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক এমন স্থানেই ঈশ্বরের আরাধনায় দিনযামিনী পরম সুখে যাপন করিতেন। প্রত্যুত, বোধ হইল, ফকিরজী অতি মনোসুখে আছেন। অপর, অদ্য চারি দিবস হইল, মৃত্তিকা এবং তৃণাদি দ্বারা পূর্ব্বোক্ত নির্ঝরের গতিরোধ হইয়া গিয়াছিল বলিয়া তিনি যেমন পরিষ্কার করিতেছিলেন, অমনি একটী কঠিন পদার্থ হস্তে ঠেকিল। কৌতুকাবিষ্ট হইয়া খনন করিয়া দেখেন, যে, উহা একখানি প্রস্তর নির্ম্মিত, সুদীর্ঘ ও অতি সুন্দর আসন (চৌকি)। বৃক্ষতলে এই আসনোপরি ছাগচর্ম্ম বিছাইয়া বসিয়া আছেন,

আমরা গিয়া দেখিলাম। গমন মাত্রেই তিনি আমাদিগকে যথোচিত সমাদর পূর্ব্বক ফল মূলাদি দ্বারা অতিথিসংকার করিলেন এবং বৃক্ষতলে বসিতে আসন দিলেন! কিয়ৎক্ষণ মিষ্টালাপের পর তিনি আপন শিষ্যকে আহ্বান পূর্ব্বক আমা-দিগকে তাঁহার তপোবন এবং স্বহস্ত রচিত সুড়ঙ্গ দেখাইতে আদেশ করিলেন। আমরা তাঁহার তপোবনের রমণীয়তা দর্শনে প্রীত এবং সুড়ঙ্গ দেখিয়া অবাক্ হইলাম। এই সুড়ঙ্গ তিনি স্বহস্তে পর্ব্বত কাটিয়া প্রস্তুত করিতেছেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ডাক্তার ইন্স সাহেব পরিমাণ করিয়া দেখেন, ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩০ হস্ত। কিন্তু অদ্য (১২ই জুলাই ১৮৬৯) আমরা দেখিলাম, ইহা ঠিক ৩৮ হস্ত পর্য্যন্ত হইয়াছে। ফকির বলিলেন, তিনি যত কাল জীবিত থাকিবেন, ততকালই ইহা খনন করিবেন। সুতরাং কত লম্বা হইয়া যে ইহা শেষ হইবে, বলা যায় না। প্রবেশদ্বার প্রায় তিন হস্ত উচ্চ। অভ্যন্তর চারি হইতে সার্দ্ধ চারি হস্ত উচ্চ এবং প্রস্থে প্রায় তিন হস্ত। সুতরাং তন্মধ্যে অনায়াসে মস্তকোত্তোলন পূর্ব্বক ইতস্ততঃ ভ্রমণ করা যায়। ইহার অভ্যন্তর যে কি পর্য্যন্ত শীতল, তাহা অনুভব করিয়া লও—প্রবেশ করিবা-মাত্রেই এমন শীত বোধ হইল, যে, অধিকক্ষণ থাকিতে পারিলাম না। রোজার সময় ফকির সাহেব এই স্থলে বাস করেন।

আমরা সমুদয় দেখিয়া তাঁহার নিকট প্রত্যাগত হইলাম এবং এক তরুমূলে উপবেশনপূর্ব্বক তাঁহার সহিত বাক্যালাপ এবং ঈশ্বরবিষয়ক কথোপকথন করিতে লাগিলাম। প্রত্যুত্ত.

প্রতীতি হইল, তিনি ঈশ্বরপ্রেমে মগ্ন হইয়া অতি সুখে কালাতিপাত করিতেছেন। যে কোনো দর্শক এখানে আইসেন (কি ইংরাজ, কি এদেশীয়) সকলেই এই স্থান দর্শন পূর্ব্বক প্রীত হয়েন এবং ফকিরকে কিছু কিছু পুরস্কার দিয়া থাকেন।

হ্রদের পূর্ব্বভাগস্থ অত্যুন্নত পর্ব্বতশ্রেণী হইতে (ফকিরের আশ্রমের পার্শ্বে) একটী জলপ্রপাত সপ্তধারায় পতিত হইতেছে। উহা যেস্থলে হ্রদের সহিত মিলিত হইয়াছে, আমরা তথায় যাইয়া উহার সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম এবং পর্ব্বতের যে দেশ হইতে পতন হইতেছে, সেস্থল কিরূপ এবং কোথা হইতেই বা অনর্গল বারিধারা আসিতেছে জানিতে অত্যন্ত উৎসুক হইলাম। ঊর্দ্ধদিকে নয়ন নিমীলন করিয়া দেখি, পর্ব্বতে উঠিবার কোনো পথ নাই এবং ঐরূপ সরল উচ্চ, যেন এক মহাকায় দানব দণ্ডায়মান হইয়া মানবকে উঠিতে নিষেধ করিতেছে! কিন্তু আমরা অত্যন্ত কৌতুহলাক্রান্ত এবং আবেশচিত্ত হইয়াছিলাম। সুতরাং কৃতনিশ্চয় হইলাম, যেন তেন প্রকারেণ পাহাড়ের শিখরদেশে আরোহণ করিতেই হইবে। উহার গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষলতা আছে; ঈশ্বরের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক তাহাই অবলম্বন করিয়া অতি কষ্টে, কিন্তু নিরাপদে উপরে উঠিলাম। উপনীত হইবামাত্রেই আশাতীত পরিতোষ লাভ করিলাম। দেখিলাম, তথায় একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী (প্রস্থে প্রায় পাঁচ হস্ত) প্রবাহিত হইতেছে এবং উহারই এক দেশ হইতে পূর্ব্বোক্ত জলধারা পতিত হইতেছে। স্থানটী অতি রমণীয়। স্রোতস্বতীর দক্ষিণপার্শ্বে আর একটী অত্যুচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী

এবং বামপার্শ্বে কেবলমাত্র একহস্ত পরিমিত বাঁধ। এই বাঁধের উপরেই আমরা দণ্ডায়মান হইলাম। বাঁধ থাকা-তেই নির্ঝরিণীর জলরাশি এককালে হ্রদে নিপতিত হইতে পারিতেছে না। এই বামপার্শ্বে প্রায় ২৫০ হস্ত নিম্নে হ্রদ। এস্থান হইতে হ্রদটী পরম সুন্দর দেখায়। নির্ঝরিণীর উৎপত্তি স্থান দেখিবার নিমিত্ত আমরা আরো কৌতুহলাক্রান্ত হইলাম। কিন্তু কি প্রকারেই বা তথায় যাই? পথ নাই—কেবলমাত্র উক্ত বাঁধ। যাইতে হইলে ঐ বাঁধ দিয়াই যাইতে হইবে। কিন্তু যদি দৈবাৎ পদস্খলন হয়, তাহা হইলে হয় তটিনীর জলগর্ভে নিমগ্ন হইতে হইবে, নয় ২৫০ হস্ত ঊর্দ্ধ হইতে গড়াইতে গড়াইতে আসিয়া হ্রদে পড়িয়া তদ্দণ্ডেই প্রাণ হারাইতে হইবে। অথচ চিত্তাবেগ সম্বরণ করাও দুষ্কর। অতএব পুনরায় ঈশ্বর ভরসা করিয়া ঐ দুর্গম বাঁধ দিয়া যাইতে লাগিলাম। প্রায় অর্দ্ধক্রোশ গিয়া দেখি, ইহার সীমা নাই এবং যেরূপ ভাবে প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে বোধ হইল, ইহার উৎপত্তিস্থান অতি দূরে হইবে। সন্নিকটে কোনো মনুষ্য নাই, যে, তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করি। ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে দেখিতে পাই-লাম, নিম্নদেশে অতি দূরে একটী লোকালয়ে কয়েকজন মনুষ্য রহিয়াছে। একে তো দূর, তাহাতে আবার তাহারা কাশ্মীরী। কিন্তু ইঙ্গিত দ্বারা জিজ্ঞাসা করাতে বুঝিতে পারি-লাম, এই স্রোতস্বতীর উৎপত্তি স্থান তিন ক্রোশ দূরে। এ দিকে দিবাকরের করজাল হ্রদ হইতে বৃক্ষোপরি, বৃক্ষোপরি হইতে পর্ব্বতশিখর আরোহণ করিল, সুতরাং আর অধিক

দূর না যাইয়া অবতরণ করাই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিলাম। যদিচ আমরা মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিলাম না, তথাপি সেই সেই প্রদেশের রমণীয়তা দর্শনে অত্যন্ত প্রীত হইলাম। তথাকার সুমিষ্ট এবং স্বাস্থ্যকর বায়ুর কথা কি কহিব—তথা হইতে প্রত্যাগমন করিতে ইচ্ছা হয় না। এক স্থানে দেখি, তিনটী বন্য ছাগ চরিতেছে, তাহাদের অঙ্গসৌষ্ঠব এমন মনোহর, বিশেষতঃ তাহাদের শৃঙ্গ এমন সুন্দর, যে, দূর হইতে হরিণ বলিয়া ভ্রম জন্মিয়াছিল। পদশব্দে তাহারা একবার মাত্র সচকিতনয়নে আমাদিগের প্রতি খরদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল এবং এমন ঋজুস্বভাব যে, কোনো আশঙ্কা না করিয়া নির্ভয়ে পুনরায় তৃণ ভক্ষণ করিতে লাগিল। অপর স্থানে দেখি, বন্য আঙ্গুর অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মিয়া রহিয়াছে। সে সমুদয় এত বড়, যে, লোকালয়ে তদ্রূপ দেখা যায় না। প্রত্যুত, এই সব স্থান নিতান্তই রমণীয়, নিতান্তই নির্ম্মল ও নিতান্তই পবিত্র উচ্চভাবের উত্তেজক!

এস্থলে বাস করিবার কোনো গৃহাদি নাই। সুতরাং এই পর্ব্বতশ্রেণীর এক প্রান্তে হ্রদতটে শিবির স্থাপন করিয়া থাকিতে হয়। তথায় চেনারের যে একটী কুঞ্জ আছে, তাহার রমণীয়তা প্রকাশ করিবার শব্দ নাই। শিরোদেশে পূর্ব্বোক্ত স্রোতস্বতী প্রবাহিত এবং এক স্থানে উহার জলধারা বক্র হওয়াতে ঝর ঝর শব্দে পতিত হইতেছে—পদতলে নিসর্গোৎপন্ন হরিদ্বর্ণ গালিচা। সন্ধ্যাগমে আমরা তদুপরি শয্যা প্রস্তুত করিয়া শয়ন করিলাম এবং মানস করিলাম, এইরূপেই বিভাবরী যাপন করিব। কিন্তু শুনিলাম, নিশীথ

সময়ে ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তু তথায় জল পান করিতে আইসে। একারণ, সেস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক নৌকায় শয়ন করিতে বাধিত হইলাম।

মানসবলের জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যকর, শ্রীনগরের নিকট-বর্ত্তী কোনো স্থান এতদ্রূপ নহে। ভাদ্র মাসে নগর কথঞ্চিৎ উত্তপ্ত হইলে ভ্রমণকারীরা এই স্থলে কিয়দ্দিবস বাস করিয়া থাকেন।

২৯শে আষাঢ়, সোমবার। ক্রমে ক্রমে ঊষা দেবী পূর্ব্বদিকে দেখা দিলেন। পক্ষীরা প্রভাত সমীরণ স্পর্শ করিয়া বাসা হইতে বাহির হইল। আমরাও মানসবল হইতে যাত্রা করিলাম। কিয়দ্দূর গমন করিয়া বেলা অষ্টম ঘটিকাকালে এক উপবনে নৌকা লাগাইয়া স্নানভোজনাদি হইল। কিয়ৎকাল বিশ্রাম এবং ইতস্ততঃ পদব্রজে ভ্রমণের পর পুনরায় নৌকা ছাড়িয়া দিলাম। যতই যাইতে লাগিলাম, ততই মনে নব নব প্রীতির উদয় হইতে লাগিল। চারিদিকে অপার জলরাশি ধূ ধূ করিতেছে—চতুষ্পার্শ্বে পর্ব্বতশ্রেণী—দেখিয়া বোধ হয়, পাছে এখানকার স্বাস্থ্যকর জলবায়ু অপর প্রদেশকে গৌরবান্বিত করে, এই ঈর্ষায় যেন ইহাকে অতি সাবধানে রক্ষা করিতেছে—মধ্যে মধ্যে শ্যামল দূর্ব্বাদলপূর্ণ ক্ষেত্র—স্থানে স্থানে লোকা-লয়—কোনো কোনো স্থানে শত শত পালিত অশ্বপাল চরিতেছে—কোনো কোনোটা বা জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া গাভীর ন্যায় জলজ লতা খাইতেছে—একটা অপরের গাও চাটিতেছে—মাতা বৎসকে বাৎসল্য ভাবে দুগ্ধ পান করাই-তেছে—যদি একটা দৌড়িতে আরম্ভ করিল; তাহা হইলে

ভেড়ার পালের ন্যায় সকলেই তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইল—কোনো কোনো লোকালয়ে পাহাড়ী কুক্কুর রহিয়াছে, উহাদিগের গাত্রলোম দীর্ঘ, চিক্কণ এবং কোঁকড়া কোঁকড়া। পুচ্ছ ঘূর্ণায়িত এবং লোমশ, গঠন অতি ভয়ঙ্কর এবং দেখিতে অতি সুন্দর, কিন্তু কোনো কার্য্যকর নহে; ইহারাও এখানকার লোকদিগের ন্যায় ভীরু।

কিয়ংক্ষণ পরে আমরা উলর হ্রদে উপনীত হইলাম। এই হ্রদ এখানকার সকল হ্রদাপেক্ষা বৃহৎ। বিতস্তা নদী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। ইহা শ্রীনগর হইতে ১০ ঘণ্টার জলপথে স্থিত। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৬ ক্রোশ এবং প্রস্থে প্রায় ৫ ক্রোশ। ইহা ১৬ ফিট পর্য্যন্ত গভীর। ইহার জল অতিশয় স্বচ্ছ, কিন্তু গভীর শ্যামবর্ণ দেখায়। ইহারও জল অভ্যন্তরস্থ উৎস হইতে নিঃসৃত হইতেছে—(কোনো কোনো স্থানের বিম্ব দেখিয়া ইহার অভ্যন্তরস্থ কোনো কোনো উৎস স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়) এবং পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতমালা হইতে নির্ঝর এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী আসিয়া ইহাতে পতিত হইতেছে। ইহার তলা পঙ্কিল। অগভীর জলে অনেক জলজলতা, পানিফল এবং কমলবন আছে। পূর্ব্ব এবং দক্ষিণপার্শ্বে অত্যুচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী। ইহার চারিতটে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী। তথাকার লোকে ইহার মৎস্য, পাণিফল ও পদ্মমধু আহরণ এবং পক্ষী শিকার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে এবং মহারাজাকে অনেক করদান করিয়া থাকে। হ্রদটী অতি বৃহৎ বলিয়া মৃদু পবনবেগেই প্রবল ঝটিকা উৎপন্ন হয়। তাহাতে আবার এদেশীয় নৌকা বাত্যাকালের বড় উপাযোগী নহে। একারণ,

নাবিকগণ ইহার মধ্যদেশ দিয়া নৌকা চালনা করিতে সহজে স্বীকৃত হয় না। বিশেষ অপরাহ্নে পার হওয়া কাহার সাধ্য? আমরা বেলা দুইটার সময় তথায় উপনীত হইলাম। তৎকালে মৃদু মৃদু সমীরণ-বেগে উহা এরূপ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিল, যে, দেখিয়াই আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহে অতি সত্বরেই শান্ত হইয়া গেল, সুতরাং আমরা নিরাপদেই অপর পারে উত্তীর্ণ হইলাম। পৌঁছিবামাত্রেই এমন ঝটিকা আসিল, যে, সে সময়ে হ্রদের উপরে থাকিলে পরিণাম অতি শোকাবহ হইত—তরঙ্গকুল যেন গগণ স্পর্শ করিবার নিমিত্ত উন্নত হইতে এবং হ্রদ গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিল। সৌভাগ্যক্রমে তখন তদুপরি কোনো নৌকাদি ছিল না। কেবল একখানিমাত্র ক্ষুদ্র প্রমোদজাহাজ *—যাহা ইতিপূর্ব্বে সুমন্দ মারুতহিল্লোলে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিল—এক্ষণে ওতপ্রোত হইতে লাগিল এবং ভয় হইল, পাছে হ্রদ-গর্ভে নিমগ্ন হয়। কিন্তু ঈশ্বর-কৃপায় কোনো বিপদ ঘটিল না।

দিনমণি পশ্চিমপ্রান্তস্থ পর্ব্বতের অন্তরালে ঢলিয়া পড়িলেন। মহানুভব ব্যক্তি আসন্নকালে মহতেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন বলিয়া যেন দিবাকর হ্রদ পরিত্যাগ করিয়া গিরিচূড়াবলম্বী হইলেন। আমরা এক মনোহর তটে নৌকা সংলগ্ন করিলাম।

* এখানে ডভরেন নামে একজন ফরাসিস সাহেব শালের সওদাগর আছেন। তিনি সম্প্রতি এই জাহাজ ও প্রস্তুত করিয়াছেন। এখানকার লোকে কখনো জাহাজ দেখে নাই। সুতরাং তাহারা ইহার গঠন এবং গতি দেখিয়া ইহাকে অলৌকিক পদার্থ জ্ঞান করে।

৩০শে আষাঢ়, মঙ্গলবার। রাত্রি প্রভাত হইলে লঙ্কা দ্বীপ দর্শনে চলিলাম। আমরা নুরুখাল দিয়া হ্রদে প্রবেশ করিয়াছিলাম, নচেৎ বিতস্তা নদী দিয়া আসিতে হইলে ইহা ঠিক দক্ষিণ ভাগে থাকে। সার্দ্ধ চারি শত বৎসর হইল, মুসলমানাধিপতি জানালুব উদ্দীন ইহা নির্ম্মাণ করেন। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ২০০ এবং প্রস্থে প্রায় ১৫০ হস্ত হইবে। বৃহৎ বৃহৎ পাদপ, বিশেষতঃ তুঁত মহীরুহ ইহার সর্ব্বত্র এমন নিবিড়ভাবে জন্মিয়াছে, যে, বনে সূর্য্যালোক প্রবেশ করিতে পারে না। ফলভারাবনত আঙ্গুরলতা উহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া উঠিয়াছে। এই দ্বীপের সর্ব্বত্রই প্রাচীন হর্ম্ম্য ও স্তম্ভ প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ এবং কোনো কোনো স্থলে বা চিহ্নমাত্র আছে। ইহাতে বোধ হয়, উহাদের উন্নতাবস্থায় এবং যতদিন পর্য্যন্ত জীর্ণসংস্কার হইত, ততদিন এই স্থান অতি রমণীয় ছিল। দক্ষিণ দিকে কতিপয় পাষাণনির্ম্মিত সোপানশ্রেণী এবং ইহার পার্শ্বদেশে জলের উপরিভাগে একটী বৃহৎ শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে। দ্বীপ নির্ম্মিত হইলে পর কোনো হিন্দু রাজা ইহা স্থাপন করিয়া থাকিবেন, তাহার কোনো সন্দেহ নাই।

অপরাহ্নে আমরা শকর উদ্দীন পাহাড় দেখিতে গেলাম। ইহা লঙ্কাদ্বীপের বিপরীত ভাগে অর্থাৎ হ্রদের পশ্চিমতটে স্থিত। ইহা প্রায় ৭০০ ফিট উচ্চ এবং ইহাতে উঠিবার দুইটী পথ আছে। ইহাতে উঠিতে আমাদের ন্যূনাধিক অর্দ্ধ ঘণ্টা লাগিল। পথ নিতান্ত সুগম নহে—স্থানে স্থানে অসরল ও দুর্গম। মধ্যে মধ্যে বিশুদ্ধ শ্বেতবর্ণের কোয়ার্টজ পাষাণসমন্বিত ঈষৎ সবুজ বর্ণের বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড আছে। শৈলশিখরে বাবা

শকর উদ্দীন নামক জনৈক বিখ্যাত ফকিরের জেয়ারৎ অর্থাৎ মসজিদ আছে। ইহা অতি প্রাচীন, সংস্করণাভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে। এস্থান হইতে কাশ্মীরের পাশ্চাত্যবিভাগ অতি রমণীয় দেখায়। পদতলে উলর হ্রদ বিতস্তা নদীকে বক্ষে ধারণ করিয়াছে বলিয়াই যেন গর্ব্বিতা হইয়া সগর্ব্বে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে—পাশে পাশে মৃদু মৃদু সমীরণহিল্লোল, সেই সঙ্গে হ্রদগর্ভে আকাশও দোদুল্যমান হইতেছে, সূর্য্যদেব যেন খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছেন—হ্রদতটে গ্রামসমূহ শোভা পাইতেছে। পূর্ব্বদিকে লঙ্কাদ্বীপ—ইহার অদূরে আথং পর্ব্বতের পদতলে সুদৃশ্য মানসবল রৌপ্যপদকসদৃশ ঝক্‌মক্ করিতেছে। দক্ষিণ দিকে সোপুর এবং বারমুলা স্পষ্টাক্ষরে দৃষ্ট হইতেছে—অতি দূরে উন্নত অচল-শ্রেণী যেন একতান-নয়নে গুলমর্গ প্রভৃতি মনোহর স্থানের রমণীয়তা দর্শন করিতেছে। বিতস্তা নদী পূর্ব্ব দিক হইতে হ্রদে প্রবেশ করিয়া ইহাতে লীন হইয়াছে, কিঞ্চিদ্দূরে পুনঃপ্রকটিত হইয়া দক্ষিণপশ্চিমবাহিনী ভাবে বারমুলার তট ধৌত করতঃ উপত্যকা পরিত্যাগ পূর্ব্বক চলিয়া গিয়াছে। এই সমুদয় সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে দিবা অবসান হইল। আর এস্থলে থাকা উচিত নয় বুঝিয়া আমরা অবরোহণ করিলাম।

হ্রদের দক্ষিণপশ্চিমতটে সোপুর নামে এক জনপদ আছে। তথায় রাত্রিযাপন করিবার মানসে নৌকা লাগাইলাম।

৩১শে আষাঢ়, বুধবার। প্রভাত হইলে পাদচারণে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া জনস্থানে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, অতি পুরাকালে ইহা বৃহৎ জনপদ ছিল। ইহাও একদা কাশ্মীরের

রাজধানী অভিধেয় গৌরব ভোগ করিয়াছে ; কিন্তু আধুনিক সময়ে একখানি গণ্ডগ্রাম মাত্র। ইহার প্রকৃত নাম সুরাপুর। প্রাচীনকালে ইহার নাম কাম্বুরা বা কাম্পুর ছিল। পরে, সহস্রবর্ষাধিক হইল, অবন্তীবর্ম্মা নরপতির মন্ত্রী সুর ইহার পুনঃনির্ম্মাণ এবং উৎকর্ষসাধন করেন বলিয়া ইহার নাম সুরাপুর হইয়াছিল। বর্ত্তমান সোপুর ঐ শব্দের অপভ্রংশ মাত্র।

এই উগনগর বিতস্তা নদীর উভয়তটে স্থিত এবং অর্দ্ধ পাষাণ ও অর্দ্ধ কাষ্ঠ-নির্ম্মিত সেতু দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত। এস্থলে পর্য্যটকদিগের জন্য দুইতটে দুইটী উত্তম ভবন আছে। নদীর দক্ষিণতীরে প্রাগুক্ত সেতুর অপর প্রান্তে প্রস্তরনির্ম্মিত যৎসামান্য প্রাচীন দুর্গ। ইহা এক্ষণে মহারাজার থানা অর্থাৎ পুলিষ রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। কিয়দ্দূরে একটী উত্তম দেবালয়। ইহার বহির্ভাগে একটী অতি বৃহৎ শিবলিঙ্গ আছে। তাহার বিপরীত ভাগে অর্থাৎ নদীর বামকূলে একটী স্বর্ণচূড় মসজিদ থাকাতে বোধ হয়, যেন হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্ম প্রতিকক্ষতা দেখাইতেছে।

এখানকার জলবায়ু অতিশয় স্বাস্থ্যকর। এজন্য অনেক ইংরাজ কিয়দ্দিবসের জন্য এস্থলে আসিয়া বাস করিয়া থাকেন। মৎস্যশিকার তাঁহাদের প্রধান বিলাস।

সন্ধ্যাগমে শুনিলাম, বারমুলা নামক জনপদে ইংরাজেরা গুপ্তধনাগারের এক স্থান খনন করিতেছেন। উহা এখান হইতে সার্দ্ধ তিন ঘণ্টার নৌকাপথ। এই জনপ্রবাদের তথ্য জানিবার নিমিত্ত এবং স্বচক্ষে সমুদয় দেখিবার জন্য আমরা অত্যন্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইলাম। কিন্তু এদিকে রজনী সমাগতা।

ভাস্কর অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইল দেখিয়াই তস্কররূপ তামসী অমনি ধীরে ধীরে আসিয়া দেখা দিল—আমাদের কৌতূহলের সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার বাড়িতে লাগিল। অগত্যা এই স্থলে রাত্রিযাপন করিতে হইল।

১লা শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার। প্রত্যুষেই নৌকা ছাড়িলাম। দেড় ঘণ্টা নৌকাচালনা করিয়া এক সঙ্গমে উপস্থিত হইলাম। এস্থলে পোড়ানদী বিতস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে। সংযোগ স্থলের দক্ষিণতটে দব্‌গাও নামক পল্লী। এখানে মহারাজার কাষ্ঠের কারখানা আছে। এস্থান অতিক্রম পূর্ব্বক কিয়দ্দূরে যাইয়া এক পরম সুন্দর উপবন দেখিতে পাইলাম এবং নৌকা লাগাইয়া স্নান ভোজনাদি করিলাম। আহারান্তে আমরা সুকোমল হরিৎ দূর্ব্বাদলের উপর শয্যা প্রস্তুত করিয়া শয়ন করিয়া আছি, এমন সময় চারিদিক ঘোর তমসাচ্ছন্ন হইল। আকাশমার্গে নিবিড় মেঘ; তন্মধ্যে সৌদামিনী প্রকাশিতা এবং বজ্র নিনাদিত হইতে লাগিল। প্রবল ঝটিকা সম্বলিত বৃষ্টি আসিল—বৃক্ষ হইতে ফল সমুদয় পতিত হইয়া মৃত্তিকা আচ্ছাদন করিল। আমরা নৌকায় আশ্রয় লইলাম। কিয়দ্দণ্ড পরেই সমুদয় অপগত এবং দিনমণি দ্বিগুণ প্রতাপে প্রকাশিত হইল বটে, কিন্তু নদীর তরঙ্গ পর্ব্বতাকারে উঠিতে লাগিল। এদিকে বেলা দুইটা। সুতরাং আর বিলম্ব করিতে না পারিয়া আমরা তটস্থ হইয়া তটের নিকট দিয়া যাইতে লাগিলাম। তখন সৃষ্টির শোভা কি রমণীয়! প্রকৃতি যেন নব পরিচ্ছদ ধারণ করিল—পর্ব্বতশ্রেণী ধৌত তুষাররাশিতে ঠিক যেন দুগ্ধফেণনিভ হইয়াছে—তদুপরি সূর্য্যরশ্মি প্রতিবিম্বিত

হওয়াতে নানাবর্ণ দেখা দিতেছে; দূর্ব্বাদলোপরি জলকণা সূর্য্য-কিরণে মুক্তাকলাপবৎ প্রতীয়মান হইতেছে; পর্ব্বতের গাত্রে কোনো স্থানে মেঘের ছায়া পতিত হওয়াতে কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে; কোনো স্থানে মেঘ দণ্ডায়মান রহিয়াছে; কোনো কোনো স্থানে বা পবনহিল্লোলে ক্রীড়াসক্ত শিশুর ন্যায় ইতস্ততঃ খেলা করিয়া বেড়াইতেছে—দেখিতে নিতান্তই উল্লাসকর।

বেলা অপরাহ্ন চতুর্থ ঘটিকাকালে আমরা বারমুলায় উপনীত হইলাম। উপস্থিত হইবামাত্রেই দীর্ঘতিলক ও পিরানধারী দক্ষিণাজীবী পাণ্ডাগণ মহাজনী খাতার ন্যায় বৃহৎ বৃহৎ পুস্তক কক্ষে করিয়া আমাদিগকে ঘেরিল। সকলেই একে একে কল্যাণসূচক শ্লোক উচ্চৈঃস্বরে পাঠ পূর্ব্বক আমাদিগের হস্তে আশীর্ব্বাদী পুষ্প দিতে লাগিল—আমার যজমান হইতে হইবে, আমি এখানকার মান্য, গণ্য ও বর্দ্ধিষ্ণু পুরোহিত, আমি শৈশবাবস্থা হইতেই বাঙ্গালীদিগের পুরোহিত হইয়া আসিতেছি, প্রভৃতি স্তোভবাক্যে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। কেহ কেহ আপন কক্ষস্থিত পুস্তক উদ্‌ঘাটিত করিয়া কহিতে লাগিল— "দেখিয়ে, সাড্ডে কেতাবমে দেখিয়ে, আগে জিতনে বাবুলোগ আয়ে সান, সব্ সাড্ডে যজমান হুয়ে সান, ইথে সব্‌দা নামা লিখ্‌খা হায়" এই বলিয়া পূর্ব্বাগত বাঙ্গালীদিগের নাম, ধাম, ও পিতৃপুরুষদিগের নাম অনর্গল পড়িতে লাগিল। তাহাদিগের অশুদ্ধ উচ্চারণ এবং বিকৃতভঙ্গিতে পাঠ শুনিয়া আমরা হাস্য সম্বরণ করিয়া থাকিতে পারিলাম না। অবশেষে উহাদের মধ্যে পরস্পরে ঘোর বাগ্বিতণ্ডা চলিতে লাগিল। এই

শিরঃপীড়ক গোলযোগ হইতে শীঘ্র পরিত্রাণ পাইবার জন্য আমরা এক জনের পুস্তকে নামধামাদি লিখিয়া দিলাম এবং সকলকে আশ্বাস ও মিষ্টবাক্যে বিদায় করিলাম।

মহারাজা পর্য্যটকদিগের জন্য একখানি বাংলা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। আমরা ইহাই অধিকার করিলাম এবং আর এক দণ্ড বিলম্ব না করিয়া সেই জনপ্রবাদের সত্যাসত্য জানিবার নিমিত্ত উৎসুক হইলাম। অনুসন্ধানের পর জানিলাম, যে, বহুকালাবধি প্রবাদ আছে, চীন সম্রাটেরা পরাজিত হইয়া এদেশ পরিত্যাগ করিলে এই বারমুলার সন্নিকটবর্ত্তী কোনো স্থানে অনেক বহুমূল্য রত্নাদি নিহিত করিয়া যান। কিন্তু কেহই স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারে নাই। পরে ডাক্তার বেলু নামক এক জন মান্য ইংরাজ কোনো সূত্রে ইহা নিরূপণ করাতে ইংরাজগবর্ণমেণ্ট ও মহারাজার সম্মতিক্রমে ইহা খাত হইতেছে।

ঐ স্থান দর্শন করিবার নিমিত্ত আমরা আরো কৌতুকাবিষ্ট হইলাম এবং একজন পথপ্রদর্শক সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় যাইতে যাইতে একটী অতি বৃহৎ শিবলিঙ্গ দর্শন করিলাম। উহা এরূপ বৃহৎ যে দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। পরিমাণ করিয়া দেখিলাম, উহা ঊর্দ্ধে ছয় এবং আয়তনে সার্দ্ধ দ্বাদশ হস্ত। শিরোদেশে পুষ্প এবং জলদান করিবার জন্য একখানি মৈ লাগানো আছে। লোকে প্রত্যহই পূজা করিয়া থাকে। ভগ্নাংশ দেখিয়া বোধ হইল, এতদুপযোগী মন্দিরও নির্ম্মিত ছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহা একখানি মাত্র প্রস্তর। একে তো এত উচ্চ, তাহাতে আবার সরল ভাবে দণ্ডায়মান

রাখিবার জন্য মৃত্তিকাভ্যন্তরে অবশ্যই দুই বা তিন হস্ত প্রোথিত আছে। এই শিবলিঙ্গ পাণ্ডবদিগের দ্বারা স্থাপিত।

এই শিব লক্ষ্য করিয়াই পূর্ব্বোক্ত ধন স্থান স্থিরীকৃত হয়। শিবের ন্যুনাধিক ৫০০ হস্ত দূরে সেই স্থান। দূর হইতে দেখিলাম, কয়েকজন মনুষ্য একটী ক্ষুদ্র পাহাড় খনন করিতেছে। নিকটে গিয়া দেখি, ইহা একটী কৃত্রিম পাহাড়। এত পুরাতন, যে, বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ জন্মিয়া উহার উপরিভাগ হিংস্র জন্তুদিগের আবাস ভূমি হইয়াছে—নিসর্গোৎপন্ন পর্ব্বত শ্রেণীর একাংশ বলিয়াই ভ্রম হয়। নির্ম্মাণকালে ইহার চতুঃপার্শ্ব প্রস্তর প্রাকার দ্বারা যে সুরক্ষিত ছিল, তাহা ভগ্নাংশ দেখিয়া স্পষ্ট অনুভব করা যায়। আমরা গিয়া দেখিলাম, প্রায় অর্দ্ধেক খনন করা হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরের গাঁথনি। (প্রস্তর গুলি আকারে আমাদিগের দেশীয় প্রাচীন কালের ইষ্টক সদৃশ) গাঁথনি এরূপ দৃঢ়, যে, অতি কষ্টেই খাত হইতেছে। নির্ম্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ কৌশল দেখিয়া প্রতীতি হয়, ইহার অভ্যন্তরে অবশ্যই কিছু না কিছু আছে—হয় অসীম ধন সম্পত্তি, নয় কোনো সম্রাটের মৃতদেহ। ফলে ব্যাপারটী সাতিশয় কৌতুকাবহই বটে। অত্যল্প দিবসের মধ্যেই যাহা হয় একটা টের পাওয়া যাইবে। প্রত্যুত, কাশ্মীরের অনেক স্থানে বহুমূল্য রত্নাদি নিহিত আছে, তাহার কোনো সন্দেহ নাই। অপর, ইহার চারিদিক হিমালয় পর্ব্বতে বেষ্টিত। সুতরাং এস্থানে স্বর্ণ, রজতাদি ধাতুর আকর নিশ্চয়ই থাকিতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অদ্যাপি উহার একটীও আবিষ্কৃত হয় নাই।

এস্থলে বিতস্তা নদী সকল স্থানাপেক্ষা প্রশস্ত—অন্যূন তিন শত হস্ত হইবে। সুতরাং ইহার সেতুও সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। নদীর দক্ষিণ তটে এক অত্যুচ্চ পর্ব্বতের তলে বারমুলা জনপদ। ইহাতে ন্যূনাধিক ২৫০ ঘর বসতি আছে। ইহার প্রকৃত নাম বরাহমুলা। কারণ, প্রবাদ আছে, এখানে বরাহ অবতার হইয়াছিল। এখানকার এক পর্ব্বতের গাত্রে বরাহের খুব চিহ্ন অঙ্কিত আছে। এতদ্ভিন্ন এখানে সীতাকুণ্ড, রাম কুণ্ড, সূর্য্য কুণ্ড, প্রভৃতি অনেক কুণ্ড ও অনেক তীর্থ। আমরা এক দিবস অবস্থিতি পূর্ব্বক এই সমুদয় তীর্থাদি দর্শন করিলাম।

বিতস্তা নদী বারমুলা অতিক্রম করিয়াই শৈলশ্রেণীর মধ্যে গিয়া অতি সংকীর্ণ হইয়াছে এবং প্রায় দুই ক্রোশ এই সঙ্কীর্ণ ভাবে গমন করতঃ উপত্যকা পরিত্যাগ পূর্ব্বক চলিয়া গিয়াছে। এস্থলে ইহার মূর্ত্তি অতি প্রচণ্ড ও ভয়াবহ—দূর হইতে ইহার গর্জ্জন মুহুর্মুহু কামান শব্দের ন্যায় শ্রুত হয় এবং সন্নিকট হইলে কর্ণ বধির হইয়া যায়। সুতরাং আর নৌকা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ কোনো বিশেষ কার্য্যানুরোধে শ্রীনগরে প্রত্যাগমন করিবার প্রয়োজন ছিল। কাজেই প্রত্যাগত হইলাম। এবার কোনো স্থানে অবস্থিতি না করিয়াই দ্বিতীয় দিবসে শ্রীনগরে উপনীত হইলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় অংশ।

গুলমর্গ। কিল্লন। তোষাময়

গুলমর্গ।

কাশ্মীরের অধিকাংশ পর্ব্বত-শিখরই সমভূমি ও সুবিস্তৃত। এই সমুদয় অধিত্যকাকে মর্গ্ অর্থাৎ ক্ষেত্র কহে। গ্রীষ্মাগমে অর্থাৎ শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে নানাবিধ মনোহর বর্ণের পুষ্প বিকশিত হইয়া মর্গ নিচয়ের অপরূপ শোভা উৎপাদন করে। অতএব পর্য্যটকেরা যেন সেই বিশুদ্ধ সুখ সম্ভোগে বিমুখ না হয়েন।

সমুদয় মর্গ্ অপেক্ষা গুল্‌মর্গ্ অতি উৎকৃষ্ট ও প্রসিদ্ধ। ইহা শ্রীনগরের পশ্চিমদিকে স্থিত। ইহাতে যাইবার অনেক পথ আছে। কতিপয় স্থলপথ, কিন্তু অধিকাংশই স্থল ও জল, মিশ্র পথ। ডাক্তার ইন্স সাহেবের কাশ্মীর ভ্রমণ সম্বন্ধীয় পুস্তকে এবং মণ্টগোমারি সাহেবের কাশ্মীর মানচিত্রে ইহাদের সবিশেস বিবরণ বর্ণিত ও অঙ্কিত আছে। অতএব তৎসমুদয় এস্থলে উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র।

গুল্‌মর্গ শ্রীনগরের সমতল হইতে প্রায় ৩০০০ তিন সহস্র ফিট ঊর্দ্ধে স্থিত। ইহা দৈর্ঘ্যে তিন মাইল এবং প্রস্থে সকল

স্থানে সমান নহে। পরন্তু কুত্রাপি এক মাইলের অধিক হইবে না। ইহার চতুঃপার্শ্বেই শৈলশ্রেণী। ইহার মধ্য দিয়া এক নির্ঝরিণী প্রবাহিতা হইয়া মর্গ পরিত্যাগ কালে অপর কতিপয় স্রোতস্বতীর সহিত মিলন পূর্ব্বক অতি গভীর শব্দে সহস্র সহস্র হস্ত নীচে গিয়া পড়িতেছে। যে নিসর্গোপন্ন পুষ্পের জন্য এই স্থান এত প্রসিদ্ধ, তাহার কথা কি বলিব! মর্গের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমুদয় স্থানে এবং পার্শ্ববর্ত্তী গিরি-শ্রেণীর অধিকাংশ স্থলেই পুষ্প বিকশিত হইয়া রহিয়াছে। যতদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলিতে পারে, ততদূর পর্য্যন্ত পুষ্প ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না! জগতে যত প্রকার বর্ণ আছে, ততপ্রকার রঙ্গেরই পুষ্প—কোনো কোনো স্থানে কেবলই লাল, কোথায় কেবলই সবুজ—ইত্যাদি এক এক স্থানে এক এক বর্ণের পুষ্প। আবার কোনো কোনো স্থানে প্রকৃতি দেবী সুনিপুণ উপবন রক্ষকের ন্যায় বিচিত্র বিচিত্র কেয়ারি করিয়া রাখিয়াছেন—দেখিলে অবাক্ হইতে হয়! এই জন্যই এই স্থানের নাম গুল্‌মর্গ অর্থাৎ (গুল্-পুষ্প এবং মর্গ্-ক্ষেত্র) পুষ্পক্ষেত্র হইয়াছে। যে বর্ব্বর ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দেহ করে এবং যে ঘোর বিষয়ী পুরুষ বিষয়মদে মত্ত হইয়া একবারও বিশ্বপাতার অচিন্ত্যশক্তি ও নিরুপম সৃষ্টি-কৌশল চিন্তা না করিয়া থাকে, তাহারা এই স্থলে আসুক—আসিয়া দেখুক, সৃষ্টিকর্ত্তা স্বীয় সৃষ্টিতে প্রতিনিয়ত নিয়মিতরূপে কি বিচিত্র খেলাই খেলিতেছেন।

এখানে সর্ব্বদাই অতিশয় বৃষ্টি হইয়া থাকে। যাঁহারা

আসাম প্রদেশস্থ চিরাপুঞ্জির বৃষ্টিপাত দেখিয়াছেন, তাঁহারা ইহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তথাপি এখানকার জলবায়ু অতিশয় স্বাস্থ্যকর। একারণ ভাদ্রমাসে শ্রীনগরের বায়ু কথঞ্চিৎ দূষিত হইলে অনেক পর্য্যটক এখানে কিয়দ্দিবস বাস করিয়া থাকেন। এখানে কোনো বিশ্রামভবন নাই। ভ্রমণকারীরা আপনাপন শিবির সংস্থাপন পূর্ব্বক বাস করেন। ইহার সন্নিকটে অনেক গুজ্জর অর্থাৎ গোপালক এবং চোপান্ বা পহাল্ অর্থাৎ মেষপালক বাস করে। সুতরাং দুগ্ধ, দধি, নবনীত ও মাংস অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। নচেৎ অপরাপর আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য সামগ্রী নিম্নভাগস্থ অতি দূরবর্ত্তী পল্লী হইতেই আনাইতে হয়।

কিল্লন।

ইহাও একটী অতি রমণীয় মর্গ্। ইহা গুল্‌মর্গ্ হইতে তিন মাইল দূরে স্থিত এবং সহস্র ফিটেরও অধিক উচ্চ। এই মর্গ্ গুল্‌মর্গ্ অপেক্ষা বৃহৎ এবং হৃদয়ে বহু সংখ্যক উত্তম উৎস ধারণ করে বটে, কিন্তু পুষ্পসৌন্দর্য্য বিষয়ে প্রথমের ন্যায় রমণীয় নহে এবং এস্থলে অপেক্ষাকৃত অধিকতর বৃষ্টি-পাত হইয়া থাকে। পরন্তু, এখানে আর একটী অতীব আশ্চর্য্য নৈসর্গিক শোভা আছে। ইহার চতুঃপার্শ্ব তুষার মণ্ডিত পীরপঞ্জাল দ্বারা পরিবেষ্টিত। পর্ব্বতের স্থানে স্থানে বৃহদাকার নীহারের রাশি "গ্লেসিয়ার" অর্থাৎ চিরনীহারের বাহুস্বরূপ লম্বমান আছে। উহা অতিশয় দৃঢ় এবং আধার স্থানের আকারানুসারে উহার ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে যে বাহু আছে, উহা সুদৃঢ়

ও প্রকৃত ছাতের ন্যায় বিস্তৃত এবং উহার নীচে কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী প্রবাহিতা। দেখিয়া বোধ হয়, ঐ সব ঝরণার জল হিমানী-পতনে জন্মিয়া থাকে বলিয়া ঐ গ্লেসিয়ার চন্দ্রাতপ স্বরূপ উহাদিগকে রক্ষা করিতেছে!

লোলাব।

লোলাব একটী অত্যুত্তম পরগণা। ইহা উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত ভাগে স্থিত। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৫ মাইল এবং প্রস্থে কোনো কোনো স্থানে অতি সংকীর্ণ ও কোনো কোনো স্থানে প্রায় তিন মাইল পর্য্যন্তও প্রসারিত। ইহার চারি দিকেই অনুন্নত গিরিশ্রেণী আছে। ইহার মধ্যদেশ দিয়া এক বৃহৎ নদী প্রবাহিতা হইতেছে এবং ইহার ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা। এই স্থলে তুঁত, বাদাম, আক্রোট এবং চেনার প্রভৃতি পাদপ সমূহের বহু বহু রম্য কুঞ্জ। এই পরগণায় যে ন্যূনাধিক ত্রিশটী পল্লী আছে, তত্তাবৎ এই সমুদায় কুঞ্জের মধ্যেই স্থিত। এখানকার জলবায়ু যেমন শীতল ও স্বাস্থ্যকর, সৃষ্টির শোভাও তেমনি বিচিত্র। সুতরাং পর্য্যটকেরা যেন এই উপত্যকায় কিয়দ্দিবস অবস্থিতি পূর্ব্বক ইহার রমণীয়তা উপভোগ করেন। অপর শিকারীদিগের ইহা অতি প্রিয় স্থান। যেহেতু, সুস্বাদু ফল পরিপক্ক হইলে ভল্লুকেরা তল্লোভে পালে পালে দেখা দিয়া থাকে। তজ্জন্য অনেকে ইহাকে "ঋক্ষবন" নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কাশ্মীরের পথ।

কাশ্মীরে যাইবার নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রধান রাজপথ আছে।

১ম। জম্মু এবং বন্‌হাল পথ, অর্থাৎ আধুনিক কাশ্মীরাধিপতির রাজকীয় পথ।

২য়। ভিম্বর এবং পীর পঞ্জাল পথ, অর্থাৎ পুরাতন বাদশাহী পথ।

৩য়। ভিম্বর এবং পুঞ্চ পথ।

৪র্থ। মরি পথ।

৫ম। আবোটাবাদ পথ, অর্থাৎ পূর্ব্বতন আফগান শাসনকর্ত্তাদিগের পথ।

ডাক্তার ইন্স প্রভৃতি মহোদয়গণ কাশ্মীরভ্রমণ-সম্বন্ধীয় পুস্তকে এই সমুদয় পথের কিয়দংশ বর্ণনা করিয়াছেন এবং মন্টগোমারি সাহেবের "কাশ্মীর রুট ম্যাপ" এবং "জম্মু ও কাশ্মীর ম্যাপ" মানচিত্রে প্রত্যেক পথের প্রত্যেক স্থান অঙ্কিত আছে। কাশ্মীর-দর্শনাভিলাষী ব্যক্তিগণ তৎসমুদায় সংগ্রহ করিলে যথেষ্ট উপকৃত হইতে পারেন। তথাপি তাঁহাদের সুবিধা জন্য সর্ব্বাগ্রে স্বীয় প্রত্যক্ষলব্ধ অভিজ্ঞতানুযায়ী

সমুদায় পথের সাধারণ প্রকৃতি ও জ্ঞাতব্য বিষয় সকল বর্ণনা করিয়া পরে একাদিক্রমে সকলের সবিশেষ বিবরণ প্রকটন করিব।

উপরে যে কয়েকটী রাজপথের নামোল্লেখ করা গেল, উহার মধ্যে কেবল প্রথমটী অর্থাৎ জম্মু ও বন্‌হাল পথ দিয়া যাইতে হইলে কাশ্মীরাধিপতির বিশেষ আজ্ঞা আবশ্যক। এ পথে ইংরাজেরা প্রায় কেহই যাইতে পান না—মহারাজা যাহাদিগকে অনুমতি করেন, কেবলমাত্র তাহারাই এবং তাঁহার প্রজা ও কর্ম্মচারীরা গতায়াত করিয়া থাকে। নচেৎ, অপর চারিটী পথ অনবরুদ্ধ।

কাশ্মীরে প্রবেশ করিতে হইলে কাশ্মীরাধিপতি অথবা ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট হইতে কোনো বিশেষ আজ্ঞাপত্র লইবার আবশ্যক করে না। তবে যাহাতে পথিমধ্যে কোনো কষ্ট না হয়—অনায়াসে যান, বাহক ও আহারীয় এবং অপরাপর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি নিয়মিত মূল্যে পাওয়া যায়, তজ্জন্য পূর্ব্বোক্ত গবর্ণমেণ্ট দ্বয়ের মধ্যে একটীর পরোয়ানা অর্থাৎ ক্ষমতাপত্র সংগ্রহ করা পরামর্শসিদ্ধ।

কিন্তু কাশ্মীর হইতে বহির্গমন কালে তথাকার শাসনকর্ত্তার স্বাক্ষরিত বা মুদ্রাঙ্কিত "রাহাধারী" অর্থাৎ বহির্গমন আদেশপত্র গ্রহণ না করিলে কি ইউরোপীয়, কি কাশ্মীরী, কি বাঙ্গালী, কি হিন্দুস্থানী কোনো জাতীয় কেহই আসিতে পারে না। এ কারণ, একটী প্রবাদ বাক্য আছে, যে "কাশ্মীর কয়েদ বে জিঞ্জির" অর্থাৎ কাশ্মীর বিনা শৃঙ্খলে কারাগার। অথবা অভিমন্যুর ন্যায় বলা যাইতে পারে, "আগম শক্তি

আছে, নির্গম শক্তি নাই!" কিন্তু সচ্চরিত্র পর্য্যটকেরা ইচ্ছা করিলেই অনায়াসে রাহাধারী পাইয়া থাকেন।

সকল পথের প্রতি আড্ডাতে বাসোপযোগী গৃহ আছে এবং অশ্ব, অশ্বতর পালকী ও বাহক প্রভৃতি অতি সুলভ। লোকালয় ভেদে কোনো স্থানে দুই তিনটী দোকান এবং কোনো কোনো স্থানে বা আপণ-শ্রেণী আছে। উহাতে চাউল, আটা, ঘৃত, চিনি, দুগ্ধ, দধি প্রভৃতি আহারীয় দ্রব্য পাওয়া যায়। এই সমুদয় সামগ্রী আয়োজন করিবার জন্য মহা-রাজার কর্ম্মচারীরা নিযুক্ত আছে; তাহারা কোতোয়াল অথবা সার্জ্জন নামে খ্যাত। এতদ্ব্যতীত, সুবেদার, তহসিলদার, থানাদার, পেস্কার, নম্বরদার এবং ঠিকাদার সংজ্ঞাধারী কর্ম্মচারীরাও পথিকদিগের তত্ত্বাবধারণ করিয়া থাকে। কোনো আড্ডাতে পৌঁছিয়াই উহাদিগকে সংবাদ করিবামাত্র উহারা প্রকৃত আজ্ঞাবহ রূপে সমুদয় অভাব পূরণ করিয়া দেয়। সুতরাং পথিমধ্যে যাত্রীগণের কোনো প্রকার ক্লেশ হইবার সম্ভাবনা নাই।

এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক, যে, আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির মূল্য নিরূপিত আছে এবং এক আড্ডা হইতে অপর আড্ডা যাইবার জন্য যান ও বাহকের মূল্য এইরূপ;—

১ (আরোহণোপযোগী) অশ্ব বা অশ্বতর—

	প্রতি আড্ডা	॥০ আনা
১ ভারবাহী অশ্বতর	ঐ	॥০
১ পালকী	ঐ	।০
১ পালকী-বাহক	ঐ	।৵০

১ ভারবাহক	ঐ		।০
১ কসাব-বাহক (পিষ্ঠু) পিঠ্ঠু	ঐ		।৵০ হইতে ৸০ আনা

অশ্ব ও বাহকেরা তাহাদিগের নির্দ্দিষ্ট এক আড্ডার অধিক গমন করে না। অগ্রবর্ত্তী আড্ডায় ভার পৌঁছিয়াই আপনাপন প্রাপ্য মজুরি লইয়া প্রত্যাগমন করে। সুতরাং প্রতি স্থানে নূতন নূতন যান ও বাহকের অনুসন্ধান করিতে হয়। পথের অবস্থানুসারে ছয় বা আট জন বেহারা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কাশ্মীরের সাহাবাদ এবং বন্হাল নামক স্থান-দ্বয়ের পালকী-বাহকেরা অতিশয় দৃঢ় এবং পার্ব্বত্য পথের সম্যক উপযোগী। কিন্তু কাশ্মীরে প্রবেশ কালে বন্হাল পথ ভিন্ন উহাদিগকে পাওয়া সুকঠিন। তবে বহির্গমনকালে তথাকার শাসনকর্ত্তা দ্বারা চেষ্টা করিলে উহাদিগকে পাওয়া যাইতে পারে।

যে সমুদয় রাজপথের নামোল্লেখ করা গিয়াছে, উহার মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় পথ সর্ব্বাপেক্ষা দুর্গম। সুগমতা পক্ষে চতুর্থ ও পঞ্চম সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ এবং দ্বিতীয়টী ঐ উভয় অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন। ইহাদিগের দূরতার তালিকা নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে।

১। জম্মু ও বনহাল পথ।

আড্ডার সংখ্যা	আড্ডা	আনুমানিক মাইল	মন্তব্য।
	জম্মু		লাহোর হইতে সেয়ালকোট ৭৪ মাইল এবং সেয়ালকোট হইতে জম্মু ন্যূনাধিক ২৫ মাইল।
১	দংশাল	১৫	পথ অতিদুর্গম, স্থানে ২ প্রকৃত পথ নাই।
২	কিরিমচী	১২	অপেক্ষাকৃত সুগম।
৩	মীর	১২	
৪	লান্দর	১২	পথ সুগম ও দুর্গম—উভধর্ম্মাক্রান্ত।
৫	বিলাওৎ	১৫	লান্দর পরিত্যাগ করিয়া লাড়োলাড়ীর পাহাড়ে চড়িতে হয়, পথ অতি দুর্গম।
৬	রামবন	৯	রামবনে যাইতে চন্দ্রভাগা নদী পার হইতে হয়। অবতরণ অতি ভয়ানক।
৭	রামসু	২০	উভধর্ম্মাক্রান্ত।
৮	বন্হাল	১৫	ঐ
৯	বৈরনাগ	১৫	বন্হাল হইতে বৈরনাগ পীর পর্ব্বত (সমুদ্রের সমতল হইতে ৯২০০ ফীট উচ্চ) অতিক্রম পূর্ব্বক অবতরণ করিতে হয় এবং এখানে সমতল ভূমির আরম্ভ। বৈরনাগ মনোরম্য স্থান এবং কাশ্মীরের দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে একটী সুন্দর স্থল।
১০	অনন্তনাগ	১৬	সমতল ভূমি এবং স্থান রমণীয়।
১১	শ্রীনগর	৩০	অনন্তনাগ হইতে প্রায় সকলেই নৌকা-পথে গমন করে। স্থলপথে দুই আড্ডা।
	সর্ব্বসুদ্ধ	১৭১	

এই পথ দিয়া লাহোর হইতে শ্রীনগর ২৭০ মাইল। জম্বু হইতে শ্রীনগর ১১ আড্ডা। সুতরাং পথিমধ্যে বিলম্ব না হইলে একাদশ দিবসে শ্রীনগরে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। কিন্তু পূর্ব্ব হইতে বাহকাদির বন্দোবস্ত থাকিলে অথবা প্রকৃত কাশ্মীরী-বাহক প্রথমাবধি নিযুক্ত থাকিলে অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প দিবসে পোঁছান যায়।

২। ভিম্বর ও পীর পঞ্জাল পথ।

আড্ডার সংখ্যা	আড্ডা	আনুমানিক মাইল	মন্তব্য।
	ভিম্বর।		লাহোর হইতে গুজরাৎ ৭০ মাইল এবং গুজরাৎ হইতে ভিম্বর ২৮ মাইল।
১	সৈদাবাদ	১৫	আদি চক চড়াই অতিক্রম করিতে হয়।
২	নাওশেরা	১২॥০	পথ সুগম।
৩	চংগস_	১৩॥০	পথ সুগম এবং তাবী নদীর গর্ভ দিয়া গিয়াছে।
৪	রাজোড়ী	১৪	ঐ ঐ।
৫	থন্নামণ্ডী	১৪	পথ অতিশয় সুগম।
৬	বরমগোলা	১০॥০	রতন পীর (সমুদ্রতল হইতে ৮২০০ ফিট উচ্চ) অতিক্রম করিতে হয়।
৭	পোশিয়ানা	৮	পথ সুগম এবং চিত্রপাণীনদী ন্যূনাধিক পঞ্চবিংশতিবার পার হইতেহয়। এইপথে অতি সুন্দর সুন্দর জলপ্রপাত আছে।
৮	আলিয়াবাদসরাই	১১	পীরপঞ্জাল (সমুদ্রতল হইতে ১১০০ ফিট উচ্চ।).
৯	হীরপুর	১২	পথ সুগম।
১০	শোপিয়ান	৮॥০	অতিশয় সুগম।
১১	রামু	১১	ঐ
১২	শ্রীনগর	১৮	ঐ এবং সমতল ভূমি।
	সর্ব্বসুদ্ধ	১৪৮	

এই পথ দিয়া লাহোর হইতে শ্রীনগর ২৪৬ মাইল। ভিম্বর হইতে শ্রীনগর ১২ আড্ডা, সুতরাং ১২ দিনের পথ। কিন্তু এক দিবসে অনায়াসে অল্প দূরবর্ত্তী দুই আডডা করিয়া যাইতে পারা যায়।

৩। ভিম্বর ও পুঞ্চ পথ।

আড্ডার সংখ্যা।	আড্ডা	আনুমানিক মাইল	মন্তব্য।
	ভিম্বর। হইতে		
৫	থন্নামণ্ডী	৬৯	
৬	সুরন	১৬	রতনপীর পাহাড়। পথ সুগম।
৭	পুঞ্চ	১৪	পথ সুগম।
৮	কেহুটা	৯	ঐ।
৯	আলিয়াবাদ	৮	পথ দুর্গম।
১০	হাইদ্রাবাদ	৭	হাজী পীর পাহাড়। পথ দুর্গম।
১১	উড়ী	১০	পথ অতিশয় দুর্গম।
১২	নাউশেরা	১৪	পথ দুর্গম।
১৩	বারমুলা	১০	পথ অতি দুর্গম।
১৪	শ্রীনগর	৩০	বারমুলা হইতে প্রায় সকলেই নৌকা পথে গমন করিয়া থাকে। স্থল পথে দুই আড্ডা আছে।
	সর্ব্বশুদ্ধ	১৮৭	

ভিম্বর হইতে শ্রীনগর ১৪ আড্ডা, সুতরাং ১৪ দিবসের পথ। পথ অতি দুর্গম। একারণ, এক দিনে দুই আড্ডা যাওয়া অতি ক্লেশদায়ক ও অপরামর্শসিদ্ধ।

৪। মরি পথ।

আড্ডার সংখ্যা	আড্ডা	আনুমানিক মাইল।	মন্তব্য।
০	মরি।		
১	দেউল	১০	পথ অতি সুগম।
২	* কোহালা	১০	ঝিলম (বিতস্তা) নদী। পথ অতি সুগম
৩	দন্না	৬	ঐ। পথ অতি দুর্গম। (প্রাচীন পথ — দন্না হইতে হত্তি)
৪	ময়র	৮॥০	পথ দুর্গম।
৫	চিকড়	৭॥০	ঐ।
৬	হত্তি	১০	অপেক্ষাকৃত সুগম।
৭	চকোতী	১৫	পথ সুগম।
৮	উড়ী	১৬	পথ অতি দুর্গম।
৯	নাওশেরা	১৪	পথ দুর্গম।
১০	বারমুলা	১০	পথ অতি সুগম।
১১	শ্রীনগর	৩০	বারমুলা হইতে প্রায় সকলেই নৌকাপথে গমন করিয়া থাকে।
	সর্ব্বসুদ্ধ	১৩৭	

লাহোর হইতে যাইতে হইলে এই পথ দিয়া যাওয়া বড় সুবিধা নহে। রাউলপিণ্ডী প্রভৃতি স্থানবাসীদিগের পক্ষে ইহা উত্তম।

---

* নূতন পথ।

৩	কোহালা	হইতে	চত্রকলাশ	১১ মাইল।
৪	চত্রকলাশ	,,	রাড়	১২ ,,
৫	রাড়	,,	ত্রিনালী	১২ ,,
৬	ত্রিনালী	,,	ঘরী	১০ ,,
৭	ঘরী	,,	হত্তি	১২ ,,

৫৭ মাইল।

৫। আবোটাবাদ পথ

আড্ডার সংখ্যা	আড্ডা	আনুমানিক মাইল	মন্তব্য।
	আবোটাবাদ।		
১	মানসেরা	১৩॥০	পথ অতি সুগম।
২	ঘরী	১৯	ঐ।
৩	মোজাফেরাবাদ	৯	পথ দুর্গম।
৪	হতীয়ান	১৭	পথ দুর্গম।
৫	কণ্ডা	১১	পথ সুগম।
৬	কথাই	১২	পথ দুর্গম।
৭	শাহদেরা	১[illegible]	ঐ।
৮	গিংগল	১৪	পথ সুগম।
৯	বারমুলা	১৮	ঐ।
১০	শ্রীনগর	৩০	বারমুলা হইতে প্রায় সকলেই নৌকা পথে গমন করে।
	সর্ব্বশুদ্ধ	১৫৫॥০	

এই পথও লাহোর বা তন্নিকটবাসীদিগের পক্ষে সুগম নহে। পেশোয়ার ও রাউলপিণ্ডী প্রভৃতি স্থানবাসীদিগের পক্ষে ইহা অতি উপাদেয়।

এই সমুদায় তালিকা পাঠে প্রতীতি হইবে, কলিকাতা বা লাহোর হইতে আসিতে হইলে বন্‌হাল, পীর পঞ্জাল অথবা পুঞ্চ পথ অবলম্বন করা পরামর্শসিদ্ধ। বন্‌হাল এবং পুঞ্চ পথ অতি দুর্গম ও সমূহ আপজ্জনক। সুতরাং কোনো বিশেষ প্রয়োজন না থাকিলে এই দুই পথ পরিত্যাগ করিয়া পীর পঞ্জাল পথে গমন করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। জম্বু হইতে

আর এক পথ নির্গত হইয়া ভিম্বর পথের সহিত মিলিত হইয়াছে। পর্য্যটক স্বেচ্ছামতে উহাও অবলম্বন করিতে পারেন। মরি পথ সর্ব্বাপেক্ষা সুগম ও হ্রস্ব। কিন্তু উহা এবং আবোটাবাদ পথ তত্রত্য অথবা তৎসন্নিহিত স্থানবাসীদিগের পক্ষেই সুবিধাজনক।

পূর্ব্বোক্ত কয়েকটী পথ ব্যতীত কাশ্মীরে যাইবার আরো কতিপয় পথ আছে। কিন্তু তৎসমুদয় স্থানীয়পথ এবং উল্লিখিত কোনো না কোনোটীর সহিত মিলিত হইয়াছে। সুতরাং তাহাদের নামোল্লেখ ও বর্ণনা দ্বারা পাঠকদিগের চিত্ত ভারাক্রান্ত করিতে ইচ্ছা করি না। সিমলা পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতমালা ও শৈল শিখর দিয়া দুই পথ আছে। কিন্তু পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের বিশেষ অনুমতি না হইলে উহা দ্বারা কেহই গতায়াত করিতে পারে না।

যে কয়েকটী পথ সুগম বলিয়া উল্লেখ করা গেল. তাহাতে পাঠকবর্গের মনে সুগম শব্দের কিরূপ অর্থ প্রতিভাত হইয়াছে বলিতে পারি না। যিনি কখনো পার্ব্বত্যদেশে পদচালনা করিয়াছেন, তিনিই বুঝিবেন, যে, উহা “মন্দের ভাল” এই মাত্র। নচেৎ যাঁহারা অদ্যাপি বঙ্গ দেশের সমতল ভূমিতে সুখে ভ্রমণ করিতেছেন, এখানকার পথের কাঠিন্য ও অসরলতা তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম হওয়া সুকঠিন। তবে সকলেই শৈশবকালে “ স্বর্গের সিঁড়ীর ” উপকথা শুনিয়া থাকিবেন। সুতরাং কাশ্মীরকে স্বর্গ বিবেচনা করিয়া ইহার পথের দুর্গমতা অনুভব করিতে পারেন।

ইংরাজরাজ্য যত দূর বিস্তৃত হইয়াছে তত দূর পর্য্যন্ত

সুপ্রশস্ত রাজপথে সুখে বিচরণ করা যায়। কিন্তু উহা অতিক্রম পূর্ব্বক পর্ব্বতমালা সমন্বিত কাশ্মীরাধিপতির রাজ্যে গমন করিলেই আর সে সুখ থাকে না। কাশ্মীরের পথে সমতল ভূমি নাই বলিলেই হয়—কেবল মাত্র "চড়াই" ও "উতরাই" অর্থাৎ আরোহণ এবং অবরোহণ অথবা উত্থান ও পতন। কোনো কোনো চড়াই দুই ক্রোশ হইতে তিন ক্রোশ পর্য্যন্ত উচ্চ এবং অতিক্রম করিতে ন্যূনাধিক তিন ঘণ্টা লাগে। কোনো কোনোটী এমন সরল উচ্চ, যে, উত্থানকালে ঝাঁপানে* রজ্জু বাঁধিয়া টানিতে এবং বিপরীত ভাগে অবতরণ সময়ে রজ্জু দ্বারা ঝুলাইয়া দিতে হয়। স্থানে স্থানে এমন বক্র, যে, কি ঝাঁপান, কি আরোহী, কি বাহক, সকলকেই কুণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করিতে হয়। এমত সমুদয় চড়াই আরোহণ কালে আরোহীর কথা দূরে থাকুক, দর্শক মাত্রেরই হৃৎকম্প হইতে থাকে। এস্থলে বলা বাহুল্য মাত্র, যে, আরোহণ ও অবরোহণ উভয় ব্যাপারই বহু কষ্টে সাধনীয়।

কোনো কোনো স্থলে প্রকৃত পথ নাই। মনুষ্যের গতায়াতে যৎকিঞ্চিৎ কৃচ্ছ্রসাধ্য পথ হইয়া গিয়াছে। আবার

---

* ঝাঁপান পার্ব্বত্য দেশের শিবিকা। এখানে ইহার গঠনানুসারে 'পালকী' ও 'বাঙ্গালা' প্রভৃতি নামে খ্যাত। ইহা আমাদিগের দেশের বিগ্রহাদি লইয়া যাইবার চৌকি মাত্র। কিন্তু বাহকেরা বংশে স্কন্ধ দেয় না। বংশদ্বয়ের দুই দিগের দুই প্রান্তে রজ্জু সংলগ্ন করে এবং তন্মধ্যে অপর এক ক্ষুদ্র বংশ প্রয়োগ পূর্ব্বক তাহাতে স্কন্ধারোপণ করে। সুতরাং প্রতি পদবিক্ষেপে যানারোহী দোদুল্যমান হয়েন ও নৃত্য করিতে থাকেন। এককালে দুই জন সম্মুখে এবং দুই জন পশ্চাদ্ভাগে বহন করে। আবশ্যকমতে চারিজন করিয়া আট জনও বহন করিয়া থাকে।

কোনো কোনো স্থানে প্রস্তর এমন চিক্কণ, যে, তদুপরি পদ স্থির রাখা সুকঠিন; অথবা এরূপ বন্ধুর, যে, যাত্রীদিগের পদতল ক্ষত বিক্ষত হইয়া শোণিত প্রবাহ প্রবাহিত হইবেই হইবে। যে যে স্থলে পথ আছে, উহা হয়তো ন্যূনাধিক দুই হস্ত পরিমিত প্রশস্ত এবং এত উচ্চ, যে, নিম্ন তলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে শিরোদেশ ঘূর্ণিত হইতে থাকে। এস্থলে দৈবাৎ কাহারো পদস্খলন হইলে আর নিস্তার নাই, একবারে সহস্র সহস্র হস্ত নিম্নে পতিত হইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে হয়, নিদর্শন মাত্রও থাকে না।

প্রায় প্রাগুক্ত পথ সমুদয় শীতকালে তুষারমণ্ডিত হইয়া যায় এবং সম্পূর্ণ অগম্য হইয়া উঠে। বৈশাখ মাসের প্রারম্ভ কালাবধি বরফ দ্রব হইতে থাকে এবং মনুষ্যের গতায়াতের যোগ্য হয়। পরন্তু দ্বিতীয় অর্থাৎ ভিম্বর ও পীরপঞ্জালপথ কোনো বৎসর আষাঢ় মাসে পরিষ্কৃত হইয়া থাকে। মাত্র

এখানকার পথ যৎপরোনাস্তি দুর্গম ও ভয়ানক বটে, কিন্তু বাহ্য জগতের যেরূপ রমণীয় শোভা, তাহাতে পথ-কষ্টের জন্য লোকে প্রচুর পরিমাণে পুরস্কৃত হইতে পারে। প্রথম ও তৃতীয় পথ যেমন সর্ব্বাপেক্ষা দুর্গম, নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য পক্ষে উহা তেমনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। স্থানে স্থানে শ্বেত, রক্তিমা, হরিৎ বা অপর কোনো বর্ণের পুষ্পবাটিকা। যত দূর নয়নপাত করা যায়, কেবলই এক এক বর্ণের পুষ্প বিকসিত হইয়া সৌরভ দান করিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়—সুশীতল সমীরণ চামেলি ও গোলাপ প্রভৃতি সুগন্ধ পুষ্পের গন্ধ হরণ করতঃ চারি দিক আমোদিত করিতেছে—অলিকুল গুণ গুণ রব

করতঃ এক পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে মধু পান করিয়া বেড়া-ইতেছে—কোনো স্থানে শেয়ালকাঁটার ন্যায় কণ্টকী-বৃক্ষ কদম্বপুষ্প সদৃশ কোমল কেশর সম্বলিত গোলাকার পুষ্প ধারণ করিয়া রহিয়াছে—বিবিধ প্রকারের বৃক্ষ যেন সুনিপুণ উপবনরক্ষকের হস্ত দ্বারা ন্যস্তরূপে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে—ক্ষুধার্ত্ত পথিকদিগের ক্ষুৎপিপাসা ও শ্রান্তিদূর করিবার নিমিত্তে আঙ্গুর, দাড়িম্ব, আক্‌রোট, তুঁত প্রভৃতি সুস্বাদু ফলের অযত্নসম্ভূত বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া রহিয়াছে—সুশীতল ছায়াপ্রদ লতামণ্ডপ অথবা বিজন নিভৃত রমণীয় কানন সুললিত দ্বিজকুলের মধুর কণ্ঠস্বরে প্রতিধ্বনিত হই-তেছে—পর্ব্বতের গাত্র ভেদ করিয়া নির্ঝর ঝর ঝর শব্দে পতিত হইতেছে—একাদিক্রমে বহুসংখ্যক নির্ঝর সংমি-লিত হইয়া প্রবাহ স্বরূপে প্রবাহিত হইতেছে—উহার দুই পার্শ্ব হঃকরবী প্রভৃতি পুষ্প দ্বারা শোভিত দেখিয়া বোধ হয়, যেন প্রবাহ পুষ্পহার গলদেশে সংলগ্ন পূর্ব্বক পরিণয়ে দ্রুত-গামী হইয়াছে—বিম্বাকারে শীতল সুস্বাদুজল সহস্র সহস্র উৎস হইতে নির্গত হইতেছে—পর্ব্বতের শিখর দেশ হইতে (কোনো কোনো স্থলে অনুমান চারি বা পাঁচ সহস্র ফিট উচ্চ) অসংখ্য অসংখ্য জলপ্রপাত বৈচিত্র্যাকারে পতিত হই-তেছে—কোনো স্থানে বা 'একা নদা বিশ* ক্রোশ'—

* ভিম্বর এবং পীরপঞ্জাল পথে বরনগোলা এবং পোশিয়ানা নামক দুই আড্-ডার মধ্যবর্ত্তী চিত্রপাণি নাম্নী এক নদী আছে। উহা ন্যূনাধিক এক শত হস্ত প্রশস্ত এবং এরূপ বক্রগতিতে প্রবাহিত হইতেছে যে, উহা অষ্টবিংশতি বার অতিক্রম করিতে হয়।

কোনো স্থানে বরফ জমিয়া এরূপ দৃঢ় ও রমণীয় সেতুর আকারে পরিণত হইয়াছে, যে, দূর হইতে যমুনা বা শোণ নদীর সেতু অপেক্ষা মনোহর ও উপাদেয় বোধ হয়! তদুপরি মনুষ্যাদি জীব জন্তু অকুতোভয়ে গমনাগমন করিতেছে—পর্ব্বতের গাত্রে অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব শস্যক্ষেত্র বিরাজ করিতেছে—দুরারোহ শিখর-দেশে পার্ব্বত্য জাতীয়দিগের কুটীর দৃষ্ট হইতেছে—ইত্যাকার রমণীয় পদার্থ সকল সন্দর্শন করিলে মনে যে অনুপম প্রীতির উদয় হয়, তাহা প্রকাশ করিবার শব্দ নাই! তখন ঘোর বিষয়ী লোকের মনও আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না এবং পথের যে এত কষ্ট, তাহা আর মনে থাকে না।

আবার শৈলশিখরে আরোহণ করিলে সৃষ্টির কি বিচিত্র শোভা নয়নপথে পতিত হয়! পদতলে নবীন জলধরকুল ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে—কোনো কোনো পর্ব্বত-পার্শ্বে নিবিড় মেঘ সকল, ক্রীড়া-ক্লান্ত শিশু যেমন মাতৃক্রোড় আশ্রয় করিয়া নিদ্রিত হয়, সেই ভাবে নিশ্চল রহিয়াছে! এই সকল দর্শন করিলে শৈশব-শ্রুত মেঘের শালপাতা খাওয়ার উপন্যাস মনে পড়ে! চারিদিকে পর্ব্বতমালা যেন একটী আর একটীর গাত্রে ঠেস দিয়া রহিয়াছে! অদূরে অমুন্নত পাহাড় সকল ক্ষেত্রের আইলের ন্যায় এবং অধিত্যকা সমুদয় হরিদ্বর্ণ দূর্ব্বাদল-পরিপূরিত ক্ষেত্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। কোনো দিগে বা স্রোতস্বতী হেলিয়া সর্পের ন্যায় বক্রভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। চীড় প্রভৃতি দেবদারু জাতীয় পাদপসমূহ সরলভাবে দণ্ডায়মান হইয়া শিরোদেশ উন্নত করিয়া মৃদু মৃদু পবনহিল্লোলে কম্পিত হইতেছে। ইত্যাদি স্বভাবের আশ্চর্য্য

সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য-ভাব বিলোকনে সহসা আস্য হইতে এই কথাটী নির্গত হয়, "ভ্রমণ রমণ কিনা দেখরে নয়ন!" এবং ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তি, অনন্ত জ্ঞান ও অনুপম সৃষ্টি-কৌশল অনুধাবন করিয়া অন্তঃকরণ একবারে ভক্তিরসে দ্রব হইয়া যায় এবং তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ ও প্রণিপাত করিতে নাস্তিকেরও প্রবৃত্তি হয়!

বিধি চক্ষু দিল যারে, থাকে যদি অন্ধকারে,
অনুপম সৃষ্টি-শোভা না করি দর্শন।
বৃথায় জীবন তার বৃথায় জীবন!

পাঠকবর্গ সহজেই মনে করিতে পারেন, যে, এতাদৃশ নিভৃত ও দুর্গম পথে অবশ্যই দস্যু ও চৌরভয়ে অথবা হিংস্র জন্তুদিগের দৌরাত্ম্যে পথিকদিগের সমূহ বিপত্তির সম্ভাবনা। পথের কথা দূরে থাকুক, অধিকাংশ আড্ডা পর্ব্বত-শিখরের এরূপ বিজন প্রদেশে স্থিত, যে, দিবাভাগে তথায় পাদবিক্ষেপ করিতে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। কিন্তু দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী মহারাজা গোলাপ সিংহ দুশ্চরিত্র পার্ব্বত্যজাতিদিগকে এরূপ শাসিত করিয়া গিয়াছেন, যে, উহাদিগের ক্রূর স্বভাব ও শিষ্টাচার ও মিত্রবৎ ব্যবহারে পরিণত হইয়াছে। এখন কেহ আর পরদ্রব্যের উপর লোভাকৃষ্ট দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না। ভারবাহকেরা বহুমূল্য দ্রব্যাদি লইয়া বিনা রক্ষকে নির্দ্দিষ্ট-স্থলে পৌঁছিয়া দেয়—একটী সামান্য দ্রব্যও স্থানভ্রষ্ট হয় না। অমূল্য রত্নাদি পথিমধ্যে বা কোনো আড্ডায় পতিত হইয়া থাকিলে কেহ স্পর্শও করে না। অধিক কি, যদি কোনো নিরাশ্রয়া অবলা নানা স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া একাকিনী এই পথে

গমন করে, তথাপি তাহার কোনো শঙ্কা নাই। বোধ হয়, শার্দ্দূল প্রভৃতি নরমাংসলোভী জন্তুগণও যেন মহারাজার ভুজবলভয়ে ত্রাসান্বিত হইয়া অতি দূরদেশে পলায়ন করিয়াছে। কেননা, ইহাদিগের দ্বারা যে কোনো পথিকের প্রাণ নাশ হইয়াছে, তাহা অদ্যাপি শ্রুত হয় নাই। এই বর্ণনা সহসা অতি-বর্ণনা রূপে অনুভূত হইতে পারে, কিন্তু ইহার এক বর্ণও অধিক করিয়া বলা নহে—যাঁহারা এদেশে কিছুকাল আছেন বা ছিলেন, আমি তাঁহাদিগকেই সাক্ষী মানিতেছি।

পূর্ব্বে যে ঝাঁপান যানের বিষয় উল্লেখ করা গিয়াছে, উহা সম্যক্ রূপে নিরাপদ নহে। একেতো, দুর্গম স্থান বিশেষে উহা হইতে অবতরণ পূর্ব্বক পদব্রজে গমন করিতে হয়, তাহাতে আবার পথের কাঠিন্যে বা বাহকদিগের অসাবধানতায় উহাদিগের পদস্খলিত হইলে ঝাঁপান ভূমিতলে পতিত হওতঃ আরোহীর প্রাণ নাশ পর্য্যন্ত সম্ভাবনা। কয়েক বৎসর হইল পিরপথে জনৈক ইংরাজ ঝাঁপান হইতে পতিত হইয়া মেরু দণ্ডে এরূপ আঘাত-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যে, তাহাতে তাঁহার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হয়।

অনেকে অশ্বারোহণ পূর্ব্বক গমন করে বটে, কিন্তু উহা সমূহ বিপজ্জনক। এ অবস্থায় অধিকাংশ পথ পদব্রজে গমন করিতে হয়।

বনহাল পথ ব্যতীত অপরাপর পথে উষ্ট্র, অশ্ব প্রভৃতি ভারবাহী জন্তু অতি কষ্টে গমন করিয়া থাকে। মোগল সম্রাটেরা ভিম্বর ও পীর পঞ্জাল পথ দিয়া শত শত হস্তীও লইয়া যাইতেন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে সমূহ বিপদ ঘটিত। বারনিয়ার

সাহেব (যিনি সন ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর আরঙ্গজেব বাদ-শাহের সহিত কাশ্মীর গমন করিয়াছিলেন) লিখিয়াছেন, যে, যৎকালে সম্রাটের হস্তীমালা পীর পঞ্জাল পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিতেছিল, তখন সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী হস্তী সম্মুখস্থ দীর্ঘ ও সরল চড়াই দেখিয়া চমকিত ও ভীত হইয়া যেমন পশ্চাদ্গমন করিল, অমনি পশ্চাদ্ভাগস্থ হস্তীর উপরে আসিয়া পড়িল। সেও তৃতীয় হস্তীর উপরে পতিত হইল। এইরূপে ক্রমান্বয়ে পঞ্চদশ মত্ত বারণ ভূপতিত হইয়া একবারে নিম্ন-দেশে গড়াইয়া আসিয়া পড়িল। এই সমুদায় করী-পৃষ্ঠে সম্রা-টের অন্তঃপুরবাসিনী বিলাসিনীগণ ছিলেন। উহাদিগের মধ্যে চারি জন তদ্দণ্ডেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল এবং হতভাগা মাতঙ্গ-গণ এমনি আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল, যে, ধরাশায়ী হইয়া আর পথেরুত্থান করিতে পারিল না। এক এক করিয়া কিছুদিনের এরূপে সকলেই মরিয়া গেল। ঐ স্থান সমতলভূমি হইতে কিছু উচ্চ। তাহাতেই অনেক আরোহিণীর প্রাণ বাঁচিয়া যায়। নচেৎ পর্ব্বতের আর কিয়দ্দূর ঊর্দ্ধে উঠিয়া এই বিঘ্ন ঘটিলে উহার পরিণাম যে কি হৃদয়-বিদারক হইত, তাহা পাঠকগণ মনে করিয়া দেখুন।

এতদ্ব্যতীত আর এক প্রকার যান আছে তাহাকে "পিঠ্‌ঠু বা পিঠ্‌ঠু" * অর্থাৎ পৃষ্ঠারোহণ কহে। কাশ্মীরীভাষায় ইহাকে কসাব কহিয়া থাকে। বাহকের পশ্চাদ্ভাগে পৃষ্ঠ সম্বলিত মোড়া অথবা বৃক্ষশাখা-নির্ম্মিত তাদৃশ আসন সংলগ্ন থাকে এবং আরোহী তদুপরি অধিষ্ঠিত হয়। এরূপ মোড়ায় উপ-

* আসাম প্রদেশ বাসী এবং জৈন্তা পর্ব্বতে ইহাকে "থাবা" কহে।

যেমন প্রকৃত “ মধুমোড়া ” বলিতে হইবে! কারণ, আরোহীর পদদ্বয় বন্ধনীকৃত, হস্তদ্বয় আকুঞ্চিত ও কৃতাঞ্জলিপুট হইয়া কটিদেশের নিম্নে স্থিত এবং বাহকের বিপরীত ভাগে বদনমণ্ডল সংস্থাপিত দেখিলে ঠিক কপিধ্বজ বলিয়া বোধ হয়। আবার, বাহক আনুমানিক ২০।২৫ পদ অগ্রসর হইয়াই আরোহীর পদতলে ঠেক্‌নো (আশ্রয়) প্রদানপূর্ব্বক দণ্ডায়মানাবস্থায় কিয়দ্দণ্ড শ্রান্তিদূর করিয়া লয়। পরন্তু নির্ধন ব্যক্তিরা কোনো পীড়াক্রান্ত অথবা চলৎশক্তি-রহিত হইলে এই যানারোহণ করিয়া থাকে।

পদব্রজে ভ্রমণ ক্ষীণজীবী বাঙ্গালীদিগের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিন্তু কাশ্মীরী বা পার্ব্বত্য বলিষ্ঠ লোকে এই দুর্গম পথে দুই মণ পর্য্যন্ত ভার বহন পূর্ব্বক যেরূপ অবলীলাক্রমে গতায়াত করে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ফলতঃ সর্ব্বশুভবিধাতা ভগবান মানবজাতিকে বিশেষ বিশেষ স্থানোপযোগী করিয়াই সৃজন করিয়াছেন।

১। জম্বু এবং বনিহাল পথ।

জম্বু হইতে কাশ্মীরে যাইবার দুই পথ আছে। প্রথম বনিহাল এবং দ্বিতীয় আখ্‌নুর। আখ্‌নুর পথ চন্দ্রভাগা নদী ও কতিপয় আড্‌ডা অতিক্রম করিয়া ভিম্বর পথের সহিত মিলিত হইয়াছে, যে পথ থন্নামণ্ডী নামক স্থান হইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ গমন করতঃ দ্বিভাগে বিভক্ত হইয়া এক ভাগ বাম দিকে “ ভিম্বর ও পুঞ্চ ” এবং অপর ভাগ সম্মুখে “ ভিম্বর ও পীর পঞ্জাল ” নামে খ্যাত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, শৈলশ্রেণীর

শিখরদেশ দিয়া বন্‌হাল পথের সমান্তরাল আর একটী পথ আছে, উহাকে "ধার" অর্থাৎ শিখর-বর্ত্ম কহে। কিন্তু উহাতে যান, বাহক ও আহারীয়, পানীয় দ্রব্য প্রভৃতির ক্লেশ বলিয়া কাশ্মীরের নরপতি উহা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

জম্মু ও কাশ্মীরের অধিপতি বন্‌হাল পথ দিয়া যাতায়াত করিয়া থাকেন। তাঁহার অনুমতি না হইলে তাঁহার প্রজা ও কর্ম্মচারীরা ব্যতীত কোনো বিদেশীয় এই পথ দিয়া যাইতে পারেন না। কিন্তু ভারতবর্ষীয় কেহ যাইবার অভিলাষ প্রকাশ করিলে মহারাজা তাহাকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং সহৃদয়-চিত্তে সমুদয় পাথেয় বন্দোবস্ত করিয়া দেন।

বিখ্যাত ভূপরিমাপক মণ্টগোমারি সাহেব পরিমাণ করিয়া দেখিয়াছেন, যে, পাক্ষিক গতিতে এই পথ দিয়া জম্মু হইতে শ্রীনগর ৯০ মাইল। কিন্তু পথ গিরিসঙ্কুল বলিয়া উহাদিগের দূরতা ১৭১ মাইল অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণ।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, এই পথের আড্ডার সমষ্টি একাদশ। সুতরাং ইহা দিয়া যাইতে হইলে একাদশ দিবস লাগে। কিন্তু এক আড্ডায় পেঁছিবার পূর্ব্বে অগ্রে লোক পাঠাইয়া বাহকাদি সংগ্রহ করিয়া রাখিলে অথবা দৃঢ় কাশ্মীরী বাহক প্রথমাবধি নিযুক্ত থাকিলে অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প দিবসে শ্রীনগরে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। মহারাজা সতত পঞ্চম বা ষষ্ঠ দিবসে গমন এবং কোনো কোনো প্রধান কর্ম্মচারী আবশ্যক মতে দুই দিবসেও গিয়া থাকেন।

এই পথ সর্ব্বাপেক্ষা দুর্গম। ইহাতে তিলমাত্র সমতলভূমি নাই বলিলে অত্যুক্তি হয়না। পূর্ব্বে সমগ্র পথের সাধারণ প্রকৃতি

বর্ণনা কালে যে সকল দুর্গমতা, অসারল্য ও কাঠিন্যের পরিচয় দেওয়া গিয়াছে, তৎসমুদয় এই পথে প্রযুজ্য। বিশেষতঃ প্রথম আড্ডা দংশালের পাহাড় এরূপ ভয়ানক, যে, তত্তুল্য আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। অপরাপর পথ অপেক্ষা ইহার চড়াই ও উতরাই যেমন অধিক সংখ্যক, তেমনি দীর্ঘ ও সমূহ আপজ্জনক। কিন্তু ইহাতে গমন করিলে সৃষ্টির রমণীয়তা দর্শনে মনে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হয়, এমন আর কোনোটীতে হয় না। অপর, মহারাজা ইহার দ্বারা গমনাগমন করেন বলিয়া ইহার আড্ডা গুলিও সুন্দর। প্রতি স্থানে অতি পরিপাটী বাসগৃহ ও আপণ শ্রেণী আছে এবং পথের বহুভাগ বহু সংখ্যক লোকালয়ে পূর্ণ। ইহাতে যান এবং বাহকাদিও অতি সুলভ।

এই পথ দ্বারা প্রত্যহ মহারাজার ডাক ১৮ ঘণ্টায় শ্রীনগরে যাতায়াত করিয়া থাকে। যে যে স্থান অতিশয় দুর্গম, তথায় পৌনে এক মাইল এবং সুগম পথে দেড় মাইল অন্তরে ডাক বাহকেরা বিশ্রাম লাভ করে। এই অগম্য পথে ইহারা যেরূপ নক্ষত্র-বেগে দ্রুত গমন করিয়া থাকে—রাত্রিকালে চীড় কাষ্ঠের মশাল হস্তে এক শিলা হইতে অপর শিলা খণ্ডে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক গমন করে, তাহা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়।

হিন্দুস্থান ও পঞ্জাবের ন্যায় জম্বু নগরীতে গ্রীষ্ম অতি ভয়ানক। ইহা অতিক্রম করিয়া দংশাল ও কিরিমচী নামক দুই আড্ডাতে মার্ত্তণ্ড অতি প্রচণ্ড, বরং শেষোক্ত স্থানে অপেক্ষাকৃত প্রখর বোধ হয়। কিন্তু তৎপরে যতই গমন করা

যায়, ততই শীতল সমীরণে দেহ ও মন প্রফুল্ল হইতে থাকে। বিশেষতঃ লান্দর ও বিলাওতের মধ্যবর্ত্তী ল্যাড়োলাড়ী এবং বন্‌হাল অতিক্রম পূর্ব্বক পীরপর্ব্বত অথবা পথিমধ্যে অপর কোনো উচ্চ শৈল-শিখরে আরোহণ করিলে দৃষ্টির মনোমোহন শোভা বিলোকনে মনে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হয় ও নির্দ্দয় নিদাঘের কঠোর যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইয়া সুমিষ্ট মলয়মারুতের মৃদু মৃদু হিল্লোলে শরীর একবারে দ্রব হইয়া যায়। আবার, মধ্যে মধ্যে মেঘ আসিয়া চারিদিক আবৃত করিয়া ফেলে—মেঘের মধ্য দিয়া গমন করিতে হয়—বামে মেঘ, দক্ষিণে মেঘ, সম্মুখে মেঘ, পশ্চাতে মেঘ, ঊর্দ্ধে মেঘ, অধোভাগে মেঘ—যেন নিবিড় কুজ্‌ঝটিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি—জলদের জল সংস্পর্শে বস্ত্র আর্দ্র হইয়া যায়, কেশাগ্রভাগে বিন্দু বিন্দু বারিকণা সংলগ্ন হইতে থাকে, জলধরকে ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ কর, কিন্তু চঞ্চল পবন উহাকে লইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে বিমান-ভাগে চলিয়া যায়! সুবিখ্যাত কবি বাবু মনোমোহন বসু-কৃত রাধিকার বিরহ সম্বন্ধীয় নিম্নলিখিত গীত সহসা মনোমধ্যে উদয় হয়;—

জলধরে ধরিব কেমনে?
দেখ সখি বিমানে, চঞ্চল পবনে,
ধরিব ধরিব করি, ধরিবারে পারিনে!

সাধের এ নবঘন, চিকণ কালিয়ে,
সঘনে হেলিয়ে আসিছে এখানে! ১।

ধরা নাহি দেয় সখি, উপায় কি করি,
এমন চাতুরী করিবে কে জানে? ২।

ঐই পথে কার্ত্তিক মাসের শেষে অথবা অগ্রহায়ণের প্রথমেই লাড়োলাড়ীর পর্ব্বতে নীহার পাত হইয়া থাকে ও স্থানে স্থানে জমিয়া প্রস্তরবৎ দৃঢ় হইয়া যায় এবং পীর-শৈল একবারে তুষার মণ্ডিত হইয়া ধবল বেশে শোভা পায়। পৌষ মাসের প্রথমে সমুদায় বর্ত্মে তুষার পাত হয়, কিন্তু দীর্ঘকাল স্থায়ী নহে। বৃষ্টিপাতে বা রৌদ্রের তেজে দুই বা তিন দিবসের মধ্যেই সমস্ত বরফ গলিয়া গিয়া পথ পরিষ্কৃত হইয়া উঠে। পরন্তু উক্ত মাসের শেষভাগে এত পরিমাণে বরফ পড়িয়া থাকে, যে, কোনো কোনো স্থানে ৮ বা ১০ হস্ত উচ্চ জমিয়া যায় এবং প্রায় সমুদায় পথ অগম্য প্রায় হয়। কিন্তু নির্ভীক ডাক-বাহকেরা প্রত্যহ গমনাগমন করিয়া থাকে এবং কোনো কোনো সাহসী পথিকও গমনে বিরত হয় না। কিন্তু এরূপ অবস্থায় পর্য্যটন সম্পূর্ণ অবিধেয় এবং অতিশয় আপজ্জনক। কারণ, অজস্র নীহার পাতে প্রাণনাশ হইবার সম্ভাবনা। কোনো কোনো সময়ে পথ এমন কঠিন হইয়া থাকে, যে চারি বা পাঁচ দিবসের জন্য ডাক বন্ধ হইয়া যায়। চৈত্র মাসের প্রারম্ভে পাষাণীভূত হইয়া তুষার গলিয়া যায় ও পথ পরিষ্কৃত হইতে থাকে। জম্বু নগরীতে বরফ পড়ে না এবং প্রথম দুই আড্ডাতে অর্থাৎ দংশাল ও কিরিমচীতে অত্যল্প পরিমাণে পতিত হয়।

---

১ জম্বু হইতে দংশাল—১৫ মাইল।

জম্বু, বর্ত্তমান কাশ্মীরাধিপতির একটী প্রধান রাজধানী। মহারাজা বৎসরের অধিকাংশ কাল এই স্থলে ক্ষেপণ করেন।

সুতরাং এতৎসম্বন্ধে কতক গুলি কাজের কথা বলা অসঙ্গত ও অসাময়িক নহে।

প্রায় চারি সহস্র বৎসর অতীত হইল, বর্ত্তমান অধীশ্বরের জনৈক পূর্ব্ব পুরুষ জাম্বুলোচন নামক সূর্য্যবংশীয় এক নরপতি এই নগর স্থাপিত করেন। একারণ স্থাপয়িতার নামানুসারে ইহার নাম জম্বু হইয়াছে।

সেয়ালকোট হইতে ৯ মাইল গমন করিলে ইংরাজ রাজ্য শেষ হইয়া মহারাজার রাজ্য আরম্ভ হয়। উভয় রাজ্যের সংযোগ স্থলে কতিপয় সীমা-নিরূপক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তম্ভ এবং মহারাজার স্থাপিত একটী দেবালয় আছে। এ স্থানকে সুচেৎগড় কহে। ইহা হইতে আনুমানিক ৪ মাইল গমন করিলে (অর্থাৎ সেয়ালকোট এবং জম্বুর মধ্য পথে) টাউ নামক একটী ক্ষুদ্র পল্লী আছে। মহারাজা এস্থলে একটী নূতন নগর নির্ম্মাণ করিতেছেন এবং আপন নামানুসারে উহার নাম "রণবীরপুর" রাখিয়াছেন।

সেয়ালকোট হইতে জম্বু ন্যূনাধিক ২৫মাইল। ইহার পথ সমতল ভূমির উপর দিয়া গমন করিয়াছে—স্থানে স্থানে বন্ধুর; কিন্তু অতি কদর্য্য নহে। তবে ১৮ মাইল যাইয়া একটী নদীর গর্ভ মধ্য দিয়া গমন করতঃ পথিমধ্যে যে সমুদয় উপল ও শিলাখণ্ড পাওয়া যায়, তাহাতে একা নামক যানারোহীদিগকে যৎপরোনাস্তি উত্যক্ত ও তাপিত হইতে হয়। যাঁহারা কখনো এই যানারোহণ করিয়াছেন, তাঁহারা বিশেষ অবগত আছেন, যে, ইহাকে "গ্যাল্‌ভানিক ব্যাটারী" অর্থাৎ তাড়িৎযন্ত্র সংজ্ঞাতে আখ্যাত করিলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়! তাহাতে আবার

এই পথে উহার চক্র শিলাখণ্ড সংযোগে একাদিক্রমে উত্থিত ও পতিত হয় বলিয়া আরোহীর দেহ একবারে চূর্ণ হইয়া যায়। এক্কা ব্যতীত শিবিকা ও ঘোটক যানও অতি সুলভ এবং অধিক ব্যয়সাধ্য নহে।

তাবী নদী জম্বু নগরের পার্শ্বদিয়া প্রবাহিত হইতেছে। নগরের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে এই নদী পার হইতে হয়। ইহার উপরিভাগে সেতু নাই। গ্রীষ্ম ও শীতকালে জলের হ্রাসতা হইলে পথিক ও যান-বাহকেরা ইহার গর্ভ দিয়া গমনাগমন করে। কিন্তু বর্ষাকালে জলোচ্ছ্বাস হইলে সুগমতা ও আপদ নিবারণ জন্য একখানি তরী নিযুক্ত হইয়া থাকে। তাবী পার হইয়া প্রায় এক মাইল গমন করতঃ কতিপয় অসরল সোপাণ-শ্রেণী আরোহণ করিলে জম্বুর প্রবেশ দ্বারে উপনীত হইতে হয়।

জম্বু একটী ক্ষুদ্র ও অসংশ্লিষ্ট পাহাড়ের উপরস্থিত। ইহার উচ্চতা সমতল ভূমি হইতে ন্যূনাধিক ৫০০ ফিট হইবে। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় দুই মাইল এবং প্রস্থে এক মাইল মাত্র। বর্ত্তমান বৎসরে ইহার লোক সংখ্যা ৪,১০০। এখানে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু অধিক। এখানকার লোকদিগকে ডোগ্রা কহে। এখানকার জল বায়ু স্বাস্থ্যকর।

অনেকে মনে করিতে পারেন, জম্বু হয় তো কাশ্মীরের ন্যায়ই অতি মনোহর স্থান। কিন্তু উহার সহিত তুলনায় ইহা অতি অপকৃষ্ট। এখানে কোনো প্রকার নৈসর্গিক শোভা বা প্রকৃতির অদ্ভুত ঘটনা নাই এবং বাস সম্বন্ধে ইহা বড় উপাদেয় নহে। কারণ, নিদাঘ কালে প্রচণ্ড তপন তাপে পদতলস্থ

ও চতুষ্পার্শ্বস্থ পাষাণ উত্তপ্ত হইয়া এত গ্রীষ্মাধিক্য হয়, যে তাহা অসহ্য হইয়া উঠে। এখানে প্রাণসংহারক "লু" চলে না বটে, কিন্তু তাপ-পরিমাপক যন্ত্রের পারদস্তম্ভকে গৃহমধ্যে ১০৮° ডিগ্রি এবং কখনো কখনো বা ততোধিক ঊর্দ্ধেও উত্থিত হইতে দেখা গিয়াছে। আমাদের বঙ্গ দেশ অপেক্ষা এখানে শীতের প্রাদুর্ভাব অনেকাংশে অধিক। কিন্তু নগর মধ্যে বরফ পড়ে না—কেবল মাত্র চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী উচ্চ উচ্চ গিরিশৃঙ্গ তুষারে আবৃত হইয়া থাকে। বর্ষার ন্যায় শীতকালেও ভাস্কর তস্কর সদৃশ প্রায় সারাদিন কাদম্বিনীর অন্তরালে লুকাইয়া থাকেন এবং কখন কখন যেন মনোদুঃখে অশ্রুধারা রূপ অনর্গল বারিধারা বিসর্জ্জন করেন। এখানকার পাহাড় এমনি শুষ্ক, যে, এস্থলে একটীও প্রস্রবণ, উৎস বা জলপ্রপাত নাই। তাবী নদী ব্যতীত কয়েকটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে। তাহার জল পানোপযোগী নহে এবং গ্রীষ্ম ঋতুতে শুষ্ক হইয়া যায়। অপর, নদীতে অবতরণ করিবার সুগম ও সরল পথ বিরহে উহার জল আহরণ করা অতি কষ্টসাধ্য। নগরের প্রান্তভাগে দুই তিনটী গভীর কূপ আছে—তন্মধ্যে পীরখো নামা কূপের জল অতি শীতল। লোকে গ্রীষ্মকালে ইহার জল পান করিয়া থাকে। জীবন স্বরূপ জীবনের ন্যায় আহারীয় দ্রব্যেরও অতি কষ্ট। সময়ে সময়ে কেবল মাত্র অতি কদর্য্য তরকারি পাওয়া যায়। মৎস্যও সর্ব্বদা পাওয়া সুকঠিন।

এখানকার বাসগৃহও * সাধারণতঃ অতি সামান্য। অবস্থানুসারে লোকে ইষ্টক বা নিকৃষ্ট শিলাখণ্ড (নুড়ী) অথবা

---

* পরিষ্কৃত এবং দীর্ঘায়তন ভাড়াটিয়া বাড়ী পাওয়া অতি দুরূহ।

মৃত্তিকায় ভিত্তি নির্ম্মাণ করে। কিন্তু গৃহাদি অতি অনুচ্চ এবং শৃঙ্খলা পূর্ব্বক নির্ম্মিত নহে এবং প্রায় বাহির মহল থাকে না। ইহারা ছাদ প্রস্তুত করিবার সময় আদে লম্বা লম্বা রলা কাষ্ঠ সাজাইয়া তদুপরি বাঁশের চেটাই দিয়া পরে বাকশ্ গুল্ম বিছাইয়া দেয়। গৃহ ইষ্টকনির্ম্মিত হইলে রলা কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে কড়িকাষ্ঠ এবং চেটাইয়ের পরিবর্ত্তে তক্তা দিয়া থাকে। বাকশ্ গুল্মের উপর প্রায় এক হস্ত উচ্চ মৃত্তিকা জমাইয়া দেয়। সুতরাং বৃষ্টিপাত হইলে ঘরের ভিতরে সহস্র ধারা পতিত হইতে থাকে। এক পসলা ভারি বৃষ্টি হইয়া গেলে দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক অনাথের কুটীর ভূমিসাৎ হইয়াছে এবং সকলেই আপনাপন প্রাসাদোপরি উঠিয়া জীর্ণসংস্কার করিতেছে। ধনাঢ্যদিগের অট্টালিকা ইষ্টকনির্ম্মিত এবং নিন্দনীয় নহে। রাজবাটী অতি বৃহৎ আয়তন বিশিষ্ট, উচ্চ এবং পরম সুন্দর। ইহার মহল এবং গৃহের ইয়ত্তা নাই। অনেক প্রকোষ্ঠ নানাবিধ কারুকর্ম্মে এবং মনোহর দ্রব্যে সুসজ্জিত। বিশেষতঃ বারশিঙ্গা নামক (দ্বাদশ শৃঙ্গ বিশিষ্ট) হরিণের দ্বাদশ শাখা সমন্বিত শৃঙ্গের দেওয়ালগিরি অতি বিচিত্র শোভার পদার্থ। রাজপ্রাসাদ নদীতটে স্থিত বলিয়া আরো রমণীয় হইয়াছে। ইহাকে " মণ্ডী " কহে। বোধ হয়, মণ্ডী শব্দ মন্দির বা মণ্ডপের অপভ্রংশ হইবে।

ইহার বর্ত্ম সমুদয় এরূপ জঘন্য ও বন্ধুর, যে, ইহাতে গাড়ী * চলা দূরে থাকুক, দিবাভাগেও কিঞ্চিৎ অনবধানতা

* নগরের বহির্দ্দেশস্থ সমতল ভূমিতে মহারাজার এবং প্রধান কর্ম্মচারীদিগের গাড়ী থাকে।

সহকারে পদসঞ্চালন করিলে ভগ্নপদ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এস্থলে ঘোটকই একমাত্র উপাদেয় যান। মহারাজা ইদানীন্তন পথ সমুদয় সম্ভবপর সরল করিতেছেন এবং দুইপার্শ্বে আপণ-শ্রেণী স্থাপন এবং নানা প্রকারে নগরের বাহ্যিক ও আন্তরিক উন্নতি সম্পাদন করিতেছেন।

জম্বু পাহাড়ের উপর স্থিত বলিয়া তিন বা চারি ক্রোশ দূর হইতে অতি সুন্দর দেখায়। উত্তুঙ্গ মন্দির সমূহ স্বর্গাধিপতি বিভুর চরণে উপাসকবৃন্দের অকপট প্রেম ও ভক্তি অর্পণ করিবার জন্যই যেন মস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছে—গুম্বটের মন্দিরের স্বর্ণশৃঙ্গ সূর্য্য-কিরণে প্রতিভাত হইয়া বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছে—রাজপ্রাসাদ গগনস্পর্শ করিবার জন্য গর্ব্বিত-ভাবে যেন দণ্ডায়মান আছে—মধ্যে মধ্যে চূর্ণময় সৌধশিখর দৃষ্টিপথে পতিত হওয়াতে বোধ হইতেছে, যেন পাহাড়ের উপরে শ্বেত পাষাণ ছিন্ন ভিন্ন ভাবে শয়িত রহিয়াছে—নগরের অদূরে ও নদীর অপর পারস্থ দুর্গ যেন উহাকে শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিতেছে—ইত্যাকার নিরীক্ষণ করিলে মনে বড় আনন্দের উদয় হয়।

এই দুর্গ পাহাড়ের উপর স্থিত এবং ইহার সম্মুখ দিয়া নদী প্রবাহিত হইতেছে, এ কারণ ইহার অধ্যাসন অতি দৃঢ়। কিন্তু ইহা অসংরক্ষিত এবং ইহাতে উত্তম গৃহাদিও নাই। এখানে এক খানি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে দেবী অধিষ্ঠিতা আছেন। লোকে ইঁহাকে অনাদি এবং স্বয়ম্ভু বলিয়া নানা উপচারে যথাবিধি পূজা করিয়া থাকে। মহারাজা যদিও রামাৎ, তথাপি প্রকৃত দেব্যুপাসক শাক্ত সদৃশ ইঁহাকে পূজা করেন।

প্রতি মঙ্গলবারে এবং শারদীয়া শুক্ল অষ্টমী প্রভৃতি কয়েক উৎসবে এই দেবীর বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে।

নগরের প্রবেশদ্বারে শাসনকর্ত্তার নিয়োজিত জনৈক কর্ম্মচারী আগন্তুকদিগের নাম, ধাম এবং আগমনের অভিপ্রায় লিখিয়া লয় এবং দিবাবসানে সারাদিনের বিজ্ঞাপন রাজসদনে প্রেরণ করে। দ্বারে প্রবেশ করিয়া বামভাগে অতি দীর্ঘ একটী কবর দেখিতে পাওয়া যায়। উহা রোসন আলী নামক অতি দীর্ঘকায় জনৈক ফকীর মহাত্মার গোর। জম্বুর ইতিহাসে লিখিত আছে, যৎকালে সমুদয় ভারতবর্ষ হিন্দুরাজাদিগের শাসনাধীন ছিল, তখন এই ফকীর এখানকার হিন্দু অধিপতির নিকটে আসিয়া কহেন, যে, অল্পকাল মধ্যেই ভারতবর্ষ মুসলমানদিগের অধিকারভুক্ত হইবে; কিন্তু তাঁহার আশীর্ব্বাদে জম্বু স্বাধীন থাকিবে। ইহার পরে মোগলেরা দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়া সর্ব্বত্র আপনাদের জয়পতাকা উড্ডীন করিল, কিন্তু জম্বু নগরের উপর কোনো আক্রমণ হয় নাই। এই মহাত্মা এই খানেই বাস করেন এবং তাঁহার মৃত্যু হইলে নগরদ্বারের এই স্থানেই গোর দেওয়া হয়। গোরটী যত দীর্ঘ, তাঁহার শরীরও নাকি তত দীর্ঘ ছিল।

দ্বারের দক্ষিণ ভাগে দুই বৃহৎ ব্যাঘ্র পিঞ্জরবদ্ধ থাকিয়া মনুষ্যের অসীম বুদ্ধিকৌশলের পরিচয় দিতেছে। কিয়দ্দূর গমন করিলে বামভাগে একটী স্বর্ণমণ্ডিত এবং আর একটী বৃহৎ মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে গুম্বট কহে। প্রথমোক্ত দেবালয়ে মহাদেবের লিঙ্গ, তদ্বাহন স্ফটিকময় বৃষ এবং মহারাজা গোলাপসিংহের ভস্ম রক্ষিত আছে। দ্বিতীয়টীতে মহা-

রাজার ইষ্টদেবতা শ্রীরামচন্দ্রের মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। এখানে বেদপাঠ হইয়া থাকে এবং অনেক বিদ্যার্থী সাহিত্য, ব্যাকরণ, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং বেদ অভ্যাস করে। প্রাঙ্গণের চতুষ্পার্শ্বস্থ গৃহমালাতে পণ্ডিতগণ, পাঠার্থীরা এবং সমাগত পথিক ও ভিক্ষাজীবীরা বাস করে। নবাগত ব্যক্তি তিন দিবস মহারাজার নিকট হইতে অতিথি-সংকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহার পার্শ্বদেশে একটী উত্তম জলাশয় আছে।

গুম্বট অতি রমণীয় স্থান। কোনো স্থলে অহর্নিশি চিত্তবিমোহিতকর সুললিত কণ্ঠ-স্বরে এবং শ্রুতিমধুর সমস্বরে বেদপাঠ হইতেছে—কোনো স্থানে বিদ্যার্থীরা উচ্চৈঃস্বরে আপনাপন পাঠ কণ্ঠস্থ করিতেছে—কোনো স্থানে বা পণ্ডিতে পণ্ডিতে কোনো শাস্ত্রার্থ লইয়া মহা বাগ্বিতণ্ডা হইতেছে—সন্ধ্যাগমে সুনিপুণ গায়কবৃন্দের তানলয়বিশুদ্ধ সুশ্রাব্য কণ্ঠস্বর এবং বাদ্যযন্ত্রের মনোমোহন ধ্বনিতে দেবালয় নিনাদিত ও প্রতিধ্বনিত হইতেছে, দেখিলে মন ভক্তিরসে দ্রব হইয়া যায়। মহারাজা প্রত্যহ দিবাশেষে এই স্থলে আগমন পূর্ব্বক পণ্ডিতদিগের সহিত শাস্ত্রানুশীলনে কয়েক দণ্ড অতিবাহন করেন।

কিম্বদন্তী আছে, মহাত্মা গোলাপ সিংহ প্রত্যহ নিশাযোগে ছদ্মবেশে নগর পরিভ্রমণ পূর্ব্বক আপন প্রজাদিগের মানসিক গূঢ় অবস্থা অবগত হইতেন এবং কাহারো কোনো বিষম মনঃপীড়া দেখিলে অথবা আপন শাসনদোষে রাজ্যের কোনো অনিষ্ট বা অত্যাচার হইতেছে জানিতে পারিলে, তাহার প্রতীকার করিতেন। একদা তিনি এইরূপ প্রচ্ছন্নবেশে

এই স্থলে উপনীত হয়েন। ইতিপূর্ব্বে উহা শ্মশানভূমি ছিল—কতিপয় তপস্বী মাত্র অনাচ্ছাদিত সামান্য কুটীরে অথবা বৃক্ষতলে বাস করিতেন। তিনি তাঁহাদিগের সদনে উপস্থিত হইলেন এবং নিজেও একজন ভিক্ষাজীবী বলিয়া পরিচয় দিলেন। অনেক প্রকার কথোপকথনের পর মহারাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজা গোলাপ সিংহ কিরূপ রাজ্য শাসন করিতেছেন! তাঁহারা তাঁহাকে চিনিতেন না, সুতরাং মহারাজার উপলক্ষে অনেক নিন্দাবাদ করিয়া বলিলেন, "গোলাপ সিংহ এমনি পাষণ্ড, যে, আপন রাজ্যে কোনো অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করে নাই। তাহার উচিত, যে, এই স্থলে একটী দেবালয় করিয়া পথিক ও ভিক্ষুকদিগের আশ্রয় স্থান করিয়া দেয়।" গোলাপ সিংহ এই উপদেশ পাইয়া পর দিন উহার মূলপ্রস্তর স্থাপনা করিলেন এবং যে গুম্বট পূর্ব্বে হিংস্র জন্তুদিগের আবাস ছিল এবং যে স্থানে মনুষ্য দিবাভাগেও যাইতে ভীত হইত, তাহা এক্ষণে অতি রমণীয় ও নগরের সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান হইয়াছে।

গুম্বটের সম্মুখ দিয়া প্রকাশ্য পথের দক্ষিণ ভাগে একটী বর্ত্ম বাহির হইয়া গিয়াছে। উহা দিয়া কিয়দ্দূর যাইলে ইংরাজদিগের বাসের নিমিত্ত মহারাজা যে কতিপয় সুরম্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। এস্থানে মহারাজার ছাউনি আছে।

গুম্বট অতিক্রম করিয়া প্রকাশ্য পথ দিয়া কিয়দ্দূর গেলে বামভাগে মহারাজার সংস্থাপিত নব প্রাণী-শালা দৃষ্ট হয়। তাহাতে শ্বেত শূকর প্রভৃতি অনেক পশু ও পক্ষী সংক-

লিত আছে এবং অদ্যাপিও দিন দিন আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য প্রাণী সকল সংগৃহীত হইতেছে।

আরো কিয়দ্দূর গমন করিলে চতুষ্পথ। বামভাগের পথে মুদ্রাঙ্কণ যন্ত্রালয়। এস্থানে সংস্কৃত, হিন্দি, পারসীক, উর্দ্দু এবং ডোগ্রা ভাষায় পুস্তকাদি মুদ্রিত হয় এবং "বিদ্যা-বিলাস" নাম্নী সাপ্তাহিক সমাচার পত্রিকা উর্দ্দু ও ডোগ্রা অক্ষরে প্রকাশিতা হইয়া থাকে। কিঞ্চিৎ দূরে নব প্রতিষ্ঠিত উপবন। ইহা অতিক্রম পূর্ব্বক কিছু ঊর্দ্ধে উঠিলে সৈন্য-প্রদর্শন-ক্ষেত্র পাওয়া যায়। কেবল মাত্র ইহাই জম্বু নগরের সমতল ভূমি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহা অতি প্রশস্ত। প্রত্যহ সৈন্যগণ এস্থলে রণবিদ্যা শিক্ষা করে এবং প্রতি রবিবারের সায়ংকালে মহারাজা স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সৈন্য-প্রদর্শন দর্শন করেন।

চতুষ্পথের সম্মুখস্থ পথ দিয়া গেলে সর্ব্বাদৌ বামভাগে দাতব্য ঔষধালয়। তথায় দুঃখী লোকেরা প্রত্যহ রীতিমত ঔষধ পাইয়া থাকে। পরে কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে উঠিলে বামভাগে অতি সুন্দর বিদ্যালয়-বাটী। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, যে, প্রায় তিন শত বালক এখানে ইংরাজী, সংস্কৃত, আরবী ও পারসীক এবং ডোগ্রা ভাষায় বিদ্যাশিক্ষা করিয়া থাকে। বিদ্যালয় অতিক্রম করিয়া আরো ঊর্দ্ধে উঠিলে অনতিদূরেই "পুরাণ মণ্ডী" অর্থাৎ পুরাতন রাজ-প্রাসাদ। এক্ষণে উহার ভগ্নাবশেষ মাত্র রহিয়াছে। ইহার বামভাগস্থ পথ দিয়া গমন করিলে সৈন্য প্রদর্শন ভূমির পার্শ্ববর্ত্তী মাতঙ্গ-শালায় বৃহদ্‌কায় বারণগণ শৃঙ্খলবদ্ধ রহিয়াছে, দেখিতে

পাওয়া যায়। উহার সন্নিকটে রাণী-তলাও অর্থাৎ রাজা ধ্যানসিংহের রাণী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিতা পুষ্করিণী এবং দেওয়ান জোয়ালা সাহের অত্যুচ্চ মন্দির আছে।

উক্ত চৌমাথার দক্ষিণ-দিগ্‌স্থ পথের প্রবেশ দ্বারে জগাতি অর্থাৎ যে সমুদয় দ্রব্য বাণিজ্য-সূত্রে নগর মধ্যে আনীত হয়, তাহাদের শুল্ক আদায় স্থান। এই পথটী অতি প্রশস্ত এবং পাষাণ নির্ম্মিত; সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহার দুই পার্শ্বে আপণ-শ্রেণী আছে।

এখানে গুম্বট, উর্দ্দু, মস্তগড়, জোলা-কে-মহল্লা, পাক্কা ডাঙ্গা, ধোন্‌শ্লী প্রভৃতি অনেক পল্লী আছে। নগরের পূর্ব্ব-উত্তর প্রান্তভাগের নাম ধোন্‌শ্লী। তদতিক্রম করিয়া যে অব-তরণ পথ পাওয়া যায়, তাহাকে "বাবা নারায়ণ দাসকি ঢাক্কী" কহে। কারণ, উহার নিম্নদেশে নদীতটে নারায়ণ দাস নামক এক তপস্বীর আশ্রম আছে। ইহাই কাশ্মীর গমনের পথ।

বাবা নারায়ণ দাসের ঢাক্কী দিয়া অবতরণ করতঃ সমতলভূমি পাওয়া যায় এবং কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত তাবীনদীর দক্ষিণ তট দিয়া গমন করিতে হয়। এই পথ অতি সরল এবং ইহাতে পর্য্যটক দিগের কোনো প্রকার ক্লেশ হয় না। বিমল চন্দ্রালোকে এবং শীতল মারুতহিল্লোলে এই পথে গমন করিতে অতি প্রীতিকর। চারি মাইল গমন করিলে একটী ক্ষুদ্র পল্লী প্রাপ্তব্য। উহাকে নাগরোটা কহে। এস্থলে স্বর্গগত রাজা ধ্যান সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র পুঞ্চাধিপতি রাজা মতি সিংহের একটী মন্দির আছে। কিন্তু থাকিবার কোনো উত্তম স্থান নাই। এ স্থান হইতে দুই মাইল দূরে আর একটী পল্লী

আছে, তাহার নাম কণ্ডোলী। এস্থলে কতিপয় দোকান দৃষ্ট হয়। আর এক মাইল গেলে সমতল ভূমির শেষ এবং দংশালের দূরারোহ পাহাড়ের আরম্ভ। এই পাহাড় বালু-পাষাণ-বিশিষ্ট এবং অতি মস্থণ। সর্ব্বোদো আরোহণ অতি সরল উচ্চ। সম্মুখে অনন্ত গিরিমালা দৃষ্টি-রোধ করিতেছে; তদুপরি পথ সূত্রাকারে পড়িয়া রহিয়াছে; আরোহীগণ মন্থর গতিতে অতি কষ্টে আরোহণ করিতে করিতে এক এক ঝোঁকে কয়েক পাদমাত্র গিয়া কোনো পাষাণোপরি বিশ্রাম করিতে বাধিত হইতেছে; এবং যখন শিখর দেশে উপনীত হইল, তখন অতি ক্ষুদ্রকায় দেখাইতেছে. ইত্যাদি নিরীক্ষণ করিলে যথার্থই হৃৎকম্প হইতে থাকে। কিন্তু শৃঙ্গোপরি আরোহণ করিলে সৃষ্টির শোভা বিলোকনে মনে অতি অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হয়—মনে লাগে, যেন নূতন জগতে উপনীত হইলাম! ইহা অতিক্রম করিয়া এক অধিত্যকা। উহা প্রায় দুই মাইল বিস্তৃত এবং উহার শেষ ভাগে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী ও দুই একখানি দোকানও আছে। তদনন্তর পথ অতি সরল এবং তিন চারি স্থানে দুই পার্শ্বে অতি উচ্চ ও আট দশ হাত করিয়া দীর্ঘ পাষাণদ্বয়ের দ্বিহস্তমাত্র প্রশস্ত সুরঙ্গ আছে, তন্মধ্য দিয়া পালকী গমন করে। ফলে কোনো কোনো স্থান এমন সংকীর্ণ, যে, তন্মধ্যে পালকী আটকাইয়া যায় এবং বাহকগণ মস্তকে করিয়া পালকী পার করিতে বাধিত হয়। এইরূপে এক মাইলের অধিক পথও যাওয়া আবশ্যক। পরে একটী ক্ষুদ্র জলাশয়। উহাতে পদ্মপুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে এবং উহার সন্নিকটে দুইখানি দোকান

আছে। অনন্তর তিন মাইল দূরে সেড্ডে নামক স্থান পর্য্যন্ত এমন দুর্গম ও আপজ্জনক, যে, কাশ্মীরের সমস্ত পথের মধ্যে কুত্রাপিও তেমন নহে। ইহাতে পদে পদে কেবল উত্থান ও পতন। স্থানে স্থানে প্রকৃত পথ নাই। মনুষ্যের গতায়াতে যৎসামান্য পথ হইয়া গিয়াছে। আবার অনেক স্থানে অত্যুচ্চ সরল পাষাণ গাত্রে এমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সোপান শ্রেণী (যাহাকে খুপরী কহে) আছে, যে, কেবল মাত্র পদাঙ্গুলির ভর দিয়াই হামাগুড়ি ভাবে তাহাতে উঠিতে হয়। কোনো কোনো স্থান এমন মসৃণ, যে, পদ স্থির থাকে না। এই পথে সকলকেই পদব্রজে গমন করিতে হয়। তবে ভদ্রমহিলাগণের পালকী অধিক সংখ্যক বাহক সাহায্যে পার হইয়া থাকে। গ্রহ-বৈগুণ্যে এস্থলে পদস্খলনজনিত কোনো দুর্ঘটনা ঘটিলে তাহার অন্তিম ফল যে কত দূর শোকাবহ হয়, তাহা এখন গৃহে বসিয়া স্মরণ করিলেও শরীর কাঁপিয়া উঠে! এই ভয়ানক স্থান অতিক্রম পূর্ব্বক এক সংকীর্ণ উপত্যকায় অবতরণ করিতে হয়। উহার মধ্য দিয়া একটী নির্ঝরিণী উভয় তটে করবী বৃক্ষ দ্বারা শোভিতাবস্থায় প্রবাহিতা হইতেছে। কিয়দ্দূরে সেড্ডে নামক স্থান। এখানে একখানি দোকান এবং একটী অতি সুন্দর বাউলি (কূপ বিশেষ) আছে। ইহার পরে এক অতি দীর্ঘ ও দুরারোহ চড়াই। উহা অতিশয় বক্র এবং বন্ধুর। উহাতে প্রশস্ত সোপান শ্রেণী আছে বটে, কিন্তু উহার প্রত্যেকটী অতি উচ্চ এবং বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরদ্বয়ে নির্ম্মিত বলিয়া বড় সুগম নহে। গিরি শিখরে উঠিয়া একটী অপেক্ষাকৃত সুগম উতরাই দ্বারা নামিতে হয়। পরে কয়েকটী অসরল ও কঠিন

চড়াই ও উতরাই অতিক্রম পূর্ব্বক দংশালের উপত্যকায় পৌঁছিতে হয়।

দংশাল বহু লোকালয় এবং আপণবিশিষ্ট বিশিষ্ট পল্লী। ইহাতে অনেকগুলি অতি সুন্দর উৎস আছে। উহাদিগের জল অতিশয় স্বচ্ছ ও স্বাদু এবং গ্রীষ্মকালে শীতল ও শীতকালে উষ্ণ থাকে। পল্লী হইতে কিয়দ্দূরে সরকারী বাংলা অর্থাৎ মহারাজা ও পর্য্যটকদিগের বিশ্রাম স্থান। ইহা অতি বিস্তৃত ও পরিষ্কৃত।

২। দংশাল হইতে কিরিমচী—১২ মাইল।

দংশাল পরিত্যাগ করিয়া এক নিম্ন উতরাই দিয়া অবতরণ পূর্ব্বক একটী নদী পার হইতে হয়। ইহার জল গভীর নহে। সুতরাং ইহার উপরে কোনো সেতু না থাকাতেও গতায়াতের কষ্ট হয় না। অনন্তর একটী অতি দীর্ঘ ও ভয়াবহ চড়াই অতিক্রম করিতে হয়। ইহাকে বড়ূটী কহে। ইহা কড়াইধার নামক গিরিমালার একটী অত্যুচ্চ অঙ্গ। দংশাল হইতে এই পথকে ঠিক যেন একটী অজগর সর্প বক্র-গতিতে শয়ান রহিয়াছে, এমনি দেখায়। দর্শন মাত্রেই মনে যেমন ভয়ের সঞ্চার হয়, অতিক্রম করিতেও পদে পদে তেমনি বা ততোধিক হৃৎকম্প উপস্থিত হইতে থাকে। ইহাকে তিন অংশে বিভাগ করা যাইতে পারে। প্রথমাংশ অর্দ্ধ মাইল। ইহা সুগম এবং এক ক্ষুদ্র অধিত্যকায় গিয়া শেষ হইয়াছে। তথায় একটী শীতল ছায়াপ্রদ বট বৃক্ষ আছে। এই ভাগের মধ্য পথে দক্ষিণ পার্শ্বে এক অতি-বৃহৎ ও সরল-উচ্চ পাষাণ খণ্ড রহিয়াছে। উহার গাত্রে কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোপান (খুসরি)

দৃষ্ট হয়। অনেক দুঃসাহসী পুরুষ ও পালকী-বাহকেরা সময় বাঁচাইবার জন্য প্রাণের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া এই দুর্গম পথ দিয়া গমন করিয়া থাকে। কিন্তু এমন অসমসাহসিক কর্ম্ম করিয়া ইচ্ছা পূর্ব্বক মৃত্যুর হস্তে পতিত হওয়া কাহারো উচিত নহে। দ্বিতীয় অংশ এক মাইল দীর্ঘ ও অতি দুর্গম। ইহার শেষ ভাগে একটী ক্ষুদ্র জলাশয় আছে। তৃতীয় অংশও প্রায় এক মাইল দীর্ঘ। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা দুর্গম, সরল-উচ্চ এবং আপজ্জনক। এই শৈল শিখর হইতে সৃষ্টির শোভা অতি রমণীয় দেখায় এবং তজ্জনিত অনির্ব্বচনীয় প্রীতির গুণে উত্থান-কষ্ট ভুলিয়া যাইতে হয়। অপর পার্শ্বস্থ উতরাই অপেক্ষাকৃত সুগম। ইহাতে সমদূরবর্ত্তী তিনটী উত্তম উৎস আছে। তন্মধ্যে প্রথমটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এবং তিনটীই অতি সুন্দর পাষাণ দ্বারা বাঁধানো।

তদনন্তর এক সংকীর্ণ, বন্ধুর ও নিম্ন উপত্যকায় অবতরণ করিতে হয়। তন্মধ্য দিয়া অনেক নির্ঝরিণী প্রবাহিতা হইতেছে। কিয়দ্দূরে উগ্রবাণী নামক স্থান। এখানে একটী জলাশয় ও দোকান আছে। ইহা হইতে কিঞ্চিৎ দূরে একটী স্রোতস্বতী পার হইয়া অল্প ঊর্দ্ধে উঠিয়া অপেক্ষাকৃত সমতল ভূমি এবং একটী পল্লী পাওয়া যায়। উহার নাম গড়ী। উহার প্রবেশ পথে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত ও আর একটী ইষ্টক নির্ম্মিত অষ্টকোণ বিশিষ্ট ভবনদ্বয়ের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে। এই পল্লীতে কতিপয় দোকানও আছে। অনন্তর কয়েক মাইল পর্য্যন্ত উক্ত সমভূমি দিয়া গমন করিয়া এবং তন্মধ্য-প্রবাহিত কয়েকটী নির্ঝরিণী পার হইয়া একটী অনতি-

দীর্ঘ সুগম চড়াই অতিক্রম পূর্ব্বক কিরিমচীতে উপনীত হইতে হয়। পথের এই অন্তিম ভাগে অনেক মনোহর প্রস্রবণ আছে। বিশেষতঃ কিরিমচীর সন্নিকটে একটী অতি সুন্দর প্রস্রবণ দেখিতে পাওয়া যায়। জনৈক ধনাঢ্য তাহার সম্মুখে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন এবং উহার স্রোত-মুখ এমন ভাবে স্থাপিত করিয়া দিয়াছেন, যে, ইহা মন্দিরের মধ্যদেশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া নীচে পতিত হইতেছে। উহার জল অতি নির্ম্মল ও স্বাস্থ্যকর।

দংশালের ন্যায় কিরিমচীও উত্তম পল্লী। এখানে অনেক লোকালয় এবং বিপণি আছে। পল্লীতে প্রবেশ করিয়া দক্ষিণ ভাগে অত্যুন্নত ভূমির উপরে সরকারী বাংলা। কিন্তু এখানে জল কষ্ট বলিয়া ইহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপর প্রান্তভাগে "ঠাকুর দোয়ারা" অর্থাৎ দেবালয়ে বিশ্রাম স্থান করা পরামর্শসিদ্ধ। এই স্থান অতি পবিত্র ও রমণীয়। ইহার বহির্দ্দেশে এবং অন্তঃপুরে দুইটী অতি উত্তম উৎস আছে এবং ইহার সম্মুখ দিয়া স্রোতস্বতী প্রবাহিতা হইতেছে।

৩। কিরিমচী হইতে মীর—১২ মাইল।

সরকারী বাংলা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপণ শ্রেণীর মধ্য দিয়া আসিয়া এক নির্ঝরিণী পার হইতে এবং পূর্ব্বোক্ত ঠাকুর-দোয়ারা বামভাগে রাখিয়া সমতল ভূমির উপরে উঠিতে হয়। প্রায় অর্দ্ধ মাইল এই সমতল ভূমির উপর দিয়া গমন করিয়া সম্মুখে আর একটী নির্ঝরিণী পাওয়া যায়। ইহা পার হইয়াই একটী আরোহণ। উহা দৈর্ঘ্যে ন্যূনাধিক অর্দ্ধ মাইল। কিন্তু অতি দুর্গম। তৎপরবর্ত্তী পথ গিরিমালার গাত্র

দিয়া চলিয়া গিয়াছে। কিয়দ্দূর যাইয়া এক ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী পার হইতে হয়। তুষার দ্রব হইলে বা বৃষ্টি হইয়া গেলে ইহাতে প্রবাহ বাহিত হইয়া থাকে। পরে একটী অতি কঠিন আরোহণ দিয়া পাহাড়ের গাত্রে উঠিতে হয়। অনন্তর পথ পূর্ব্বোক্তের ন্যায় গিরিমালার গাত্র দিয়া কোনো স্থানে ঋজু, কোনো স্থানে বা বক্র, কোথাও সুগম এবং কোথাও বা দুর্গম ভাবে চলিয়া গিয়াছে। ইহার শেষ ভাগ অতি দুর্গম এবং সরল উচ্চ চড়াই রূপে পরিণত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা এক অত্যুচ্চ শিখরদেশে উঠিতে হয়, তথা হইতে সৃষ্টির শোভা অতি বিচিত্র দেখায়। উহা হইতে অবতরণ অতি ভয়ানক। উহা সরল ঢালু, সোপান বিহীন, সুতরাং অতি আপজ্জনক। এই অবতরণ দিয়া কিয়দ্দূর যাইয়া এক ক্ষুদ্র পাহাড়ে নামিতে হয়; তাহার পার্শ্বদেশে কতিপয় কুটীর আছে। এই স্থানকে মীর কহে। এখানকার সরকারী বাংলাও অতি উত্তম। কিন্তু এখানে কেবল একখানি মাত্র সামান্য দোকান আছে।

৪। মীর হইতে লান্দর—১২ মাইল।

মীর পরিত্যাগ করিয়া একটী ক্ষুদ্র ও সুগম চড়াই অতিক্রম করিতে হয়। পরে পথ আট মাইল পর্য্যন্ত কেবলই অবতরণ। ইহা স্থানে স্থানে অসরল, সোপানহীন, বৃহৎ বৃহৎ পাষাণসমন্বিত ও ঢালু। কিন্তু সাধারণতঃ দুর্গম ও কষ্টসাধ্য নহে। অনন্তর একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী পার হইয়া অতি দুরূহ চড়াই পাওয়া যায়। উহার নাম কন্না। উহা দৈর্ঘ্যে প্রায় তিন মাইল এবং এমন বক্র, যে, কুণ্ডলাকারে আরোহণ করিতে হয়। উহার সোপান-শ্রেণী অতি উচ্চ, বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর-

নির্ম্মিত, সুতরাং অতি বন্ধুর এবং দুরারোহ। কিন্তু গিরিশৃঙ্গে উঠিয়া চারিদিগস্থ নৈসর্গিক শোভা দর্শনে সৃষ্টিকর্ত্তার অচিন্ত্য শক্তি চিন্তা করিতে করিতে মন প্রেমানন্দে পূর্ণ হইয়া যায়। ইহার বিপরীত ভাগস্থ উতরাইকে চুলনা কহে। ইহা যদিও অতি দীর্ঘ ও অতি ঢালু নহে, তথাপি গমন করিতে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। কারণ ইহা পর্ব্বতের শিরোদেশ ও গাত্র দিয়া গমন করিয়াছে; পথ অতি সংকীর্ণ এবং দক্ষিণপার্শ্ব এমন নিম্ন ও গভীর, যে, দৃষ্টি করিলে মস্তক ঘুরিতে থাকে। পরবর্ত্তী পথ উপত্যকার মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। কিয়দ্দূর যাইয়াই লান্দর দেখিতে পাওয়া যায়।

লান্দর একটী ক্ষুদ্র পল্লী। ইহাতে কতিপয় বিপণি আছে। প্রবেশ পথে এক নির্ঝরিণী ও একটী অত্যুত্তম উৎস অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বস্থ অত্যুচ্চ ভূমির উপরে সরকারী বাংলা। ইহাকে দুর্গ কহে। ইহা প্রস্তর-নির্ম্মিত এবং উত্তম বাসোপযোগী।

৫। লান্দর হইতে বিলাওৎ—১৫ মাইল।

প্রায় অর্দ্ধ মাইল উন্নতানত ক্ষেত্রের উপর দিয়া যাইতে হয়। পরে বিখ্যাত লাড়োলাড়ী বা লাড়ালাড়ার পাহাড় দৃশ্যমান। ইহা দৈর্ঘ্যে ৭॥০ মাইল। সর্ব্বাদৌ চড়াই অতিশয় বক্র ও বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরপূর্ণ বলিয়া অতি দুর্গম। ইহা প্রায় অর্দ্ধ মাইল দীর্ঘ। পরে মাইলদ্বয় পর্য্যন্ত পথ পাহাড়ের গাত্র দিয়া গিয়াছে। তদনন্তর এক ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী পার হইয়া অনুচ্চ আরোহণ দিয়া উঠিয়া সমতল ক্ষেত্রের উপরে পতিত হইয়াছে। তৎপরে আর একটী আরোহণ। ইহা দ্বিতীয় অপেক্ষা

অসরল এবং দুর্গম। অনন্তর চতুর্থ আরোহণ। ইহা অতি সুগম। পরে অতি দুরারোহ পঞ্চম আরোহণ। ইহাই প্রকৃত লাড়োলাড়ী। ইহা যেমন উচ্চ, তেমনি দুর্গম। এস্থলে প্রায় সতত মেঘ সঞ্চরণ করিয়া থাকে, সুতরাং অতিশয় শীতল। পর্ব্বতের শিখরে প্রস্তর-খোদিত লাড়ীলাড়ার (বর-কন্যার) ও চন্দ্রসূর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি আছে। এরূপ কিম্বদন্তী, যে, অতি পূর্ব্বকালে একদা কোনো বর ও কন্যা এবং বহুসংখ্যক বরযাত্রী এই শৈলপথ দিয়া গমন করিতেছিল। পূর্ব্বে এস্থলে কোনো প্রণালী বা জলপ্রবাহ ছিল না। পূর্ব্বোক্ত হতভাগ্য ব্যক্তিগণ পিপাসায় এমনি কাতর হইয়াছিল, যে, জলাভাবে সকলকেই প্রাণত্যাগ করিতে হইল। এই শোকাবহ ঘটনায় নায়ক নায়িকার নামানুসারে ইহার নাম লাড়োলাড়ী বা লাড়ী-লাড়া হইয়াছে। লাড়ী শব্দের অর্থ কন্যা এবং লাড়ো বা লাড়া শব্দের অর্থ বর। বস্তুতঃ এই চড়াই যেরূপ দুর্গম, তাহাতে জলাভাবে এরূপ শোচনীয় ঘটনা কোনো মতে কাল্পনিক নহে। অধুনা প্রবাহ প্রত্যাবৃত্ত হইয়া জলকষ্ট দূর হইয়াছে। কার্ত্তিক মাসের শেষে এখানে তুষারপাত হইয়া থাকে। বিপ-রীত ভাগস্থ অবতরণ আদৌ অতি ঢালু ও আপজ্জনক। অন-ন্তর কয়েক মাইল দূর পর্য্যন্ত পথ পর্ব্বতের গাত্র দিয়া সুগম হইয়া গিয়াছে। পরে আর একটী সরল ঢালু অবতরণ দিয়া নামিয়া কিয়দ্দূর গমন করতঃ বিলাওৎ আড্ডায় পৌঁছিতে হয়।

বিলাওতে কেবল মাত্র সরকারী বাংলা এবং এক খানি দোকান আছে। বনহাল পথের সমুদয় আড্ডার মধ্যে এইটী

বিজন প্রদেশে স্থিত। কিন্তু এস্থান হইতে সৃষ্টির অতি রমণীয় শোভা নয়নগোচর হয়।

৬। বিলাওৎ হইতে রামবন—৯ মাইল।

বিলাওৎ হইতে রামবন দৃষ্টিগোচর হয় এবং অতি নিকটস্থিত বলিয়া বোধ হইতে থাকে। কিন্তু পার্ব্বত্য দেশের পথ স্বাভাবিক বক্রগতিতে গমন করিয়াছে বলিয়া উহার দূরতা ৯ মাইল। এই পথে চন্দ্রভাগা নদী পার হইতে হয়। বিলাওৎ হইতে উহাকে যেন নিশ্চল ফেণপুঞ্জ পড়িয়া রহিয়াছে এবং উহার ঊর্দ্ধস্থ পথ এক গাছি সূতা বক্রভাবে পতিত থাকিয়া স্থানে স্থানে উহার গর্ভে লীন হইয়াছে, এমনি ভ্রম জন্মায়। প্রত্যুত, দূর হইতে পথের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া যেমন হৃৎকম্প হইয়া থাকে, কার্য্যতঃ তাহাই বটে। বিলাওৎ পরিত্যাগ করিয়া অবধি চন্দ্রভাগার সেতু পর্য্যন্ত সার্দ্ধ চারি মাইল কেবল অবরোহণ বা পতন। প্রথমতঃ পাহাড়ের মধ্য ও পার্শ্ব দিয়া কিয়দ্দূর আসিয়া কতিপয় বিপণি দেখিতে পাওয়া যায়। উহা অতি ঊর্দ্ধে স্থিত। তথা হইতে সেতু পর্য্যন্ত পথ এমন ঢালু ও চিক্কণ, যে, পদ স্থির থাকে না। তাহাতে আবার বৃষ্টি হইয়া গেলে ইহা যে কতদূর ভয়াবহ হয়, তাহা পাঠকগণ অনুভব করিয়া লউন। পথ সংকীর্ণ ও সরল ঢালু—ঠিক বাম ভাগে সহস্র সহস্র হস্ত নীচে চন্দ্রভাগা ভীষণাকারে বক্ষঃ তুলিয়া শত শত বজ্রনিনাদিত স্বরে কর্ণ বধির করিয়া প্রবাহিত হইতেছে—বাম ভাগে কিছুমাত্র ব্যবধান নাই। সুতরাং এমন স্থলে পদস্খলন-জনিত বা অন্য কোনো প্রকার আপদ ঘটিলে তাহার পরিণাম যে কতদূর শোকাবহ, তাহা নির্জীব লেখনী

লিখিতেও কাঁপিয়া উঠে। গত বৎসরে মদগ্রজ এবং আমি সপরিবারে এই পথ দিয়া কাশ্মীর যাইতেছিলাম। যৎকালে আমরা এই স্থানে অবরোহণ করি, তখন ন্যূনাধিক পঞ্চাশৎ বৃষ কূট-ভার* লইয়া শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বিপরীত দিক হইতে আসিতেছিল। আমাদিগের সমভিব্যাহারে চারি খানি পালকী ছিল। তন্মধ্যে এক খানির লাল আচ্ছাদন দেখিয়া একটী বৃষ এমন ভীত হইয়া নদীর দিকে ধাবিত হইল, যে, বৃক্ষের ব্যবধান না পাইলে সে তদ্দণ্ডেই নদীগর্ব্ভে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব পাইত। এই ভয়াবহ ব্যাপার দৃষ্টে আরোহীগণ বাহকদিগকে সংযত করিলেন। কিন্তু আমার পালকী কয়েক পাদ অগ্রসর হইয়াছিল এবং বাহকেরা দুঃসাহসী ছিল। উহাদিগকে পুনঃ পুনঃ নিবৃত্ত করিলেও তাহারা মদ্বাক্যে উপেক্ষা করিয়া যেমন অগ্রগামী হইবে, অমনি একটী বৃষের ধাক্কা লাগিয়া পালকী বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। আমি এবং আমার ক্রোড়স্থ পঞ্চম বর্ষীয় বালক সৌভাগ্যক্রমে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ পর্ব্বতে পড়িয়া রক্ষা পাইলাম—বাহকদিগের কেহ কেহ আহত হইল—বৃষ বাম দিকে শত শত হস্ত নিম্নে গড়াইয়া পড়িল; একটী বৃহৎ বৃক্ষে আটকাইয়া উহার প্রাণরক্ষা হইল। কূটের ছালা গড়াইতে গড়াইতে নদীগর্ভে পতিত হইয়া যে কোথায় চলিয়া গেল, তাহার নিদর্শনও পাওয়া গেল না—বৃষ রক্ষক মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে লাগিল। ঈশ্বর-কৃপায় এই

---

* কূট এক প্রকার কাশ্মীরজ বৃক্ষের মূল। ইহা দ্বারা রঙ্গের কর্ম্ম হইয়া থাকে। ইহা অতি মূল্যবান; এক বৃষের ভার অর্থাৎ এক ছালা কূটের মূল্য চল্লিশ টাকা।

ভয়ানক ঘটনায় যে কোনো জীবের প্রাণনষ্ট হয় নাই; ইহাই সুখের বিষয়। পর্য্যটকদিগকে পরামর্শ দিতেছি, যে, যখন তাঁহারা এই পথ দিয়া গমন করিবেন, তখন যেন উক্ত ঘটনার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সতর্ক হয়েন।

পূর্ব্বে চন্দ্রভাগার উপরে রজ্জুর সেতু ছিল; উহা যে কতদূর আপৰ্জ্জনক, তাহা বলিবার শব্দ নাই। মহারাজা এক্ষণে অতি উপাদেয় কাষ্ঠের সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন এবং লৌহময় করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। নদী পার হইয়া দুই মাইল পর্য্যন্ত পথ সমতল ভূমির উপর দিয়া গিয়াছে। উহাতে অনুন্নত চড়াই ও সুগম উতরাই আছে। পরে মাইল দ্বয় অতি দুর্গম। ইহা অতি উন্নত চড়াই এবং শ্লেট বিশিষ্ট পাহাড়ের অসরল পার্শ্ব দিয়া উঠিয়াছে। এই স্থান অতি সংকীর্ণ, স্থানে স্থানে নির্ঝরিণীর জল দ্বারা সিক্ত এবং ইহার ঠিক বাম ভাগে শত শত হস্ত নীচে চন্দ্রভাগা ভীমনাদে প্রবাহিত হইতেছে। সুতরাং এই পথের প্রথমার্দ্ধের শেষ ভাগের ন্যায় ইহাও সমূহ আপজ্জনক। অনন্তর অর্দ্ধ মাইল সমভূমির উপর দিয়া গিয়া রামবনে পৌঁছিতে হয়।

রামবন অতি উত্তম স্থান। ইহা উপত্যকায় স্থিত এবং অনেক লোকালয় ও আপণবিশিষ্ট। সরকারী বাটী দ্বিতল এবং উত্তম। স্ত্রীলোকদিগের থাকিবার নিমিত্ত ইহার পশ্চাদ্ভাগে একটী স্বতন্ত্র অট্টালিকা আছে। আড্ডাতে প্রবেশ করিবার পথে বাম ভাগে মহারাজার একটী মনোহর উপবন। ইহাতে নানাজাতীয় পুষ্প, লেবু, ফল, তরকারি এবং বিবিধ তরু ও লতা প্রাপ্য। এই স্থলে চন্দ্রভাগা নদী পাহাড়ের মধ্য

দিয়া গমন করিতেছে বলিয়া ইহার আকার এমন ভীষণ ও শব্দ এমন বধিরকর, যে, যাঁহারা পঞ্জাবের সমতল ভূমিতে ইহার স্থির প্রকৃতি দেখিয়াছেন, তাঁহারা ইহাকে সেই চন্দ্রভাগা বলিয়া সহসা বিশ্বাস করেন না। চন্দ্রভাগার গর্ভস্থ অনেক উপলখণ্ড সংগ্রহ করিয়া দেখা গিয়াছে, যে, তাহাতে স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রভৃতি ধাতুর স্পষ্ট নিদর্শন আছে। সুতরাং সপ্রমাণ হইতেছে, যে, ইহাতে অনেক বহুমূল্য ধাতুর আকর গুপ্ত ভাবে থাকিতে পারে।

৭। রামবন হইতে রামসু—২০ মাইল।

এই পথ সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ, কিন্তু অতি দুর্গম নহে। ইহা সুগম ও দুর্গম উভধর্ম্মাক্রান্ত। রামবন পরিত্যাগ করিয়া অগভীর উতরাই দিয়া অবতরণ আবশ্যক। পরে সমভূমির উপর উঠিয়া অর্দ্ধ মাইল যাইতে হয়। অনন্তর ছয় মাইল পর্য্যন্ত পথটী চন্দ্রভাগার দক্ষিণ কূল ও অত্যুচ্চ শ্লেটময় পাহাড়ের তল দিয়া গমন করিয়াছে। ইহা অতি সুগম এবং অনুন্নত, এজন্য আপজ্জনক নহে। পরে চারি মাইল পর্য্যন্ত উক্ত তটিনীর তট দিয়া যাইতে হয় বটে, কিন্তু পথটী স্থানে স্থানে তীর হইতে অদূরবর্ত্তী এবং সামান্য আরোহণ ও অবরোহণ বিশিষ্ট। তদনন্তর পথ উত্তুঙ্গ গিরিমালার গাত্র দিয়া গিয়াছে। ইহার চড়াই ও উতরাই অতি সুগম। ইহার সহস্র সহস্র হস্ত নিম্নে বিশলড়ী নদী ভীষণ নিনাদে বক্রগতিতে গমন করিতেছে। যতদূর গমন করা যায়, পদতলে বিশলড়ীকে প্রবাহিত দৃষ্ট হয়। রামসু হইতে ছয় মাইল দূরে যাইয়া এই নদীগর্ভে নামিবার প্রয়োজন। ইহাতে বৃহৎ

বৃহৎ পাষাণ আছে এবং প্রকৃত পথ না থাকাতে ইহা অতি কষ্টে অতিক্রম করিতে হয়। কিয়দ্দূর যাইয়া দুইটী অতি সুন্দর ও বৃহৎ কন্দর—এক এক বৃহৎ পাষাণখণ্ড যে প্রকারে উহাদের ছাদরূপে পরিণত হইয়াছে, তাহা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। মনুষ্য ও পশ্বাদি অতি সুখে উহাদের অভ্যন্তরে বিশ্রাম করিয়া থাকে। অনন্তর তিন মাইল পর্য্যন্ত চড়াই ও উতরাই অতি দুর্গম এবং ভয়াবহ। পূর্ব্বে চড়াই সরল উচ্চ এবং দুরারোহ ছিল বলিয়া মহারাজা শৈল-তল দিয়া নূতন পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। এতদ্দ্বারা চড়াই সুগম হইয়াছে বটে, কিন্তু উতরাই বিশলড়ীর ঠিক কিনারা দিয়া গিয়াছে এবং কুটিল বলিয়া অতি আপজ্জনক। কিয়দ্দূর যাইয়া এক কাষ্ঠ-নির্ম্মিত সেতু দ্বারা উক্ত বিশলড়ী পার হইয়া অপর ভাগস্থ পাহাড়ের তলদেশে রামসু নামক আড্ডাতে উপনীত হইতে হয়।

রামসু কতিপয় আপণ-সমন্বিত ক্ষুদ্র পল্লী। এখানকার সরকারী বাংলা নিন্দনীয় নহে।

৮। রামসু হইতে বনিহাল—১৫ মাইল।

রামসু পরিত্যাগ করিয়া এক অনুন্নত চড়াই। পরবর্ত্তী পথ সামান্য আরোহণ ও অবরোহণ বিশিষ্ট এবং বিশলড়ী নদীর উপত্যকা দিয়া গিয়াছে। এই রূপে তিন মাইল পর্য্যন্ত যাইয়া এক কাষ্ঠ-সেতু দ্বারা উক্ত নদী পার হওতঃ দক্ষিণ তটে যাইতে হয়। এক মাইল গমন করিলেই একটী চড়াই। ইহা প্রায় এক মাইল উচ্চ এবং সুগম। বিপরীত ভাগস্থ উতরাই প্রায় ঐরূপ দীর্ঘ এবং সুগম্য। অনন্তর বিশলড়ী পুনরায় অতি-

ক্রম করিয়া একটী কুটিল ও দুর্গম চড়াই আরোহণ করিতে হয়। উহা প্রায় দেড় মাইল দীর্ঘ এবং পাহাড়ের মধ্যদেশ দিয়া গিয়াছে বলিয়া নিতান্ত আপজ্জনক নহে। ইহার শিখর-দেশে এক অনতিবিস্তৃত অধিত্যকা আছে। এই অধিত্যকার উপরে উঠিয়া সম্মুখে আর একটী ভয়াবহ চড়াই দেখিতে পাওয়া যায়। উহা অত্যুচ্চ পর্ব্বতমালার শৃঙ্গ দিয়া গিয়াছে এবং স্থানে স্থানে অতিশয় দুর্গম। অনন্তর পথ প্রশস্ত এবং স্থানে স্থানে অল্প উচ্চ ও স্থানে স্থানে অল্প নিম্ন হেতু সুগম বটে, কিন্তু উত্তুঙ্গ শৈলশিখরাগ্র দিয়া গমন করিয়াছে বলিয়া এবং দক্ষিণ ভাগে অতলস্পর্শ গভীরতা দেখিয়া হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। এইরূপে তিন মাইল পর্য্যন্ত গিয়া একটী অতি সুন্দর উৎস দেখিতে পাওয়া যায়। অনন্তর উতরাই আরম্ভ হয়। এই স্থানে যাইতে যাইতে বিপরীত গিরি-শ্রেণীতে যে একটী অতি রমণীয় রামধনু দেখিয়াছিলাম, এমন আর কুত্রাপি দেখি নাই। উহা সম্পূর্ণ অবয়ব বিশিষ্ট ও অতি দীর্ঘ এবং বোধ হইল, যেন শৈলেশ্বর নানাবর্ণে খচিত রত্নমুকুট শিরে ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছেন। উক্ত উতরাই অতি সুগম এবং তিন মাইল দীর্ঘ। পরে পুনরায় বিশলড়ী পার হইতে হয় এবং এক অনুন্নত চড়াই অতিক্রম করিয়া অতি সুগম উতরাই দিয়া অবরোহণ করতঃ বন্‌হালে পৌঁছিতে হয়। এই উতরাই আদৌ গিরিতল দিয়া গমন পূর্ব্বক উপত্যকার অভ্যন্তর ভেদ করিয়া গিয়াছে এবং তাহার মধ্য দেশ দিয়া বিশলড়ী শান্ত মূর্ত্তিতে প্রবাহিত হইতেছে।

বন্‌হাল একটী ক্ষুদ্র পল্লী। ইহার সুপ্রসিদ্ধ বাহকেরা

কাশ্মীরের দুর্গম পথের সম্যক্ উপযোগী। এক খণ্ড অত্যুচ্চ ভূমিতে মহারাজার দুইটী উত্তম অট্টালিকা আছে।

৯। বন্‌হাল হইতে বৈরনাগ—১৫ মাইল।

এইবার বিখ্যাত পীর পর্ব্বত অতিক্রম পূর্ব্বক কাশ্মীরের সমতল ভূমিতে পাদবিক্ষেপ করিতে হয়। বন্‌হাল হইতে ইহার তল পর্য্যন্ত প্রায় ৫ মাইল। এবং পথটী পূর্ব্বোক্ত পথের শেষভাগের ন্যায় উপত্যকার মধ্য দিয়া গিয়াছে, এস্থলে বৃহৎ বৃহৎ পাষাণ আছে এবং বিশলড়ী নদী প্রবাহিত হইতেছে। গিরিতলে কতিপয় লোকালয় এবং দোকান আছে। এই স্থলে পীর পর্ব্বত সমুদ্রতল হইতে ৯,২০০ ফিট উচ্চ। ভ্রমণকারীদিগের স্মরণ রাখা উচিত, যে, যখন প্রবল বাত্যা বহিতে থাকে অথবা বৃষ্টি বা তুষারপাত হয়, তখন পীর পর্ব্বত অতিক্রম করা অতি আপজ্জনক। কারণ. ইহার গাত্রে বা শিখরে কোনো আশ্রয় স্থান নাই। ইহাতে উঠিবার যে পথে ডাকবাহকদিগের কুটীর চতুষ্টয় আছে, তাহা অতি দুর্গম এবং পালকী প্রভৃতি যান যাইবার উপযোগী নহে। ইহার শিখরদেশ অতি উচ্চ বলিয়া সাধারণতঃ প্রবল বায়ু বহিয়া থাকে। সুতরাং ঝটিকা বা বৃষ্টি ও নীহারপাত কালে অনেকে ইহাতে আরোহণ করিয়া অনেক কষ্ট পাইয়াছে; এমন কি, কেহ কেহ প্রাণও হারাইয়াছে। প্রত্যূষে যখন আকাশমণ্ডল নির্ম্মল ও প্রকৃতি স্থিরা থাকে, তখনই ইহাতে আরোহণ করা পরামর্শসিদ্ধ। ইহার চড়াই ৪॥০ মাইল দীর্ঘ। ইহাতে উঠিবার দুই পথ আছে। একটী দুর্গম—তদ্দারা ভারবাহক ও মনুষ্য এবং পশ্বাদি গতায়াত করিয়া থাকে। অপরটী অপেক্ষাকৃত

অধিক সুগম—তাহাতে পালকী প্রভৃতি অনায়াসে গমন করিতে পারে। এই দুই পথ ব্যতীত মহারাজা আর এক সুগম পথ প্রস্তুত করিয়া দিতেছেন। এই পর্ব্বতে একটীও মহীরুহ নাই, কেবলই ঘন শ্যামল দূর্ব্বাদল এবং নানাবর্ণের ও নানা আকারের মনোহর পুষ্পবৃক্ষপুঞ্জ। কার্ত্তিক মাসের শেষে এখানে তুষার পড়িতে আরম্ভ হয় এবং ক্রমে এত অধিক পরিমাণে পড়ে, যে, তৎসমুদয় নিঃশেষে দ্রব হইতে আষাঢ়ের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপ ও অবিরত বারিধারা আবশ্যক করে। ইহার শিখরদেশে সতত মেঘ বিচরণ করিয়া থাকে। শৃঙ্গোপরি আরোহণ করিলে মনে যেরূপ ভাবের উদয় হয়, তাহা প্রকৃতরূপে বর্ণনা করিবার শব্দ নাই। জম্বু পরিত্যাগ করিয়া অবধি কেবলই উত্থান ও পতন ভাবে আসিতে হইয়াছে; এতদিন কেবলই সঙ্কটময় গিরিমালা অতিক্রম করিতেছিলাম, অদ্য তাহার শেষ হইল। পূর্ব্বে একটী শৃঙ্গে আরোহণ করিলে অপরটী সম্মুখে উদিত হইয়া দৃষ্টিরোধ করিত এবং বোধ হইত সম্মুখস্থ গিরি উল্লঙ্ঘন করিলেই আর এই দুঃসহ পথ-কষ্ট সহ্য করিতে হইবে না; কিন্তু তদুপরি গমন করিলে আবার আর একটী উপস্থিত হইয়া হৃদয় কাঁপাইয়া তুলিত—অদ্য সম্মুখে অপার সমতলভূমি ধূ ধূ করিতেছে—অগ্রবর্ত্তী উতরাই দিয়া অবরোহণ করিলেই পাহাড়ভাঙ্গা শেষ হইল—সমতলভূমিতে পদচালনা করিয়া মস্তিষ্ক স্থির হইবে—যে কাশ্মীর দর্শন করিবার জন্য এত কষ্ট সহ্য করিয়া আসিলাম, অদ্য সেই কাশ্মীর সম্মুখে বিরাজ করিতেছে—ইত্যাকার নানাবিধ ভাব মানসপথে উদয় হইয়া অভূতপূর্ব্ব আনন্দে শরীর ও মন নাচিতে থাকে!

আবার, সৃষ্টির কি রমণীয় শোভা! মৃদু মৃদু পবন-হিল্লোলে নবজলধর ক্রীড়াচ্ছলে আসিয়া আলিঙ্গন করিয়া চলিয়া গেল— যেন সেই প্রেমালিঙ্গনে সাত্ত্বিকভাবের আবির্ভাব হইয়া শরীর কাঁপিতে লাগিল—পশ্চাতে, দক্ষিণে ও বামে শৈল-শ্রেণী যেন একটী আর একটীর গায়ে ঠেস দিয়া বিশ্রাম করিতেছে— সম্মুখে কাশ্মীর উপত্যকা যেন জলের উপরে ভাসিতেছে— জনপদ সমূহ উদ্যানের মত দেখাইতেছে—বিতস্তা নদী শ্বেত উরগের মত পড়িয়া রহিয়াছে—উহার চারি দিকস্থ হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শিখরনিচয় তুষারাবৃত দেখিয়া বোধ হয়, যেন শুভ্রকেশ তাপস-প্রবরেরা মলিন ও অজিনবেশে তরুরূপ লোমরাজি ও নির্ঝররূপ যজ্ঞোপবীত গলদেশে ধারণ পূর্ব্বক প্রশান্তচিত্তে ও একতানমনে প্রাণায়ম যোগাদি সাধন করিতেছেন—দেখিলে উল্লাসের সীমা থাকে না!

পীরের উতরাই প্রায় চারি মাইল দীর্ঘ। ইহা কিঞ্চিৎ কুটিল ও ঢালু বটে, কিন্তু সুগম। গিরিতলে নামিয়া কিঞ্চিদ্দূর যাইয়া মহারাজার জগাৎ। অর্থাৎ এস্থলে মহারাজার বেতন-ভোগী কর্ম্মচারীরা কাশ্মীরের প্রবেশার্থী ও বহির্গমনার্থীদিগের রাহাধারী অর্থাৎ অনুমতিপত্র * পরীক্ষা করিয়া দেখে এবং বাণিজ্যদ্রব্যের শুল্ক সংগ্রহ করিয়া থাকে। এস্থান হইতে ন্যূনাধিক এক মাইল গেলেই বৈরনাগে উপস্থিত হওয়া যায়। বৈরনাগ অতি মনোহর ও উৎকৃষ্ট দ্রষ্টব্য স্থান। কাশ্মীরের পূর্ব্ব

* রাহাধারী সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা মুদ্রিত হওনের পর মহারাজা উহা উঠাইয়া দিয়াছেন। অতএব ভ্রামক মাত্রেরই পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

বিভাগ অধ্যায়ে ইহার বিশেষ বর্ণনা করিয়া পাঠকদিগের কৌতূহল পরিতৃপ্ত করা যাইবে। এখানে অত্যুত্তম বাসগৃহ আছে।

১০। বৈরনাগ হইতে অনন্ত-নাগ—১৬ মাইল।

এই পথ সমতল ভূমি ও ক্ষেত্রের উপর দিয়া গিয়াছে, সুতরাং অতি সরল ও সুগম্য। কিন্তু বৃষ্টি হইয়া গেলে এরূপ কর্দ্দমময় এবং চিক্কণ হইয়া উঠে, যে, পদ স্থির রাখা সুকঠিন। কিয়দ্দূর যাইয়া সাহাবাদ নামক জনপদ। এখানকার বাহকেরা বন্‌হালের ন্যায় সুবিখ্যাত, দৃঢ় এবং পার্ব্বত্য পথের সম্যক্ উপযোগী। ইহার মধ্যদেশ ও চারি দিক দিয়া জলপ্রবাহ প্রবাহিত এবং গৃহাদি এরূপে নির্ম্মিত, যে, সকলের নিম্নভাগ দিয়া জলধারা নিঃসৃত হইতেছে। সুতরাং ইহা দেখিতে অতি সুন্দর। এস্থলেও মহারাজার উত্তম বাসগৃহ আছে।

বৈরনাগ হইতে ছয় মাইল দূরে কতিপয় অসংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। তদ্দর্শনে মনোমধ্যে আশঙ্কা হয়, যে, আবার বুঝি উত্থান ও পতন আসিল। কিন্তু পথ উহাদের তলদেশ দিয়া গিয়াছে। এস্থান অতিক্রম করিয়া এক পল্লীর মধ্য দিয়া যাইতে হয়। এইরূপে সমতল ভূমির উপর দিয়া যাইয়া অনন্তনাগে উপনীত হওয়া যায়।

অনন্তনাগ উত্তম জনপদ। এখানে অত্যুৎকৃষ্ট বাসস্থান আছে। বৈরনাগের ন্যায় ইহাও কাশ্মীরের দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে গণনীয়। সুতরাং পূর্ব্ববিভাগ পরিচ্ছেদে ইহারও সবিশেষ বর্ণনা করা যাইবে। অনন্তনাগকে ইস্‌লামাবাদ বা খান্‌বলও কহিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত অর্থে, যেস্থানে (ন্যূনাধিক

এক মাইল দূরে) বিতস্তানদীতটে নৌকাদি অবস্থিতি করে, তাহাকেই খান্‌বল্‌ কহে।

১১। অনন্তনাগ হইতে শ্রীনগর—৩০ মাইল।

অনন্তনাগ হইতে শ্রীনগরে যাইবার দুইটী পথ আছে। প্রথম স্থলপথ, দ্বিতীয় জলপথ। স্থলপথে দুই আড্ডা। অনন্তনাগ হইতে ন্যূনাধিক এক মাইল দূরে বিতস্তানদী প্রবাহিত হইতেছে। পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, যে, যেস্থানে নৌকা থাকে, তাহাকে খান্‌বল কহে।

প্রায় সকলেই জলপথ দিয়া গমন করে। প্রত্যুত, এতদিন পাহাড় ভাঙ্গিয়া আসিয়া এবং কারাগাররূপ ঝাঁপান আরোহণ করিয়া যেরূপ দারুণ শারীরিক ও মানসিক কষ্টে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়, তাহাতে কোন্ ব্যক্তি প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে পরম সুখদায়ক নৌকাযান অবলম্বন না করিবে? জলের হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে অধিক বা অল্প সময়ের মধ্যে শ্রীনগরে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। অর্থাৎ যদি নদী-জলের উচ্ছ্বাস থাকে, তাহা হইলে সন্ধ্যাকালে নৌকারোহণ করিলে পর দিবস প্রত্যুষেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হওয়া সম্ভব। নচেৎ জলের হ্রাসতা নিবন্ধন এতদপেক্ষা দীর্ঘকাল লাগে।

স্থল ও জলপথে যে সমুদয় স্থান দৃষ্ট হইয়া থাকে, কাশ্মীরের পূর্ব্ব বিভাগ বর্ণনা কালে তাহাদিগের উল্লেখ করা অভিপ্রেত, এজন্য এস্থলে আর লিপি-বাহুল্য করিলাম না।

২য়। ভিম্বর ও পীর পঞ্জাল পথ

এই পথ সুগম্য। পূর্ব্বে মোগল সম্রাটেরা এই পথ দিয়া কাশ্মীরে গতায়াত করিতেন। একারণ ইহাকে বাদশাহী পথ কহে। ইহার সর্ব্বত্র কতিপয় মাইল অন্তরে তাঁহাদিগের নির্ম্মিত অত্যুৎকৃষ্ট সরাই অর্থাৎ পান্থশালার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। বর্ত্তমান কাশ্মীরাধিপতি ইহার প্রতি আড্ডাতে উত্তম উত্তম বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, এবং পর্য্যটকদিগের আহারীয় দ্রব্য ও যানবাহকাদির অভাব নিরাকরণার্থ কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন এবং মধ্যে মধ্যে অধিক ব্যয়ে ইহার জীর্ণসংস্কার করিয়া থাকেন। ইহার সমুদয় আড্ডা কোনো স্থানে অল্প এবং কোনো স্থানে বা অধিক লোকালয়ে পূর্ণ—কেবলমাত্র আলিয়াবাদসরাই নামক আড্ডা বনহাল পথের বিলাওৎ স্থানের ন্যায় অতি নিভৃত ও জনশূন্য পর্ব্বতপ্রান্তে স্থিত। এই পথেও সৃষ্টির শোভা অতি বিচিত্র ও মনোমোহন।

এই পথে পর্ব্বত অপেক্ষা নদীই অধিক অতিক্রম করিতে হয় এবং প্রতি আড্ডাতে এক নদী অনেকবার—এমন কি, আট হইতে আটাইশবার পর্য্যন্তও পার হইতে হয়! পাক্ষিকগতিতে ভিম্বর হইতে শ্রীনগর ৮৬ মাইল। কিন্তু পার্ব্বত্যপথের কুটিলতানিবন্ধন ইহাদিগের পরস্পর দূরতা ১৪৮ মাইল অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে।

পীর পঞ্জাল সমুদ্রতল হইতে ১১,৪০০ ফিট উচ্চ। কার্ত্তিক মাসের শেষে ইহাতে নীহারপাত আরম্ভ হইয়া ক্রমে এত অধিক পড়ে. যে, তৎসমুদয় বৈশাখমাসের শেষ ভিন্ন দ্রবীভূত, পরিষ্কৃত এবং গতায়াতের উপযুক্ত হয় না।

লাহোর বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে আসিতে হইলে এই পথ অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে যুক্তিযুক্ত। লাহোর হইতে গুজরাৎ ৭০ মাইল এবং ডাকগাড়ী দ্বারা প্রায় ১২ ঘণ্টার পথ। গুজরাৎ হইতে ভিম্বর ন্যূনাধিক ২৮ মাইল দূরবর্ত্তী এবং পালকীডাক দ্বারা ৮ বা ১০ ঘণ্টায় উপনীত হওয়া যায়।

ভিম্বর পর্য্যন্ত পথ সমভূমির উপর দিয়া গিয়াছে। পরে উহা অতিক্রম পূর্ব্বক অপরাপর পার্ব্বত্য পথের ন্যায় দুর্গম ও কুটিল। ভিম্বর উত্তম জনপদ এবং কাশ্মীরাধিপতির রাজ্যের অন্তর্গত। ইহা ভিম্বর নাম্নী নদীর দক্ষিণতটে স্থিত এবং উত্তর পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভাগে অনুন্নত এবং নিবিড় তরুরাজি সমন্বিত গিরিমালা দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহার মধ্যস্থলে মোগল সম্রাট-দিগের নির্ম্মিত পান্থশালা এবং মহারাজা গোলাপ সিংহের ভ্রাতা মহারাজা ধ্যান সিংহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে। পর্য্যটকদিগের আবাসগৃহ দুইটী এবং তাহা উত্তম প্রস্তরে রচিত।

১। ভিম্বর হইতে সৈদাবাদ—১৫ মাইল।

ভিম্বর অতিক্রম করিয়া নদী পার হইতে হয়। ইহা গভীর নহে এবং বালুকাপূর্ণ। সুতরাং ইহার উপরে কোনো সেতু না থাকিলেও গতায়াতের কষ্ট নাই। অনন্তর কতিপয় ক্ষেত্রের উপর দিয়া গিয়া পুনরায় উক্ত নদীগর্ভে পড়িতে

হয়। কিন্তু উহা এস্থলে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরময় বলিয়া অতি বিরক্তিজনক। উহাকে অষ্টবার পার হইয়া বাম দিকে গমন করতঃ এক সংকীর্ণ ও উত্তম উপত্যকায় প্রবেশ করিতে হয়। সেস্থলে এক ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী প্রবাহিত হইতেছে। তাহাকেও ন্যূনাধিক দশবার অতিক্রম না করিলে আদিঢক পর্ব্বতের উচ্চদেশে উপস্থিত হওয়া যায় না। এই পথে এই পর্ব্বতই হিমাচলের আদ্য সোপান বলিয়া ইহার নাম আদিঢক অর্থাৎ প্রথম চড়াই হইয়াছে। ইহা প্রায় ২॥০ মাইল দীর্ঘ। প্রথম আরোহণ সুগম, পরন্তু যত ঊর্দ্ধে উঠা যায়, ততই সরল-উচ্চ, কুটিল এবং দুর্গম। স্থানে স্থানে বালুকাময় এবং কোনো কোনো স্থানে এমন চিক্কণ ও বালুপাষাণ বিশিষ্ট, যে, পদ স্থির থাকে না। ইহার গাত্রে কতিপয় পাইন* এবং অপরাপর মহীরুহ আছে। ইহার শিখরে জগাৎ অর্থাৎ বাণিজ্য দ্রব্যের শুল্ক আদায় গৃহ এবং কয়েকটী কুটীর আছে। এস্থান হইতে সৃষ্টির শোভা অতি রমণীয় দেখায়। ইহার উতরাই প্রায় এক মাইল দীর্ঘ, অতি কুটিল এবং স্থানে স্থানে অতি সংকীর্ণ ও দুর্গম। গিরিতল হইতে সৈদাবাদ প্রায় চারি মাইল। পথ আদৌ উচ্চ ও কর্ষিত ভূমির উপর দিয়া এক বৃহৎ নির্ঝরিণীর দক্ষিণ তটে গিয়া পড়িয়াছে। এস্থলে নদীগর্ভে কতিপয় গভীর ও প্রচুর মৎস্য বিশিষ্ট জলাশয় আছে। ইহাকে দুইবার অতিক্রম পূর্ব্বক কিয়দ্দূরে যাইয়া বাম ভাগে এক

* ইহাকে এখানে চীড় কহে। কাশ্মীরের সমুদয় পথের সর্ব্বত্র পর্ব্বতগাত্রে ইহা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।

ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী পার হইতে হয়। অনন্তর কিছু দূর ক্ষেত্রের উপর দিয়া গিয়া সৈদাবাদে উপনীত হওয়া যায়।

সৈদাবাদ একটী ক্ষুদ্রপল্লী এবং অতি উর্ব্বরা উপত্যকার মধ্যভাগে ও পার্ব্বত্য নির্ঝরিণীর দক্ষিণতটে স্থিত। এখানকার সরকারী বাংলা দুইটী অতি উত্তম ও প্রস্তর নির্ম্মিত। ইহার নিকটে এক অতি প্রাচীন পান্থশালার ভগ্নাবশেষ আছে এবং ইহার উত্তর পূর্ব্বদিকে অল্পদূরে মোগল সম্রাটদিগের নির্ম্মিত এক অত্যুৎকৃষ্ট হর্ম্ম্য আছে। ইহাকে সামানি সরাই কহে।

২। সৈদাবাদ হইতে নাওশেরা—১২॥০ মাইল।

সৈদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বোক্ত নদীতীর দিয়া অল্প দূর যাইতে হয়। পরে ঐ নদী অনেকবার পার হইয়া পথটী বক্রগতিতে ক্ষেত্রের উপর দিয়া গিয়াছে এবং কতিপয় নিম্ন পাহাড় অতিক্রম পূর্ব্বক কামানগোশী নামক পাহাড়ের তল-দেশ স্পর্শ করিয়াছে। এই পাহাড় সৈদাবাদ হইতে প্রায় ৫ মাইল দূরবর্ত্তী। ইহা পূর্ব্বোক্ত আদিঢকের ন্যায় উচ্চ ও দুর্গম নহে। ইহার চড়াই প্রায় এক মাইল। ইহারও শিখর হইতে নৈসর্গিক শোভা দর্শনে অনির্ব্বচনীয় প্রীতির উদয় হয়। এস্থলে গুজ্জর অর্থাৎ গোপদিগের কতিপয় কুটীর আছে। চড়াই অপেক্ষা উতরাই অতি দীর্ঘ। কিন্তু ইহা অতি সুগম—কেবল স্থানে স্থানে অসারল্য ও কাঠিন্য সহ্য করিতে হয়। এই পাহা-ড়ের মূলদেশ হইতে প্রায় তিন মাইল সমতল ভূমির উপর দিয়া গিয়া নাওশেরা আড্ডাতে উপস্থিত হওয়া যায়।

নাওশেরা প্রস্তর নির্ম্মিত বৃহৎ জনপদ। যে তাবী নদী

জম্বু নগরীর পার্শ্বদেশ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, ইহা সেই নদীর তটে প্রায় ৩০০ ফিট দূরে স্থিত। এই নগরের মধ্যভাগে মোগলদিগের নির্ম্মিত এক অত্যুত্তম সরাই আছে। কিন্তু জীর্ণ-সংস্কারাভাবে উহা ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে। মহারাজার প্রধান কর্ম্মচারী ইহাতে বাস করেন। এখানেও পর্য্যটকদিগের দুইটী উত্তম বিশ্রামগৃহ আছে। উহা নগর হইতে কিয়দ্দূরে বাউলীবাগ নামক বৃহৎ উপবনে স্থিত।

৩। নাওশেরা হইতে চংগস—১৩া০ মাইল।

নাওশেরা হইতে আরম্ভ হইয়া চংগস পর্য্যন্ত তাবী নদীর গর্ত্ত দিয়া যাইতে হয়। এস্থলে দুই পথ আছে। প্রথম পথ নদীগর্ভ দিয়া গিয়াছে, সুতরাং বৃহৎ বৃহৎ পাষাণ বিশিষ্ট বলিয়া অতি ক্লেশকর। কিন্তু ইহা দ্বিতীয়াপেক্ষা অনেক হ্রস্ব; এক্কারণ ভারবাহক ও পদব্রাজকগণ ইহা দ্বারা গমনাগমন করিয়া থাকে। দ্বিতীয় পথ (ইহাকে উপরিভাগস্থ পথ বা তীর-বর্ত্ম বলাই সঙ্গত) উক্ত নদীর দক্ষিণ তট দিয়া গিয়াছে—কেবল কোনো কোনো অংশ নদী হইতে কিঞ্চিৎ দূর। ইহা ঝাঁপান ও অশ্ব পক্ষে সম্যক উপযোগী। প্রথমাপেক্ষা ইহা অতি দীর্ঘ। নাওশেরা পরিত্যাগ করিয়া এই পথ দিয়া কিয়দ্দূর আসিয়া এক ক্ষুদ্র গিরিশৃঙ্গ অতিক্রম করিতে হয়। উহার আনুমানিক উচ্চতা ১০০ ফিট। অনন্তর একাদিক্রমে এই রূপ প্রায় দশটী শৃঙ্গ পার হইয়া আসিতে হয়। এখানকার পথ স্থানে স্থানে অতি দুর্গম। কিন্তু বাহ্য জগতের শোভা অতি বিচিত্র। চংগসের সমীপবর্ত্তী স্থানে দুইটী প্রাচীন

উৎকৃষ্ট হর্ম্ম্যের অবশিষ্টাংশ আছে। উহা মোগল সম্রাট-দিগের কৃত হইবে।

চংগস প্রশস্ত অধিত্যকায় স্থিত এবং কতিপয় কুটীর বিশিষ্ট ক্ষুদ্র পল্লী। ইহার দুই শত ফিট দূরে তাবী নদী প্রবাহিত হইতেছে। ভ্রমণকারীদিগের দুইটী উত্তম আবাসগৃহ আছে এবং তৎপশ্চাতে মোগলদিগের নির্ম্মিত একটী প্রাচীন পান্থশালা ভগ্নাবস্থায় রহিয়াছে। নিম্নদেশে তাবী নদী ভীষণ-নিনাদে ধাবিত, চারি দিকে অভেদ্য পর্ব্বতমালা সুদৃঢ় প্রাকারের ন্যায় দণ্ডায়মান, এবং ন্যূনাধিক ৬০ মাইল দূরবর্ত্তী পীর-শৈল শুভ্রবেশে নয়নপথে পতিত হইতেছে—ইত্যাকার মনোহর নৈসর্গিক শোভা দর্শনে মন উল্লাসিত হয়।

৪। চংগস হইতে রাজোড়ী—১২ মাইল।

পূর্ব্বোক্ত পথের ন্যায় ইহাও তাবীনদীর গর্ভবাহী এবং দুই ভাগে বিভক্ত। নিম্ন অর্থাৎ নদীগর্ভস্থ পথ পূর্ব্বের ন্যায় কেবল পদব্রজে ভ্রমণের উপযোগী। দ্বিতীয় অর্থাৎ পুলিন-বর্ত্ম (যাহা ঝাঁপান ও অশ্বদিগের পক্ষে সুগম) উক্ত নদীর দক্ষিণ তট দিয়া গিয়া ন্যূনাধিক আটটী অনুন্নত গিরিশৃঙ্গ অতিক্রম করিয়াছে। ইহার স্থানে স্থানে পথ অসরল এবং শ্লেটপ্রস্তরবিশিষ্ট চিক্কণ। চংগস হইতে ৬ মাইল দূরে কল্লর নামে এক ক্ষুদ্র পল্লী আছে। উহার প্রায় তিন মাইল দূরে আর একটী ক্ষুদ্র জনপদ। তাহার নাম মোরদপুর। এস্থলে দুই পুরাতন পান্থশালা আছে। রাজোড়ী হইতে ন্যূনাধিক অর্দ্ধ মাইল দূরে তাবীনদী পার হইতে হয়। এস্থলে কোনো সেতু নাই। সুতরাং নদীর জল ও জল-বেগ বৃদ্ধি

হইলে উহার দক্ষিণ তট পরিত্যাগ না করিয়া ক্রমশঃ গমন পূর্ব্বক নগরে প্রবেশ করা পরামর্শসিদ্ধ।

রাজোড়ী (ইহাকে রাজপুরও কহিয়া থাকে) প্রস্তর-নির্ম্মিত, বর্দ্ধিষ্ণু ও বিশিষ্ট জনপদ। ইহা তাবী নদীর দক্ষিণতটে এবং কতিপয় অনুন্নত পাহাড়ের পার্শ্বদেশে স্থিত। সুতরাং ইহা দূর হইতে দেখিতে অতি সুন্দর। এস্থলে আলম্‌নোট অর্থাৎ পূর্ব্বতন মুসলমান অধিপতিদিগের গোরস্থান, আমখাস মোসাফেরখানা অর্থাৎ পান্থশালা, রাজবাটী, মন্দির, বাজার প্রভৃতি কয়েকটী দ্রষ্টব্য স্থান আছে। রাজোড়ীর পূর্ব্বভাগে এক দিবসের পথে দুইটী গন্ধকমিশ্রিত উষ্ণ প্রস্রবণ দৃষ্ট হয়।

নগরের বিপরীত ভাগে ও তাবীর বাম তটে পর্য্যটকদিগের উত্তম বিশ্রামভবন আছে। ইহা উপবন মধ্যে স্থিত। মোগল সম্রাটদিগের অধিকার কালে ইহা অতি রমণীয় ছিল, কিন্তু এক্ষণে জীর্ণ-সংস্কারাভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে। ইহার সম্মুখস্থ সমতলভূমি সুবিস্তৃত, কৃষিজাত পূর্ণ এবং নৈসর্গিক শোভায় অতি রমণীয়। এস্থলে এক গিরিশৃঙ্গে মহারাজা রণবীর সিংহ প্রস্তরের দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

৫। রাজোড়ী হইতে থন্নামণ্ডী—১৪ মাইল।

এই পথ সর্ব্বাপেক্ষা সুগম ও জলময়। ইহাও তাবী নদীর গর্ভ দিয়া গমন করিয়াছে। অনন্তর যত অগ্রসর হওয়া যায়, ততই দৃষ্ট হয়, যে, নদী ও উপত্যকা সংকীর্ণ হইয়া আসিয়াছে এবং দুই পার্শ্বস্থ গিরিমালা ক্রমশঃ উন্নত হইয়াছে। অবশেষে রতনপীর নামক অত্যুন্নত গিরিশৃঙ্গ সম্মুখে দৃষ্টিগোচর হয়। রামপুর পরিত্যাগ করিয়া প্রায় অর্দ্ধ মাইল

দূরে এক অতি প্রশস্ত নদী পার হইতে হয়। উহা অধিক গভীর নহে, কিন্তু উহার গর্ভস্থ পাষাণ অতি ক্লেশদায়ক। অনন্তর প্রায় অর্দ্ধ মাইল আসিয়া ফতীপুর নামক ক্ষুদ্র পল্লী অতিক্রম করতঃ ন্যূনাধিক দুই মাইল গমন করিলে হরিসিংহের বাউলী (কূপ) নামক স্থানে যাওয়া যায়। এস্থলে কতিপয় দোকান আছে এবং স্থানটী রমণীয়। পরে চারি মাইল দূরে লীড়া বাউলী। এখানে পথ নদী পরিত্যাগ করিয়া দূরে গমন করিয়াছে। কিন্তু থন্নামণ্ডী নামক স্থানের প্রবেশদ্বারে ইহা পুনর্ম্মিলিত হইয়াছে এবং ইহা পার হইয়া উক্ত স্থানে প্রবেশ করিতে হয়।

থন্নামণ্ডী প্রস্তর নির্ম্মিত ক্ষুদ্র পল্লী। ইহা তাবীনদীর বাম তটে স্থিত এবং পঞ্জাব হইতে যে সমুদয় দ্রব্য গতায়াত করে, ইহা তৎসমুদয়ের সংগ্রহ স্থান (ডিপো)। নদীর দক্ষিণ তটে দ্বিতল বিশ্রাম গৃহ আছে। কিন্তু তন্নিম্নতল বাসযোগ্য নহে।

৬। থন্নামণ্ডী হইতে বরমগোলা—১০॥০ মাইল।

এই পথে রতনপীর শৃঙ্গ অতিক্রম করিতে হয়। থন্নামণ্ডী হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে বাম ভাগে পুঞ্চপথ গমন করিয়াছে। এস্থান হইতে অজানাবাদ পল্লী পর্য্যন্ত তাবী নদীকে অনেক বার পার হইতে হয়। অনন্তর রতনপীর পর্ব্বতে আরোহণ করা আবশ্যক। ইহাতে আরোহণ অতি সুগম। ইহার শৃঙ্গ ৮,২০০ ফীট উচ্চ এবং থন্নামণ্ডী হইতে ৫ মাইল দূরবর্ত্তী। শিখরদেশে কতিপয় কুটীর আছে এবং এস্থান হইতে প্রকৃতির শোভা কি পরম রমণীয়! অব-

রোহণ অপেক্ষাকৃত দুর্গম। বিশেষতঃ তলদেশের সমীপবর্ত্তী যে স্থলে কাষ্ঠ-নির্ম্মিত সেতু দ্বারা এক প্রণালী অতিক্রম করিতে হয়, তথায় পথ অত্যন্ত দুরূহ।

বরমগোলা ক্ষুদ্র পল্লী এবং পুঞ্চাধিপতি রাজা মতি সিংহের রাজ্যের অন্তর্গত। ইহা ক্ষুদ্র ও উচ্চ অধিত্যকায় স্থিত এবং অত্যুচ্চ পর্ব্বতমালায় বেষ্টিত। ইহার পার্শ্ব দিয়া সুরন নদী (ইহাকে চিত্রপাণীও কহিয়া থাকে) প্রবাহিত হইতেছে। নদীর অপর তটে একটী অত্যুত্তম প্রস্তর নির্ম্মিত প্রাচীন দুর্গ আছে। এখানকার বিশ্রাম গৃহ কর্দ্দম নির্ম্মিত, কিন্তু নিন্দনীয় নহে। জেহাঙ্গির বাদশাহ কাশ্মীর গমনকালে পক্ষাঘাত রোগে এই স্থানে নশ্বর মানবদেহ পরিত্যাগ করেন। কাশ্মীর তাঁহার প্রিয়বাস ছিল। তিনি তথায় ত্রয়োদশ গ্রীষ্ম অনির্ব্বচনীয় ইন্দ্রিয়সুখে অতিবাহিত করেন। মৃত্যু-কাল উপস্থিত হইলে তিনি এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে, যেন জীবদ্দশায় তাঁহার প্রিয়তম ক্রীড়া উপবন বৈরনাগে উপনীত হইতে পারেন। অথবা, যদি কৃতান্ত তাহা একান্তই হইতে না দেয়, তবে অন্ততঃ তাঁহার দেহ যেন তথায় সমাধিস্থ করা হয়। কিন্তু তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার প্রাণাধিকা প্রিয়তমা বেগম নূরমহল তাঁহার কলেবর লাহোরের বিপরীত ভাগস্থ ও রাবী নদীর তটস্থ সাদেরা নামক স্থানে লইয়া যান এবং তথায় তাঁহার স্মারণার্থিক অতি মনোরম কবর-নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তৎরক্ষক রূপে আপনিও অবিচ্ছেদে তথায় বিংশতি বৎসর বাস করতঃ সেই স্থানেই প্রাণত্যাগ করেন। উক্ত সাদেরা অতি রমণীয় দ্রষ্টব্য স্থান।

৭। বরমগোলা হইতে পোশিয়ানা—৮ মাইল।

বরমগোলা পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক সুগম চড়াই অতিক্রম করা আবশ্যক। উহা প্রায় এক শত হস্ত উচ্চ। অনন্তর চিত্রপাণী নদীর গর্ভে অবতরণ করিতে হয়। এস্থলে এক ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, তাহার নাম চুন্নীমার। প্রায় পাঁচ মাইল পর্য্যন্ত ঐ নদীগর্ভ দিয়া গমন করিতে হয়। এই নদী অতি গভীর ও প্রশস্ত নহে। কিন্তু ইহার গর্ভ বৃহৎ বৃহৎ পাষাণে পরিপূর্ণ এবং বর্ষাকালে ইহার বেগ অতিশয় ভয়ানক হইয়া থাকে। ইহার উভয় পার্শ্বে গগনস্পর্শী গিরিমালা দণ্ডায়মান আছে। তাহাদিগের শিখরদেশে পার্ব্বত্যলোকদিগের যে সমুদয় কুটীর ও কৃষিকর্ম্মোপযোগী ক্ষেত্র আছে, তাহা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। নদী-গর্ভে যাইতে যাইতে পর্ব্বতমালা এরূপ দৃষ্টিরোধ করে, যে, বোধ হয়, আর বুঝি পুরোবর্ত্তী হইতে পারিলাম না। এই নদী এরূপ বক্র গতিতে গমন করিয়াছে, যে, একাদিক্রমে বার বার বহু সেতু দ্বারা পার হইয়া কখনো ইহার বাম তটে, কখনো বা দক্ষিণ তট দিয়া কুণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করিতে হয়! সন ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আমরা উহাকে এই রূপে দ্বাবিংশতি বার অতিক্রম করি এবং অনেক সেতু প্রবল স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে, তাহার নিদর্শনও দেখিতে পাই। ডাক্তার ইন্স সাহেব সন ১৮৬৪ এবং ৬৫ খৃষ্টাব্দে এরূপ অষ্টবিংশতি বার পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। এ সমুদয় সেতু এরূপ নিকৃষ্ট, যে, পদভরে দুলিতে থাকে। সুতরাং অনন্যগতি অবস্থায় উহাদের উপর দিয়া যাইতে প্রাণ কাঁপিয়া উঠে।

পোশিয়ানা হইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ নিকটে নদী পরিত্যাগ করিয়া এক চড়াই চড়িতে হয়। ইহার প্রথমার্দ্ধ অতি বন্ধুর, কিন্তু শেষার্দ্ধ অপেক্ষাকৃত সুগম।

এই পথে কতিপয় অতি সুন্দর জলপ্রপাত ও শস্য পেষণ করিবার জলযন্ত্র আছে। ঋতুর অবস্থানুসারে জলপ্রপাতের সংখ্যা ও সৌন্দর্য্যের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ন্যূনাধিক পঞ্চাশ হস্ত ঊর্দ্ধ হইতে দুগ্ধফেণনিভ জল বিচিত্রাকারে পতিত হইয়া যেরূপ রমণীয় দৃশ্য দেখায়, তাহা প্রকাশ করিবার শব্দ নাই। সর্ব্বাপেক্ষা তিনটী অতি মনোহর। প্রথমটী বরমগোলা পরিত্যাগ করিয়া নদী-গর্ভে প্রবেশস্থলে। ইহাকে নূরী-চশম অর্থাৎ আলোকময় জলপ্রপাত কহে। দ্বিতীয়টী নদী-গর্ভের মধ্য পথে এবং নদীর বাম তটে। তৃতীয়টী নদীগর্ভের পথপ্রান্তে এবং নদীর দক্ষিণ তটে।

পোশিয়ানা অতি ক্ষুদ্র পল্লী এবং পর্ব্বতের গাত্রে স্থিত। এখানকার বিশ্রাম-ভবন উপাদেয় নহে।

৮। পোশিয়ানা হইতে আলিয়াবাদ সরাই—১১ মাইল।

এই বারে বিখ্যাত পীর পঞ্জাল শৃঙ্গ অতিক্রম করিতে হইবে। পোশিয়ানা ত্যাগ করিয়া কিয়দ্দূর পর্ব্বতের গাত্র দিয়া অসরল উতরাই দ্বারা অবতরণ করিতে হয়। অনন্তর চিত্রপাণী নদীকে আর একবার পার হইয়া এক সংকীর্ণ উপত্যকায় উপনীত হওয়া যায়। ইহা অতিক্রম করিলেই পীর পঞ্জালের তলদেশে পাদবিক্ষেপ করিতে হয়। পীর, সমুদ্র তল হইতে ১১,৪০০ ফীট উচ্চ। ইহার গাত্রে সর্পাকৃতি পথ পড়িয়া আছে, দূর হইতে দেখিলে যেরূপ দুরারোহ বলিয়া

হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, প্রত্যুত উহা সেরূপ দুর্গম নহে। ইহার স্থানে স্থানে প্রস্তর নির্ম্মিত গৃহাদির ভগ্নাবশেষ আছে। প্রবল ঝটিকা ও বৃষ্টিপতন কালে নিরাশ্রয় পথিকদিগের আশ্রয় জন্য মোগল সম্রাটেরা উহা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। গিরিশিখরে উঠিতে প্রায় তিন ঘণ্টা লাগে। বন্‌হাল পথের পীর পাহাড় আরোহণ কালে পর্য্যটকদিগকে যে উপদেশ দেওয়া গিয়াছে এবং নীহার পথের বর্ণনা করা হইয়াছে, তৎসমুদয় এস্থলে প্রয়োগশীল। * এ স্থান হইতেও সৃষ্টির শোভা অতি বিচিত্র দেখায়। আকাশ নির্ম্মল থাকিলে প্রায় ১৩০ মাইল দূরবর্ত্তী ল্যাহোর নগরের অত্যুচ্চ মীনার অর্থাৎ দুর্গ প্রভৃতির সৌধশিখর দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বন্‌হালের পীর শৃঙ্গের উপর উঠিলে সম্মুখে সমতল ভূমি দেখিয়া পাহাড় ভাঙ্গা শেষ হইল বলিয়া এবং কাশ্মীর প্রদেশের সৌন্দর্য্যসমষ্টি এককালে নয়ন পথে পতিত ভাবিয়া মনে যেরূপ অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হইয়া থাকে, এস্থলে সেরূপ হয় না। এখানে অনন্ত পর্ব্বত-মালা দৃষ্টিরোধ পূর্ব্বক অধিকতর ভয় প্রদর্শনই করিয়া থাকে। শিখরদেশ হইতে প্রায় পাঁচ মাইল যাইলে আলিয়াবাদ সরাইতে উপনীত হওয়া যায়। এখানকার পথ অতি সুগম।

আলিয়াবাদ সরাই বাদশাহদিগের দ্বারা নির্ম্মিত। এক্ষণে ইহার ভগ্নাবশেষমাত্র আছে। ইহা পর্ব্বত পরিবেষ্টিত অতি নিভৃত প্রদেশে স্থিত। শীতকালে ইহা তুষারে প্রোথিত হইয়া

* ২৮ পৃষ্ঠা দেখ।

যায়। এস্থলে দুই একখানি সামান্য দোকান ব্যতীত আর কিছুই নাই।

৯। আলিয়াবাদ সরাই হইতে হীরপুর—১২ মাইল।

এই পথ সুগম। ইহার প্রথমার্দ্ধ সুগম আরোহণ ও অবরোহণ বিশিষ্ট এবং পথটী পর্ব্বতের গাত্র (তল ও শিরোদেশের মধ্য ভাগ) দিয়া গমন করিয়াছে। ইহার দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া সহস্র সহস্র হস্ত নীচে রেমবিয়ারা নাম্নী নদী ভীষণ বেগে প্রবাহিতা হইতেছে। এই অংশের কোনো কোনো স্থল অসরল। কিন্তু উহার একটীও অত্যুচ্চ এবং দুর্গম নহে। এই পথের অপরার্দ্ধ উক্ত নদীতট দিয়া গমন করিয়াছে এবং অতি সুগম।

যে পথ আলিয়াবাদ সরাই হইতে প্রায় দুই মাইল পর্য্যন্ত পর্ব্বতের ভীষণ পার্শ্ব দিয়া গমন করিয়াছে, সেই পথ হইতে নিম্নদিকে দৃষ্টিপাত করিলে মস্তক ঘুরিতে থাকে এবং পর্য্যটকদিগের পদস্খলিত হইলে ঘোর হৃদয়-বিদারক বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা; তন্নিরাকরণ জন্য তথায় প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহাকে "লাল গোলাম" কহে। পূর্ব্বে যৎকালে এই স্থানেএই প্রাচীর নির্ম্মিত হয় নাই, তখন যে সমুদয় বিপদপাৎ হইয়া গিয়াছে, তাহা শুনিলে অদ্যাপি হৃৎকম্প হয়। অজ্ঞ লোকে সেই সকল দুর্ঘটনার একটী অপদৈব কারণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক কহিয়া থাকে, যে, পূর্ব্বে এই স্থানে লাল গোলাম নামে এক নরমাংসলোলুপ দৈত্য বাস করিত। সে পথিকদিগকে নীচে ফেলিয়া দিত এবং প্রাণসংহার পূর্ব্বক এবং তাহাদিগের মৃতদেহে আপন উদর পূর্ত্তি করিত! এ স্থান হইতে প্রায় এক

মাইল দূরে এক মানমন্দির অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক বা জ্যোতিষিক উচ্চস্তম্ভ আছে। কিয়দ্দূরে গমন করিয়া দক্ষিণপার্শ্বে ও নদীর অপর তটে সাহকোট নামে এক প্রাচীন দুর্গ দেখিতে পাওয়া যায়। অনন্তর এক অসরল পথ দিয়া সুক সরাই নামক এক ভগ্নহর্ম্ম্যে উত্তীর্ণ হইতে হয়। এস্থান হইতে হীরপুর ন্যূনাধিক পাঁচ মাইল এবং তদন্তর্রেম্বিয়ারা নদী গর্ভ দিয়া গমন করিয়াছে। তিনটী অতি সামান্য কাষ্ঠ-নির্ম্মিত সেতু দ্বারা এই নদী তিন বার অতিক্রম করিতে হয়। এখানকার পথ অতি সুগম।

হীরপুর রেম্বিয়ারা নদীর দক্ষিণ তটে স্থিত এবং একটী ক্ষুদ্র পল্লী মাত্র। এখানকার বিশ্রাম ভবন মোগলসম্রাটদিগের নির্ম্মিত মনোহর হর্ম্ম্যের ভগ্নাবশেষ মাত্র।

১০। হীরপুর হইতে শোপিয়ান—৮ মাইল।

এই পথ যেমন অনতিদীর্ঘ, তেমনি সুগম। ইহা প্রায় পূর্ব্বোক্ত রেমবিয়ারা নদীর দক্ষিণ তট দিয়াই গিয়াছে। হীরপুর হইতে কিয়দ্দূর গমন করিলেই কাশ্মীর এবং উহার উত্তর প্রান্তস্থ তুসার মণ্ডিত অত্যুচ্চ পর্ব্বত-মালা নয়ন পথে পতিত হইয়া অতুল আনন্দ উৎপাদন করে।

শোপিয়ান একটী বিশিষ্ট জনপদ। এস্থানে দুইটী উত্তম বিশ্রাম ভবন আছে। পরন্তু এস্থলে বিশ্রাম না করিয়া এক দিবসে হীরপুর হইতে রামু অনায়াসে যাইতে পারা যায়।

১১। শোপিয়ান হইতে রামু—১১ মাইল।

এই পথও অতি সুগম। শোপিয়ান পরিত্যাগ করিয়া প্রায় তিন মাইল আসিলে উক্ত রেমবিয়ারা নদী পুনর্ব্বার পার

হওয়া আবশ্যক। অনন্তর কিয়দ্দূর আসিয়া ঘন তরুরাজী সমন্বিত কতিপয় গিরিমালার তলদেশে নামিয়া এক পুরাতন জিয়ারৎ অর্থাৎ গোরস্থান পাওয়া যায় এবং এক প্রাচীন পান্থ-শালা অতিক্রম করিয়া এক জঙ্গলের মধ্য দিয়া গমন করিতে হয়। এস্থান হইতে প্রায় দুই মাইল পরে রামচ নামে এক ক্ষুদ্র নদী পার হইয়া কিয়দ্দূর আসিয়া এক প্রাচীন ধর্ম্মশালা অর্থাৎ পান্থ-শালা দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে পর্য্যটক-দিগের উপযোগী এক গৃহ আছে। তথা হইতে রামস্থ প্রায় অর্দ্ধ মাইল।

রামস্থ ক্ষুদ্র জনপদ। এখানকার বিশ্রাম গৃহ দ্বিতল, কাষ্ঠ-নির্ম্মিত এবং উত্তম।

১১। রামু হইতে শ্রীনগর—১৮ মাইল।

এই পথ সর্ব্বাপেক্ষা সুগম্য এবং ইহা সমতল ভূমির উপর দিয়া গিয়াছে। রামু হইতে ন্যূনাধিক ৬ মাইল আসিয়া খানপুর নামে এক পল্লী। এস্থানে এক প্রাচীন পান্থশালা আছে। ইহা হইতে প্রায় ৫ মাইল দূরে ওয়াতর নামে অপর এক পল্লী। তথায় পশমের অত্যুত্তম মোজা ও দস্তানা প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। সেস্থান হইতে শ্রীনগর-ন্যূনাধিক ৭ মাইল। পথ প্রায় ৮ হস্ত প্রশস্ত এবং ইহার উভয় পার্শ্বে সরলোচ্চ সফেদাশ্রেণী থাকাতে অতি রমণীয়।

শ্রীনগরের প্রবেশ দ্বারে এবং পথের বাম ভাগে রামবাগ নামে এক উপবন। এখানে প্রাচীর পরিবেষ্টিত মন্দিরে মহারাজা গোলাপ সিংহের ভস্ম রক্ষিত আছে। তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইলে এই স্থানে তাঁহার দাহ হইয়াছিল

এবং সেই অবধি রাজবাটীর কাহারো মৃত্যু হইলে এই স্থানেই দাহকার্য্য সমাধা করা হয়। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রের প্রধানা মহিষী বসন্তরোগে প্রাণত্যাগ করিলে তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া এই স্থানেই হইয়াছিল। ইহার পার্শ্ব দিয়া বিতস্তা নদীর এক শাখা (দুধ গঙ্গা) প্রবাহিতা হইতেছে। কিয়দ্দূরে আসিয়া দক্ষিণ ভাগে মহারাজার বোটানিকেল গার্ডেন্ অর্থাৎ কৃষি উদ্ভিজ্জ-সম্বন্ধীয় উপবন। বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রযত্নে ইহা স্থাপিত হইয়াছে এবং দিন দিন ইহার উন্নতি হইতেছে। যে রেসমের উন্নতির জন্য উক্ত বাবুজীর নাম জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে এবং যাহার ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধিতে কাশ্মীরীদিগের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হওনের সম্ভাবনা, সেই রেসমের কারখানা (এই কারখানাকে হপ্ত-চেনার কহে) উক্ত উপবনের বিপরীত ভাগে অর্থাৎ পথের বামভাগে স্থিত। ইহা অতিক্রম পূর্ব্বক সম্মুখস্থ যে ঘন দূর্ব্বাদল পূরিত ক্ষেত্রের উপর দিয়া গমন করিতে হয়, উহাকে “ছোটা প্যারেড্” অর্থাৎ ক্ষুদ্র-সৈন্য-প্রদর্শন-ক্ষেত্র কহে। ইহার বাম ভাগ দিয়া যে পথ গিয়াছে, তদ্দ্বারা গমন করিলে সেরগড়ী অর্থাৎ রাজবাটীতে উপনীত হওয়া যায়। ইহার দক্ষিণ পার্শ্বে যে উপবন আছে, তাহার নাম হুজুরিবাগ। ইহার সন্নিকটস্থ নদীতটে সরকারী ঔষধালয় স্থাপিত আছে। এই ক্ষেত্র পার হইয়া কিয়দ্দূর গমন করিলে মীরাকদল দেখিতে পাওয়া যায়। পর্য্যটক কাশ্মীরে প্রবেশ করিয়া স্বেচ্ছামতে ইহা অবলম্বন করিতে পারেন।

কাশ্মীর-কুসুম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কাশ্মীর শব্দের উৎপত্তি। খ্যাতি ও প্রাচীনত্ব। সীমা। বিস্তার। লোক-সংখ্যা। পর্ব্বত। জল ও স্থল। নদী। সেতু। নৌকা। হ্রদ। উৎস। ঋতুপরিবর্ত্তন। জলবায়ু। উৎপত্তি—কৃষি, পশু ও পক্ষী। ধাতু। বাসগৃহ। নিবাসী—চরিত্র, পরিচ্ছদ, খাদ্য। শিল্পকৌশল। ভাষা। শিক্ষা। ধর্ম্ম। শাসনপ্রণালী।

[কাশ্মীর শব্দের উৎপত্তি] কাশ্মীর শব্দের উৎপত্তি ও ব্যুৎপত্তি বিষয়ে অনেকে অনেকপ্রকার কল্পনা করিয়া থাকেন। কিন্তু সুবিখ্যাত প্রফেসর উইল্‌সন্ সাহেব যাহা স্থিরীকৃত করিয়াছেন, তাহাই প্রামাণিক এবং বিচারসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়; অর্থাৎ এস্থলে ভগবান কশ্যপমুনির আশ্রম ছিল বলিয়া ইহা কাশ্মীর নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

[খ্যাতি ও প্রাচীনত্ব] যৎকালে দক্ষযজ্ঞে পতিনিন্দা শ্রবণে সতী দেহত্যাগ করেন এবং ধূর্জ্জটি সেই মৃতদেহ শিরোদেশে ধারণপূর্ব্বক উদাসীনবেশে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিলে চক্রপাণি সুদর্শন চক্র দ্বারা উহা খণ্ড খণ্ড কাটিয়া ফেলেন, তৎকালে তাঁহার কণ্ঠদেশ কাশ্মীরের এক স্থলে পতিত হয়; সেই স্থল কোন্‌টী তাহার স্থিরতা নাই। এ কারণ সমুদায় উপত্যকাকে সারদাপীঠ কহিয়া থাকে। পাশ্চাত্য বিভাগস্থ সোপুর নামক স্থানে সারদাদেবীর প্রতিমূর্ত্তি আছে এবং কাশ্মীরী অক্ষরকে সারদা অক্ষর কহে।

যৎকালে খ্যাত্যাপন্ন পাণ্ডবেরা ভারতবর্ষের উত্তর খণ্ড পরিভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা এই স্থলে কিয়ৎকাল বাস করিয়া যে সমুদায় কীর্ত্তিকলাপ স্থাপন করেন, অদ্যাপি তাহার অনেক ভগ্নাবশেষ আছে এবং কোনো কোনো স্থানে তাঁহাদিগের নির্ম্মিত দেবালয় অবিনশ্বর রূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কোনো কোনো ভূতত্ত্ব-বেত্তা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, যে, কাশ্মীর মনুষ্যের আদিম স্থান ছিল এবং এই স্থান হইতেই মনুষ্য-স্রোত প্রবাহিত হইয়া পৃথিবীর অপরাপর অংশে প্লাবিত হয়। প্রত্যুত, অতি প্রাচীন কালাবধি যে ইহা মনুষ্যের বাসস্থান হইয়া আসিতেছে, তাহার কোনো সন্দেহ নাই। পরন্তু ইহা বাসোপযোগী হইবার পূর্ব্বে যে এককালে জলগর্ব্ভে নিমগ্ন ছিল, তাহারও সহস্র সহস্র নিদর্শন পাওয়া যায়।

কাশ্মীর প্রদেশের চতুঃপার্শ্ব-বেষ্টিত শৈলপ্রাকার; বক্রগতি-বিশিষ্ট অনতিবেগবান নদী; উহার অসংখ্য শাখা প্রশাখা; স্থির হ্রদনিচয়; উহাদিগের তটস্থ নন্দনকাননসদৃশ

ক্রীড়া-উপবন; চিত্তবিমোহন তপোবন; চমৎকার প্রস্রবণ; অনুপম নৈসর্গিক শোভা; নির্ম্মল ও স্বাস্থ্যকর জলবায়ু; প্রবল বাত্যার অদর্শন; উর্ব্বরা ভূমি; সুরস ও প্রচুর খাদ্য সামগ্রী প্রভৃতি নানাবিধ সৌন্দর্য্য ও উপাদেয়তা একাধারে সমাবেশ—এই সমস্ত যেমন বিস্ময়কর; তেমনি কি ভূতত্ত্ব-বিৎ, কি রাসায়ণিক, কি প্রাচীন তত্ত্বানুসন্ধায়ী, কি ইতি-হাসবেত্তা, কি পর্য্যটক, কি কবি, কি রসজ্ঞ ভাবুক, কি স্বভাব-চিত্রকর, কি রোগী, কি সুস্থ, কি মৃগয়ানুরাগী, কি ভোগবিলাসী, কি সংসারত্যাগী বিবেকী, কি ধনী, কি নির্দ্ধন, কি আমীর, কি ফকীর, সকল প্রকার ব্যবসায়ী ও অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের পক্ষেই কাশ্মীর যেমন উপাদেয়, বোধ হয়, পৃথি-বীর আর কোনো স্থল তেমন নহে। অপর, এখানকার সর্ব্বত্রেই পুরাকালিক কীর্ত্তিস্তম্ভ বিস্তৃত রহিয়াছে—কোনো কোনোটী অভিনব বলিয়া প্রতীত হইতেছে—কোনো কোনোটী বিনা-শোন্মুখ হইয়াছে—কোনো কোনোটী বা বিনষ্ট হইয়াও কেবল কতিপয় চিহ্ন দ্বারাই আপন প্রাচীন গৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে! ইত্যাকার নানা বিচিত্র ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া মানবজীবনের অনিত্যতা ও মানুষিক বলবীর্য্য ও গর্ব্বের নশ্ব-রত্ব স্পষ্টরূপে অনুভব হইতে থাকে এবং "ধূলার শরীর এই ধূলি হবে শেষ!" এই সনাতন সত্য প্রস্তরাঙ্কিত রেখার ন্যায় হৃদয়ঙ্গম হয়। এই সমুদায় কীর্ত্তিকলাপ দেখিয়া বোধ হয়, মনুষ্য নটবেশে পৃথিবীরূপ নাট্যশালায় দিনকয়েকের জন্য নৃত্য করিয়া চলিয়া যাইতেছে—কোথা হইতে আসিতেছে, আবার কোথায় গিয়াই বা লুক্কায়িত হইতেছে, তাহার নিদ-

র্শনও পাওয়া যায় না! পটোত্তোলন হইতে পট প্রক্ষেপণ পর্য্যন্ত তাঁহাকে হয় সৃজনকর্ত্তা ব্রহ্মা, নয় পালনকর্ত্তা বিষ্ণু, নয় লয়কারী মহেশ্বর বলিয়া প্রতীত হয়!

[সীমা ও বিস্তার] কাশ্মীররাজ্যের উত্তর সীমা হিমালয় পর্ব্বতের অন্তর্গত কারাকোরম পর্ব্বতশ্রেণী ; ইহার পূর্ব্ব সীমা তিব্বৎ ; দক্ষিণ সীমা পঞ্জাবান্তর্গত ঝিলম, গুজরাৎ, সিয়াল-কোট ইত্যাদি এবং এই বিভাগের হজারা ও রাউলপিণ্ডী ইহার পশ্চিম সীমা। ইহার বিস্তার ৩২° ১৭′ হইতে ৩৬° ল্যাটিচিউড্ এবং ৭৩° ২০′ হইতে ৭৯° ৪০′ লংগিচিউড পর্য্যন্ত। ইহা দৈর্ঘ্যে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত ৩৫০ মাইল এবং প্রস্থে প্রায় ২৭০ মাইল। লোকসংখ্যা অনু-মান আট লক্ষ। কাশ্মীর উপত্যকা, জম্বু, লদাঘ্, বাল্তী বা ইস্কার্দু, ভদ্রোয়াড়, কষ্টোয়াড় প্রভৃতি কয়েকটী বিভাগ কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।

[উপত্যকার সীমা, বিস্তার এবং লোকসংখ্যা] কাশ্মীর উপত্যকা অতি বিস্তৃত সমতল ভূমি। ইহার উত্তরে বাল্তী বা ইস্কার্দু প্রভৃতি জিলা। পূর্ব্বভাগে দ্রাস্, লদাঘ্ প্রভৃতি বিভাগ। দক্ষিণে পুঞ্চ, জম্বু, সিয়ালকোট প্রভৃতি এবং পশ্চিমে হজারা ও রাউলপিণ্ডী। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ১০০ এক শত মাইল এবং প্রস্থে গড়ে ২০ মাইল। ইহার আয়তন ৪,০০০ চতুরস্র মাইল। গত বৎসরে বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তা গণনা করিয়া দেখি-য়াছেন, ইহার লোকসংখ্যা চারিলক্ষ। তন্মধ্যে কেবল ৫২,০০০ হিন্দু এবং অবশিষ্ট অর্থাৎ ৩,৪৮,০০০ মুসলমান।

[পর্ব্বত] কাশ্মীর সমুদ্রতল হইতে ৫,৫০০ ফিট উচ্চ।

অভ্রভেদী পীর নাম্নী পর্ব্বতশ্রেণী ইহার চতুঃপার্শ্বে অভেদ্য প্রাকারের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া ইহাকে শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিতেছে। উহার কোনা কোনো শৃঙ্গ আট হাজার হইতে পনর হাজার ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ এবং সম্বৎসর তুষার-মণ্ডিত। একজন সুপ্রসিদ্ধ কবি লিখিয়াছেন ;—

"শৈল প্রাকার বন্ধাদিহ ন পরভয়ং,
যাপি সর্পাদি দংশো, ঘর্ম্মো নৈবাতিঘোরো,
বিরল বিরসত্তা নৈব পানাশনানাম্।
নৈব স্ত্রীণাম্ কঠোরা রতিঃ" ইত্যাদি।

এই শৈল সমুদায়ের তলদেশ হইতে যত ঊর্দ্ধে গমন করা যায়, ততই বিবিধ প্রকার ঋতু এবং তদুপযোগী উদ্ভিজ্জ, শস্য ও ফল মূলাদি দেখিতে পাই। আবার কোনো কোনো স্থলে এক স্থানেই সমুদয়ের একত্র সমাবেশ আছে। অধিকাংশ পর্ব্বতের শিখরদেশ সুবিস্তৃত এবং নানা বর্ণের পুষ্প ও মনোহর তৃণাচ্ছাদিত বলিয়া সাতিশয় রম্য। উহাকে মর্গ অর্থাৎ ক্ষেত্র কহে। উহাদের মধ্যে গুলমর্গ, সোণামর্গ প্রভৃতি কয়েকটী সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এই শিখরভূমিতে নিরীহ পার্ব্বত্যজাতি নির্ভয়ে ও পরম সুখে বাস করে। গো, মেষ, ছাগ ও অশ্ব উহাদের ধনসম্পত্তি। সে ধনে কেহই লোভ করে না এবং তাহারাও সমতলবাসীদিগের ঐশ্বর্য্যের প্রতি লোভাকৃষ্ট দৃষ্টি নিক্ষেপে রত নয়।

[জল ও স্থল] ইহার স্থল অপেক্ষা জলভাগ অধিক। কোনো অত্যুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে দেখিলে বোধ হয়, যেন কাশ্মীর প্রদেশটী জলে ভাসিতেছে। বিতস্তা নদী ইহার মধ্য

দিয়া প্রবাহিত; চারিদিকে উহার কৃত্রিম শাখা বিস্তারিত রহিয়াছে; উলর প্রভৃতি হ্রদ সকল সুবিস্তৃত বিশাল বক্ষঃ উন্নত ভাবে দেখাইতেছে; সফেদা নাম্নী বৃক্ষশ্রেণী গগনস্পর্শ করিবার নিমিত্ত মস্তকোত্তোলন করিয়া আছে; চেনার বৃক্ষ বট বৃক্ষের ন্যায় বাহু বিস্তার পূর্ব্বক নিকটস্থ তরুগণকে আলিঙ্গন করিতেছে; মধ্যে মধ্যে হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্র, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোকালয় এবং মনোহর উপবন দ্বীপপুঞ্জের ন্যায় শোভমান হইতেছে; দেখিতে অতি রমণীয়!

[নদী] বিতস্তা নদী—যাহাকে গ্রীকেরা হাইডাস্‌পিস্‌ নামে খ্যাত করিয়াছে এবং মুসলমানেরা বিহৎ ও ইংরাজেরা ঝিলম কহিয়া থাকে—সেই বিতস্তা কাশ্মীরের পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে উৎপন্ন হইয়া নানা শাখা প্রশাখা ও করদ নদী সমন্বিতা হইয়া উপত্যকার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত গমন করিয়া প্রবাহিতা হইতেছে। ইহার উৎপত্তি স্থান অনেকে অনেক প্রকার কল্পনা করিয়া থাকেন। পরন্তু পূর্ব্বভাগস্থ সুপ্রসিদ্ধ বৈরনাগ নামক উৎসের প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে তিনটী উৎস আছে। এই তিনটী উৎসের পরস্পর দূরতা অঙ্গুষ্ঠের অগ্র ভাগ হইতে তর্জ্জনীর অগ্রভাগ পর্য্যন্ত পরিমিত স্থান। এ কারণ উহাকে বিৎবিথর অথবা বিতস্‌ এবং নির্গত জলস্রোতকে বিতস্তা বা বিহৎ কহিয়া থাকে। ঐ জলধারা যতই নিম্নভাগে আসিয়াছে, ততই বৈরনাগ, অনন্তনাগ, আচ্ছাবল, কুক্কুড়নাগ, কোঁশানাগ প্রভৃতি অতি সুন্দর সুন্দর উৎস হইতে জলপ্রবাহ নির্গত হইয়া উহার অবয়ব বৃদ্ধি করিয়াছে এবং অবশেষে বৃহৎ নদীর আকারে পরিণত হইয়াছে।

বিতস্তা নদী ক্রমাগত উত্তরপূর্ব্ববাহিনী হইয়া উলরহ্রদের মধ্য দিয়া প্রবাহিতা। পরে দক্ষিণবাহিনী হইয়া পশ্চিমপ্রান্তস্থ বারমূলা নামক জনপদ অতিক্রম করিয়া ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে উপত্যকা পরিত্যাগ পূর্ব্বক চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই নদী যতদূর পর্য্যন্ত উপত্যকার মধ্যে আছে, ততদূর সর্ব্বত্রই ইহার মূর্ত্তি অতি শান্ত। ইহাতে কোনোপ্রকার হিংস্র জলজন্তু নাই। শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে প্রায় প্রতি বৎসর ইহার ভয়ঙ্কর জলোচ্ছাস হইয়া দেশের অনেক অনিষ্ট ঘটায়। উহা মধ্যে মধ্যে এমন শোকাবহ ও অনিষ্টকর হয়, যে, যিনি কখনো উহা দেখিয়াছেন, তিনি অনেককাল পর্য্যন্ত ভুলিতে পারিবেন না। তৃতীয় পরিচ্ছেদে এইরূপ একটী ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাসের বিবরণ বর্ণনা করা যাইবে।

বিতস্তা নদী উপত্যকার মধ্যে ব্রিং, লিদ্দর, সিন্দ, পোড়া প্রভৃতি অনেক পার্ব্বত্য নদীর সহিত সংমিলিতা হইয়াছে।

[সেতু] উপত্যকামধ্যস্থ সমগ্র গতিতে ইহার উপর ১৩টী কদল অর্থাৎ সেতু আছে। ইহারা কাষ্ঠনির্ম্মিত। এতন্মধ্যে ৭ টী শ্রীনগরের সীমান্তর্গত। সেতু নির্ম্মাণ করিবার রীতি এই রূপ;—প্রথমে নদীগর্ব্ভে স্থূল ও বৃহৎ বৃহৎ খুঁটী প্রোথিত করিয়া ত্রিকোণ ভূমি বেষ্টন করে। ইহার শিরঃকোণ স্রোতের দিকে রাখে। খুঁটী সমুদায় নদীতল হইতে প্রায় ৬ হস্ত উচ্চ করিয়া থাকে। এইরূপে যে ত্রিকোণ গর্ত্ত হয়, উহার তিন পার্শ্ব তক্তা দিয়া আচ্ছাদন করিয়া বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর দ্বারা গর্ত্ত পূর্ণ করে। ইহাই স্তম্ভের বনিয়াদ অর্থাৎ মূল হইল। পরে দে-দার কাষ্ঠের খুঁটী প্রায় অর্দ্ধ অর্দ্ধ হস্ত দূরে সাজাইয়া দেয় এবং তাহার উপরে

এড়োএড়ি ভাবে আবার খুঁটী স্থাপনা করে। খুঁটীর দুই অন্ত কাষ্ঠের কঠিন কীলক দ্বারা নিম্নভাগস্থ খুটীর অন্তের সহিত আবদ্ধ। নিম্নভাগস্থ স্তবক অপেক্ষা উপরিভাগের স্তবক ক্রমশঃ চৌড়া করা হয়। এইরূপে স্তম্ভ সমুদায় কিছু উচ্চ হইলে বৃহৎ বৃহৎ লম্বা কাষ্ঠ দ্বারা পরস্পরের শিরোদেশ সংযুক্ত করে এবং তদুপরি তক্তা বা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাষ্ঠখণ্ড বিছাইয়া দিলে সেতু প্রস্তুত হইয়া গেল। কোনো কোনো সেতুর উপরিভাগ মৃত্তিকা বা শুষ্ক তৃণ দ্বারা আবৃত এবং পথিকদিগের বিপদ নিবারণার্থ উভয় পার্শ্বে রক্ষণ (রেলিং) আছে।

ডাক্তার ইন্স আপন "কাশ্মীর হ্যাণ্ডবুক" নামক পুস্তকে এই সমুদায় সেতুর যে তালিকা দিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

সংখ্যা	সংজ্ঞা	দীর্ঘ	প্রস্থ	স্তম্ভের সংখ্যা	গড়ে জলের গভীরতা
		গজ	ফিট	•	ফিট
১	খান্‌বল্‌	৬৬	১২	২	৪॥০
২	বিজ্‌বেয়াড়া ...	১০০	১৭	৩	৬
৩	পাম্‌পুর	১৩২	১৪	৪	৬॥০
৪	মীরা কদল ...	১৩৪	২০	৫	
৫	হাবা কদল ...	৯৭	২৩	৩	
৬	ফতে কদল ...	৮৮	১৭	৩	
৭	শ্রীনগর। জ়ানা কদল ...	৯৬	২৪	৩	১৬
৮	আলী কদল...	৮২	১৭	৩	
৯	নয়া কদল ...	৭৫	১৮	৩	
১০	সাফা কদল ...	১১০	১৯	৪	
১১	সম্বল	১১২	১৬	৪	১৫
১২	সোপুর	২১৪	১৬	৩	২৮
১৩	বারমূলা	১৪৬	১৬	৬	২৪

[নৌকা] নৌকাই নাবিকদিগের গৃহ ও বাটী। উহারা ইহাতে দিন যামিনী অতি সুখে থাকে। অনেকের অপর কোনো গৃহ নাই—পুত্র কলত্রাদি লইয়া ইহাতেই চির-

কাল বাস করে। বালিকা, তরুণী এবং প্রাচীনারাও তরণী বাহন করিতে অতিশয় নিপুণা। এখানকার নৌকা আমাদের দেশীয় নৌকা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আকারানুসারে ইহাদিগের নানাবিধ নাম। তন্মধ্যে শিকারী ও ডুঙ্গা প্রসিদ্ধ এবং পর্য্যটকদিগের ব্যবহারের উপযুক্ত। একারণ, কেবল এই দুই প্রকারেরই কিছু পরিচয় দিতেছি।

শিকারী সাধারণতঃ দৈর্ঘ্যে ২৫হাত, প্রস্থে ২।• হাত এবং গভীরতায় ১ ফুট। ইহার মধ্যস্থলে অর্থাৎ আরোহীদিগের বসিবার স্থানের উপরিভাগে হোগলা দিয়া ছাওয়া। ইচ্ছানুসারে এই ছাদ উঠাইয়া লওয়া যায়। বৃষ্টি ও আতপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ইহাতে কয়েকটী হোগলার পর্দ্দা লম্বমান থাকে। যে দাঁড় দ্বারা ইহা চালিত হইয়া থাকে, তাহাকে চাপ্‌পা কহে। চাপ্‌পা আমাদের দেশীয় দাঁড় অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র—মিষ্টান্নাদি পাক করিবার তাড়ু অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহৎ। ইহা নৌকার সহিত কোনো রজ্জু দ্বারা বন্ধনীকৃত না হইয়া বাহকগণ অসংলগ্ন হস্তে চালিত করে। এখানকার কোনো তরণীতে কর্ণ নাই। পশ্চাদ্ভাগে একজন চাপ্‌পা দ্বারা কর্ণের কাজ করে। আরোহীদিগের অভিলাষানুসারে শিকারীতে তিন হইতে দশ জন পর্য্যন্ত বাহক নিযুক্ত হইয়া থাকে। ইহাতে কোমলাঙ্গী বাহিকা থাকে না। প্রত্যেক নাবিকের মাসিক বেতন তিন টাকা এবং নৌকাভাড়া এক টাকা মাত্র। পরন্তু নগরের বাহিরে লইয়া গেলে এতদ্ব্যতীত প্রত্যেককে প্রত্যহ এক আনা করিয়া খোরাকী দিতে হয়।

শিকারী-প্রমোদ-তরণী। এতদ্দ্বারা সকলেই শ্রীনগর এবং

সন্নিধি স্থান সমুদায়ে প্রত্যহ বিচরণ করিয়া থাকে। এ কারণ পর্য্যটকেরা তথায় উপনীত হইয়াই ইহা নিযুক্ত করেন।

ডুঙ্গা দূরপরিভ্রমণের উপযোগী এবং ইহাই মাঝিদিগের (ইহাদিগকে কাশ্মীরী ভাষায় হাঁঝি কহে) বাসগৃহ। ইহা সাধারণতঃ প্রায় ৪০ হাত দীর্ঘ, ৪ হাত প্রশস্ত, এবং দেড় হাত গভীর। ইহার উপরিভাগ হোগলা দিয়া ছাওয়া এবং ইহাতেও হোগলার পর্দ্দা আছে। ইহার শেষার্দ্ধভাগে হাঁঝিরা সপরিবারে বাস করিয়া থাকে এবং অপরার্দ্ধে ভ্রমণকারী আপন দ্রব্যসম্ভার ও ভৃত্য সমভিব্যাহারে অতি সুখে থাকিতে পারেন। ইহাও চাপ্‌পা দ্বারা বাহিত হয় এবং রমণীগণও চালনা করিয়া থাকে। অতি দূরে যাইতে অথবা নৌকাবাস পক্ষে এই নৌকা বিশেষ উপযোগী এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয়। অনেক কাশ্মীরী পণ্ডিত এইরূপ তরণীযোগে কর্ম্মস্থানে আইসে এবং ভোজনকালে গৃহে প্রতিগমন না করিয়া ইহাতেই রন্ধন এবং আহারাদি ক্রিয়া সমাপন করিয়া থাকে।

মহারাজার কতিপয় অতি সুদৃশ্য তরণী আছে। নির্ম্মাণানুসারে ইহা পরিন্দা (পক্ষী) চকোয়ারি (চতুষ্কোণ) বাগ্‌ণী (গাড়ী) প্রভৃতি নামে খ্যাত। এই সমুদায়ে নাবিকদিগের বসিবার স্থান এত দীর্ঘ, যে, এককালে ন্যূনাধিক ৫০ হইতে ৮০ জন নাবিক চাপ্‌পা মারিতে থাকে এবং তখন তরী তীরবেগে গমন করে।

[হ্রদ] কাশ্মীরে চারিটী প্রসিদ্ধ হ্রদ আছে। প্রথম ডল্ অর্থাৎ নাগরিক হ্রদ। ইহা শ্রীনগরের উত্তরপূর্ব্বভাগে এবং

অর্দ্ধ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। চুঁটকোল (চুঁট—আপেল ফল এবং কোল—খাল) নাম্নী খাল দ্বারা ইহা বিতস্তা নদীর সহিত সংমিলিত। দ্বিতীয় আঞ্চার। ইহা উত্তরভাগে এবং প্রায় একক্রোশ দূরে। নালামার খাল দ্বারা ইহা ডলের সহিত সংযুক্ত। তৃতীয় মানস্‌বল। ইহা পশ্চিমদিকে এবং স্থলপথে প্রায় পাঁচ ক্রোশ এবং জলপথে ন্যূনাধিক আট ক্রোশ। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু রমণীয়তা পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। চতুর্থ উলর। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং বিতস্তা নদী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ইহা উত্তরপশ্চিম প্রান্তে এবং স্থলপথে ১১ ক্রোশ এবং জলপথে ১৫ ক্রোশ।

এই হ্রদ চতুষ্টয় উপত্যকার সমতল ভূমিতে স্থিত; এতদ্ব্যতিরেকে আরো কয়েকটী পর্ব্বতোপরি অধিত্যকায় অধিষ্ঠিত আছে। উহাদিগকে পার্ব্বত্য হ্রদ নামে বাচ্য করা যাইতে পারে। যেহেতু অধিষ্ঠানভূত গিরি ব্যতীত উহারা পর্ব্বতমালায় পরিবেষ্টিত। উহাদিগের মধ্যে কোশানাগ, শেষনাগ, এবং গঙ্গাবল প্রধান। যথাস্থলে উহাদের বর্ণনা করা যাইবে।

[উৎস] অপর, এস্থলে [illegible]তের গাত্র ভেদ করিয়া অথবা পৃথিবীর অন্তর্ভাগ হইতে যে কত উৎস নির্গত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। তন্মধ্যে এই কয়টী পরম সুন্দর;—বৈরনাগ, অনন্তনাগ, বায়ন, আচ্ছাবল, কুক্কুড়নাগ এবং রিৎবিথর। শেষোক্তটী বিতস্তা নদীর উৎপত্তি স্থান। ইহারা পূর্ব্ব বিভাগে স্থিত। সুতরাং তদ্বর্ণনানুষঙ্গিক ইহাদের আকৃতি ও প্রকৃতি বর্ণনা করতঃ পাঠকমণ্ডলীর কৌতূহল পরিতুষ্ট করিতে চেষ্টা পাইব।

[ঋতু পরিবর্ত্তন] কি ইতিহাসবেত্তা, কি ভ্রমণকারী, যিনি কাশ্মীর সম্বন্ধে লেখনী সঞ্চালন করিয়াছেন, তিনিই ইহাকে ভূস্বর্গ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন৷ প্রত্যুত, এখানে যেরূপ সৃষ্টির রমণীয় শোভা অলৌকিক নৈসর্গিক ব্যাপার, স্বাস্থ্যকর জলবায়ু, কৃত্রিম মনোহর উপবন এবং সুলভ অথচ সুস্বাদু আহারীয় দ্রব্য, তাহাতে ইহা স্বর্গ ভিন্ন অপর কোনো শব্দে বাচ্য হইতে পারে না। বসন্তাগমে যখন বরফ দ্রবীভূত হইতে আরম্ভ হয়, তখন সৃষ্টির কি বিচিত্র শোভা! তুষার-মণ্ডিত পাদপগণের শাখা যেমন তুষার হইতে মুক্ত হইতেছে, অমনি উহাতে পুষ্প ফুটিয়া উঠিতেছে—যেদিকে নয়ন উন্মীলন কর, সেই দিগেই দেখিতে পাইবে প্রকৃতিদেবী পুষ্পপরিচ্ছদ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। বৃক্ষগণের আপাদমস্তক কুসুমাচ্ছাদিত—পত্রের লেশমাত্রও নাই (ফুল শুষ্ক হইয়া পতিত হইলে পর পত্র উদ্গম হয়); মন্দ মন্দ মলয়সমীরণ বহিতেছে; শীতের নিদারুণ প্রভাবে মধু-কণ্ঠ দ্বিজগণের কণ্ঠরোধ হইয়াছিল, এখন বসন্তাগমে তাহারা বৃক্ষশাখায় বসিয়া মুক্তস্বরে গান করিতেছে; বহুদিনের পর প্রিয়সমাগম লাভ করিয়া মধুকর মত্তভাবে এক পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে গুণ গুণ রব করিয়া বেড়াইতেছে—দেখিলে বোধ হয়, যেন বসন্তরাজ দোর্দ্দণ্ড ইংরাজদিগের শাসন-ভয়ে হিন্দুস্থান হইতে পলায়ন করিয়া এই স্থানেই বিরাজ করিতেছেন! প্রত্যুত এখানে বৈশাখ মাস হইতে কার্ত্তিকমাস পর্য্যন্ত সাত মাস বসন্ত।

এদেশে শীতকালে যে পরিমাণে বরফ পড়ে, তদনুসারেই বসন্তের সমাগম হয়। অর্থাৎ কোনো বৎসর অল্প পরিমাণে

তুষারপাত হইলে, তৎসমুদায় চৈত্রমাসের প্রারম্ভেই দ্রব হইয়া শীঘ্র শীঘ্র বসন্তের উদয় হয় এবং অধিক পরিমাণে পড়িলে সে সমুদায় দ্রব হইতে সম্পূর্ণ চৈত্রমাস লাগে; সুতরাং সে বৎসর বৈশাখ মাস ব্যতীত বসন্তের আবির্ভাব হয় না। কথিত আছে, এক সময়ে দিল্লীশ্বর জেহাঙ্গির বাদশাহ রাজকার্য্যানুরোধে বসন্ত কালের প্রারম্ভে কাশ্মীরে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাহাতে তিনি তথাকার প্রধান কর্ম্মচারীকে এই অভিপ্রায়ে এক পত্র লেখেন, যে, যেন বসন্তরাজ তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করে—তাঁহার পদার্পণের পূর্ব্বে যেন কোনো মতে বসন্ত আবির্ভূত না হয়! সুচতুর কর্ম্মচারী এই পত্রের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিয়া চতুষ্পার্শ্বস্থ পর্ব্বত হইতে রাশি রাশি বরফ আনাইয়া সমুদায় ক্রীড়া উপবনের পাদপসমূহ তদ্দ্বারা আবৃত করিয়া দিলেন। সুতরাং পুষ্প উদ্গত হইতে পারিল না। পরে যখন বাদশাহ কাশ্মীরে উপনীত হইলেন, তখন বৃক্ষাদি হইতে তুষাররাশি উন্মোচন করিয়া দিলে বসন্তরাজ পুষ্পসেনা সমভিব্যাহারে স্বীয় মোহনমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন!

সর্ব্বাদৌ বেদমুষ্ক নামক বৃক্ষের পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। ইহা ঈষৎ হরিদ্রা আভাযুক্ত শুক্লবর্ণ। পরে একাদিক্রমে যে সমুদায় পুষ্প বিকসিত হয়, তাহাদের সংখ্যা করা যায় না। যেদিকে নিরীক্ষণ করা যায়, নানাবর্ণের সুগন্ধ পুষ্প দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া অতুল আনন্দ উৎপাদন করে। এখানে পুষ্পগুচ্ছ (ফুলের তোড়া) প্রস্তুত করিতে হইলে এক বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে ভ্রমণ পূর্ব্বক পুষ্পচয়নক্লেশ লইতে হয় না—একবার মাত্র হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক খন্মুস-

বর্ত্তী পুষ্পরাশি উৎপাটন করিলেই অতি সুন্দর পুষ্পগুচ্ছ প্রস্তুত করা যায়।

আবার মনোহর বাদামপুষ্প প্রস্ফুটিত হইলে আর এক নূতন শোভা! তখন কাশ্মীরীদিগের আনন্দের আর সীমা থাকে না। কি সধন, কি নির্ধন, কি যুবা, কি বৃদ্ধ, কাশ্মীরীমাত্রেই আপনাপন ভবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক কস্তুরা * পক্ষীর পিঞ্জর হস্তে করিয়া হরিপর্ব্বত নামক স্থানে গমন করে। তথায় বাদামবৃক্ষ প্রচুর। উহারা কোনো বৃক্ষশাখায় পিঞ্জর স্থাপন করতঃ মস্তক হইতে উষ্ণীষ অবতরণ পূর্ব্বক তাহার নিম্নদেশে উপবিষ্ট হয়। এবং যৎকালে কস্তুরা মনোহর নৃত্য ও সুললিত স্বরে গান করিতে থাকে, তখন উহারা প্রীতিপ্রফুল্লমনে কৃতজ্ঞতা-সূচক বিভুগুণ গান এবং মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করে। প্রত্যুত, তখন প্রকৃতির যেরূপ রমণীয় শোভা, তাহাতে নরাধম নাস্তিকের পাষাণান্তঃকরণেও সহসা ঈশ্বরপ্রেম প্রতিভাত না হইয়া যায় না!

জ্যৈষ্ঠমাস সমাগত হইলে 'জেস্‌মিন' পুষ্প বিকসিত হয়। ইহার বর্ণ আকাশের সদৃশ বলিয়া এখানকার লোকে ইহাকে 'হি আস্‌মান' কহিয়া থাকে। ইহা প্রস্ফুটিত হইয়া গেলে পুষ্প শোভার একশেষ হইল। ঋতুরাজের পুষ্পসেনানী মধ্যে ইহা সর্ব্বশেষ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াই বোধ হয়, ইহা এত মনোহর। সুখময় বৈশাখ মাস অবসান হইল দেখিয়াই যেন মনোদুঃখে পুষ্পগণ একাদিক্রমে বৃক্ষ হইতে পতিত হইতে

---

* কাশ্মীরীরা ইহাকে "হাজার দস্তান" কহিয়া থাকে। ইহা দেখিতে ঠিক গাংশালিকের ন্যায়। ইহার স্বর অতিশয় মধুর ও চিত্ত-প্রফুল্লকর।

থাকে। এমন সুন্দর কুসুমরাশির ভূমি-শয্যা ভাল দেখায় না বলিয়াই প্রকৃতি দেবী হরিদ্বর্ণ দূর্ব্বাদলের গালিচা বিছাইয়া দেন। পাদপসমূহ একে তো শ্রীভ্রষ্ট হইল, তাহাতে আবার পাছে অন্য কোনো অনিষ্ট ঘটে, এই আশঙ্কায় পল্লব রূপ সহস্র সহস্র অঙ্গুলি নির্গমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে ঈশ্বরের স্তুতিবাদ করিতে আরম্ভ করে।

আষাঢ় মাস সমাগত। ফলপ্রদ বৃক্ষ সমুদয়ও মুকুলিত হইতে লাগিল। শস্যক্ষেত্র হরিদ্বর্ণ শস্যে পরিপূরিত—তদুপরি সুমধুর পবন-হিল্লোল ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে, দেখিতে অতি রমণীয়।

এখানে গ্রীষ্মের লেশমাত্রও নাই বলিলেই হয়। যৎকালে আমাদিগের বঙ্গদেশে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তাপে কলেবর দগ্ধ হইতে থাকে—ঘরের বাহিরে পাদবিক্ষেপ করা এক প্রকার দুঃসাধ্য হইয়া উঠে—ঘর্ম্মবারি এক দণ্ডের জন্যও নিবারিত নয়—সুশীতল শীতলপাটী, সুগন্ধ খস্‌খসের টাটী ও অবিশ্রান্ত ব্যজন কিছুই শ্রান্তি দান করিতে পারে না—তৎকালে এখানে দিবা-নিশি মলয়ানিল মন্দ মন্দ হিল্লোলে গাত্র স্নিগ্ধ করিতে থাকে। দিবাভাগে সাধারণ ও লঘু বস্ত্রাদি ব্যবহার করিলে শরীর প্রফুল্ল হয়। কিন্তু রাত্রিকালে লেপ প্রভৃতি শীতবস্ত্র ব্যবহার না করিলে চলে না।

আষাঢ় মাসের শেষভাগে এবং শ্রাবণ মাসের প্রারম্ভে কোনো কোনো দিন দুই প্রহরের সময় সূর্য্যের তেজ কথঞ্চিৎ প্রখর বোধ হয় মাত্র। তখন কচিৎ উত্তাপ ঊর্দ্ধ সংখ্যা ৮৫ ডিগ্রী পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। কিন্তু তৎকালে কোনো চেনার

বৃক্ষতলে উপবেশন করিলে বা নদীর উপরে নৌকারোহণে বেড়াইলে অমনি শরীর শীতল হয়—বোধ হয়, যেন তুষারে অবগাহন করিতেছি। এমন সময়ে প্রায়ই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া বারিধারা পতিত হওতঃ গ্রীষ্মকে দূরীভূত করিয়া দেয়। *

এখানে “ শ্রাবণের ধারা ” নাই। শীতকালে যখন বরফ পড়িতে থাকে, তখন তৎসমভিব্যাহারে অবিশ্রান্ত বারিধারা, প্রবল ঝটিকা এবং শিলাবৃষ্টি হয়। পরন্তু সম্বৎসরে বৃষ্টিপতন ১৮ অথবা ২০ ইঞ্চি হইতে অধিক নহে।

আশ্বিন মাস আগত হইলে বৃক্ষের পত্র সমুদায় বিবর্ণ এবং সুমধুর ফল সমস্ত পরিপক্ক হয়।

কার্ত্তিক মাস হইতে শীতের আরম্ভ। তখন বায়ু অতিশয় শীতল বহিতে থাকে। শীতকাল আসিতেছে দেখিয়াই যেন বৃক্ষগণ ভয়ে কম্পিত হওয়াতে পত্র সমুদায় একাদিক্রমে পতিত হইয়া যায়। এই সময়ে জাফরান উৎপন্ন হয়। শ্রীনগর হইতে ছয় ক্রোশ দূরে পাম্পুর নামে এক স্থান আছে। কেবল তথায় মাত্রই এই সুবর্ণ ও সুগন্ধ পদার্থ জন্মিয়া থাকে। ইহার পুষ্প বিকসিত হইলে ক্ষেত্র সমুদয় পরম রমণীয় শোভা ধারণ করে। ইহাই কাশ্মীর প্রদেশের শেষ সৌন্দর্য্য এবং ইহার বর্ণ হরিদ্রা। এখানকার সমুদায় সৌন্দর্য্য একাদিক্রমে অস্তমিত হইয়া গেল, এই দুঃখে যেন

---

* শ্রীনগর হইতে কিয়দ্দূর “গুল্ মর্গ” (পুষ্পক্ষেত্র) নামে এক স্থান আছে। উহা অতিশয় শীতল ও মনোরম। এই সময় শ্রীনগরে কিঞ্চিৎ সূর্য্যাতপ বোধ হইলে ভোগ-বিলাসী ব্যক্তিগণ ঐ স্থলে গমন পূর্ব্বক কিয়দ্দিবস অতিবাহন করে। যথা-স্থলে ইহার বর্ণনা করা যাইবে।

বসুমতী পীতবর্ণা হইলেন, এমনি বোধ হয়! এক জন পারস্য-কবি লিখিয়াছেন "*জাফরা রা দিদা রায়েদ, রাহে হিন্দুস্থানে গেরেফৎ।*" অর্থাৎ জাফরান (প্রস্ফুটিত হইয়া) সকলকে কহিতেছে, তোমরা (এস্থান পরিত্যাগ করিয়া) হিন্দুস্থানের পথ ধারণ কর।

শীতকাল আসিতেছে দেখিয়া কাশ্মীরীরা আহারীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ এবং সমুদায় তরকারি (লাউ পর্য্যন্ত) শুকাইয়া রাখে। লঙ্কার বৃহৎ বৃহৎ মালা কাহারো বারাণ্ডায়, কাহারো জানালায়, কাহারো নৌকায় শুকাইতেছে দেখিলে স্মরণ হয় "যেমন উনুনমুখো দেবতা, তেম্নি ঘুঁটের পাঁইশ নৈবেদ্য!" অথবা "যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল!" ফলতঃ শীতঋতু এখানে যেমন দুর্দ্দান্ত, লঙ্কা তদুপযুক্তই পাদ্য-অর্ঘ! আমাদের দৃষ্টিতে কাশ্মীর যেন লঙ্কার মালা ধারণ পূর্ব্বক দুরন্ত শীতকে বরণ ও আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে!

কার্ত্তিক মাসের শেষভাগ হইতে চতুষ্পার্শ্বস্থ পর্ব্বতোপরি বরফ পড়িতে আরম্ভ হয়। কিন্তু উহা অতি সামান্য এবং সূর্য্যোত্তাপে দ্রবীভূত হইয়া যায়। পৌষ মাস হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে দারুণ বরফ পড়িতে থাকে এবং সমুদায় একেবারে তুষারমণ্ডিত হইয়া উঠে। তখন প্রকৃতি বিমল ধবলবেশ ধারণ করেন; দেখিতে অতি রমণীয় বটে, কিন্তু এস্থলে বাস করা অতিশয় কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। এখানকার প্রধান মন্ত্রী সুবিজ্ঞ দেওয়ান কৃপারাম কাশ্মীর ইতিহাসে তুষারপাত সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন, যে;—

" না বরফ অস্ত ঈঁ, কে মেবারদ্ সরে পীর।
ফলক্ তোফমে জনদ্ বর্ রুয়ে কাশ্মীর।"

অর্থাৎ পীর পর্ব্বতের উপর হইতে যে শ্বেতবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকা পতিত হইতেছে, উহা বরফ নহে; আকাশ কাশ্মীরের মুখে মুখামৃত প্রদান করিতেছে মাত্র। প্রত্যুত, এখানে শীতকাল যেরূপ ভয়ঙ্কর ও কষ্টপ্রদ এবং যে আকারে তুষারপাত হইয়া থাকে, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত কবিতা কোনো মতে অসঙ্গত নহে। একেতো, এক দণ্ডের জন্যও তুষারপাতের বিশ্রাম নাই বলিলেই হয়, তাহাতে আবার মধ্যে মধ্যে প্রবল ঝটিকা, অবিশ্রান্ত বারিধারা এবং ভয়ঙ্কর শিলাবৃষ্টি হইয়া প্রলয় কালের ন্যায় প্রতীয়মান হয়! কখনো কখনো সূর্য্যদেব এক মাসের মধ্যে একবারও নয়নগোচর হন না। হ্রদ প্রভৃতি জলাশয় সমুদায় একেবারে তুষারে আচ্ছন্ন হইয়া যায় এবং কোনো কোনো বৎসর এত পরিমাণে বরফ পড়ে, যে, বিতস্তা নদী সম্পূর্ণ রূপে জমিয়া যায়। কোনো কোনো দিন এরূপ শীতাধিক্য হয়, যে, গৃহের মধ্যে কোনো পাত্রে জল থাকিলে উহা অমনি জমাট বাঁধে। এখানকার লোকে উহাকে "কটাকচু" কহে এবং উহার পূর্ব্বলক্ষণ জানিতে পারিয়া সাবধান হয়। সে কালে ঘরের বাহির হওয়া কাহার সাধ্য? সুতরাং কি ধনী, কি নির্ধন, সকলেই শীতকালের জন্য আহারীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া রাখে। "কিন্তু যার কর্ম্ম তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে" অর্থাৎ আমাদের পক্ষে অসহনীয় হই-লেও সে সময়ে কাশ্মীরী লোকেরা সুখসচ্ছন্দে বাস করিয়া থাকে। তাহাদের কাহারো গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখ, স্থানে

স্থানে অগ্নি জ্বলিতেছে, সকলের বক্ষে এক এক কাঁকড়ি* রহিয়াছে, পুরুষমণ্ডলী শাল বুনিতেছে এবং কামিনীগণ সূচিকা দ্বারা ধীরে ধীরে শালের টুপি, হাঁসিয়া, কুঞ্জ, গলাবন্ধ প্রভৃতি শিল্প কর্ম্ম করিতেছে।

এই সময়ে সৃষ্টির শোভা অতি বিচিত্র। বরফ পড়িবার কিছু দিবস পূর্ব্বে যে শিশিরপাত হইয়া থাকে, অতি প্রত্যূষে উহা দেখিলে সহসা বোধ হয়, যেন কেহ চূর্ণ বিছাইয়া রাখিয়াছে। উহা সংগ্রহ কর, বরফকণার ন্যায় প্রতীয়মান হইবে। এই রূপে কিছু দিবস অতীত হইয়া পরে নারিকেল চূর্ণ আকারে বরফ পড়িতে থাকে। নীহারপাত হইবার পূর্ব্বে শীত অত্যন্ত প্রবল হয়। কিন্তু পতন হইয়া গেলে আর সেরূপ নয়। তখন অতি আনন্দজনক মধুর শৈত্য অনুভূত হইতে থাকে। এমন সময়ে নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দেখ, প্রকৃতি রজতবেশে শোভা পাইতেছেন। চারি দিগস্থ গিরিশ্রেণী আপাদমস্তক রজতমণ্ডিত—মহীরুহ সমুদায় ইতিপূর্ব্বে বিগলিত-পত্র হইয়া শুষ্ক ও শীর্ণভাবে দণ্ডায়মান ছিল, এক্ষণে বোধ হইতেছে, যেন রৌপ্যের বৃক্ষনিচয় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—গৃহের ছাদ, বাটীর প্রাঙ্গণ, বন্ধুর ও অবন্ধুর ভূমি, নদীর ঘাট, নৌকার ছাত, যেদিকে নিরীক্ষণ কর, সকলেই যেন রৌপ্যময় মনোহর শুভ্রবেশ ধারণ করিয়াছে—এমনি

* কাঁকড়ি আমাদিগের দেশীয় অগ্নি-সেবন করিবার মালসা মাত্র। কিন্তু ইহা অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র এবং ইহার চারিপার্শ্ব বাখারি দিয়া বোনা এবং মুখ অপ্রশস্ত। আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই ইহা সম্বৎসরকাল ব্যবহার করে এবং গ্রীবা হইতে বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত ঝুলাইয়া দেয়। এ কারণ, কাশ্মীরী মাত্রেরই বক্ষঃস্থলে পোড়া দাগ আছে।

মনোহর, যে, বোধ হয় তেমন উল্লাসজনক দৃশ্য আর কুত্রাপি নাই এবং এমনি শুভ্র, যে, পৃথিবীমণ্ডলে তেমন শুভ্র আর কিছুই হইতে পারে না। আবার কাচের নলের ন্যায় বরফের নল ছাদ হইতে যে ঝুলিতে থাকে, তাহার রমণীয়তা প্রকাশ করিবার শব্দ নাই। বিগত বৎসরে কোনো গুণবতী বিদুষী বঙ্গমহিলা পৌষ মাসের শেষভাগে আপন জনৈকা প্রিয়তমা বয়স্যাকে কাশ্মীর হইতে যে একখানি প্রণয়-গর্ভ পত্রিকা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে নীহারপাত সম্বন্ধে যে কয়েক সুললিত পংক্তি লিখিত ছিল, পাঠকবৃন্দের গোচরার্থে তাহা এস্থলে উদ্ধৃত না করিয়া নিরস্ত হইতে পারিলাম না। তিনি লিখিয়াছেন ;— "পীর পাহাড়ের বরফ দেখিয়াছ, এক্ষণে যদি একবার কাশ্মীরের বরফ দেখ, তাহা হইলে আশ্চর্য্য হইবে। এক্ষণে কাশ্মীর দেখিতে অতি সুন্দর হইয়াছে। চারিদিক কেবলই ধবলাকার। ছাদের উপর হইতে কাচের নলের ন্যায় বরফ ঝুলিতেছে। ভাঙ্গিয়া দেখ, ঠিক যেন কাচের নল। তাহাও দেখিতে খুব সুন্দর। রাত্রিকালে কোনো ঘরে ঘটী কিম্বা বাটী করিয়া জল রাখিলে তাহা জমিয়া বরফ হইয়া থাকে। এই সকল বরফের কারখানা দেখিয়া তোমাদের জন্য অতিশয় মন কেমন করে। তোমরা কাশ্মীরে আসিয়া বরফ দেখিতে পাইলে না, ইহা বড় দুঃখের বিষয়। আমার ইচ্ছা হয়, যে, তোমাদের একবার কাশ্মীরের বরফ দেখাই।" প্রত্যুত নীহারপাতের সমুদায় কারখানা এমনি রমণীয়ই বটে।

শীতকালে চা এবং মাংসই প্রধান খাদ্য। সর্ব্বজীব-পালক ঈশ্বরের আশ্চর্য্য পাতৃত্ব গুণে একেতো এই শীতপ্রধান দেশে

মেষ (কাশ্মীরী দুম্বা) প্রভৃতি নানাবিধ পশুর প্রাচুর্য্য, তাহাতে আবার কেবলমাত্র শীতকালেই কতিপয় জলচর পক্ষী প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কোনো কোনো দিন কিঞ্চিৎ পরিষ্কার হইলে লোকে জলাশয়ে গমন পূর্ব্বক তৎসমুদয় শীকার করিয়া লইয়া আইসে। এ সময়ে মৃণাল ভিন্ন কোনো কিছুর তরকারী পাওয়া যায় না। কাশ্মীরীরা ইহাকে "নদ্রু" এবং রন্ধন পূর্ব্বক আহার করে।

[জলবায়ু] এখানকার জলবায়ু যেরূপ স্বাস্থ্যকর, বোধ হয়, পৃথিবীর অপর কোনো স্থানে এরূপ নাই। বিতস্তা নদীর জল অতিশয় নির্ম্মল ও স্বাদু। হ্রদ সমূহের জল এরূপ স্বচ্ছ, যে, দশ হাত জলের নীচে মৎস্যগণ ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে, স্পষ্ট লক্ষ্য হয়। এতদ্ব্যতীত যে সমুদায় অগণ্য উৎস ও নির্ঝর আছে, তাহাদিগের জল সাতিশয় পুষ্টিকর এবং এমন শীতল, যে, জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ়মাসে পান করিলেও বোধহয় যেন দাঁত খসিয়া পড়িল। এখানে গ্রীষ্ম ও ধূলা আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক। সুতরাং পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, এখানকার বায়ু কিরূপ নির্ম্মল, শীতল এবং স্বাস্থ্যকর। এখানকার জল ও বায়ু এতদ্রূপ বলিয়া এখানে যেরূপ শাল প্রস্তুত হয়, এমন আর কোনো স্থলে হইবার নহে। (যথাস্থলে তাহার বর্ণনা করা যাইবে) একজন পারস্য-কবি এতৎ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন ;—

" হর্ সোক্তা যানে কে ব কাশ্মীর দরায়দ্।
গর্ মুরগে কাবাব্ অস্ত্ কে বা বলোপর্ আয়েদ্ ॥ "

অর্থাৎ " যদি কোনো দগ্ধীভূত জীব কাশ্মীরে আইসে,

তাহা হইলে সে জীবন প্রাপ্ত হয়। অধিক কি, কাবাব করা মাংসখণ্ড এখানে আসিলে তাহার পক্ষ উদ্গত হইয়া অতি শীঘ্র পক্ষীর আকারে পরিণত ও সজীব হইয়া উঠে!” প্রত্যুত, এখানকার জলবায়ু এতাদৃশই বটে।

[কৃষি ও উদ্ভিজ] এখানকার ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা। পর্ব্বতের গাত্রে যে সমুদায় শস্যক্ষেত্র আছে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। যে যে স্থানে দুরারোহ বলিয়া কৃষকগণ হল চালনা করিতে পারে না, তথায় নিসর্গোৎপন্ন বাদাম, তুঁত, আক্‌রোট প্রভৃতি সুস্বাদু ফলের বৃক্ষ অসংখ্য পরিমাণে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে এবং মনোহর নিবিড় শ্যামবর্ণ দূর্ব্বাদল এত প্রচুর পরিমাণে ও এমন সুন্দরভাবে জন্মিয়া থাকে, যে, সেরূপ আর কুত্রাপি নাই। পাইন,* দেদার (দেবদারু জাতীয়) প্রভৃতি বহুমূল্য বন্যজাত বৃক্ষ অতিশয় প্রচুর। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তৎসমুদায় স্থানান্তর করিবার উপায় নাই।

আমাদিগের দেশের ন্যায় এখানে চাউল প্রধান খাদ্য। সুতরাং গোধূম, যব এবং অন্যান্য শস্যাপেক্ষা ধান্য অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখানে আহার্য্য দ্রব্য আমাদিগের দেশের ন্যায় সুস্বাদু ও প্রচুর। দুগ্ধ, ছানা, মৎস্য এবং মাংসের তো কথাই নাই। বেগুন, (রক্তিমা ও গোলাপী বর্ণ, কিন্তু নবনীতের ন্যায় অত্যন্ত কোমল) কড়াইশুঁটী, আলু,

---

* ইহাকে এখানে চীড় কহে। ইহা আমেরিকা দেশীয় বা অপর স্থানীয় পাইনের ন্যায় সুন্দর ও দৃঢ় নহে। এতদ্দ্বারা কাশ্মীরীরা বাসগৃহ ও নৌকাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে এবং ইহা তৈলাক্ত বশতঃ ডাকবাহক ও পথিকেরা ইহার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা মশাল প্রস্তুত করিয়া অন্ধকার রজনীতে পার্ব্বত্যপথে গমন করে।

রুপি প্রভৃতি নানাবিধ তরকারী অপর্য্যাপ্ত জন্মিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন সেউ১ নাক নাসপাতি ২, বিহি ৩, গেলাস ৪, কোতরনল্, গোমা বগ্‌গু, তুঁত, আঙ্গুর, আক্‌রোট, বাদাম, আঁড়ু ৫ প্রভৃতি যে কত প্রকার সুস্বাদু ফল জন্মিয়া থাকে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। একে তো এই সমুদায়ের মনোহর উদ্যান আছে, তাহাতে আবার বিজন কাননে বিশেষতঃ পর্ব্বতের নিম্নদেশে অপর্য্যাপ্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে। বাদাম চারি প্রকার; তন্মধ্যে এক প্রকারের আচ্ছাদন কাগজের ন্যায় সূক্ষ্ম বলিয়া 'কাগজী' নামে বিখ্যাত। আঙ্গুর অষ্টাদশ প্রকার; তন্মধ্যে 'সাহেবী' এবং 'মুষ্কা' সুপ্রসিদ্ধ। তেকাঁটাশির প্রভৃতি কণ্টক বৃক্ষের ন্যায় আঙ্গুরলতা যেখানে সেখানে জন্মিয়া থাকে; লাউয়ের মাচার ন্যায় সকলের প্রাঙ্গণে আঙ্গুর-মঞ্চ দেখিতে পাওয়া যায়। আঙ্গুর এত প্রচুর ও সুস্বাদু বলিয়া কাশ্মীরীরা গর্ব্ব সহকারে কহিয়া থাকে, যে, "যদি ঈশ্বরের মুখ থাকিত, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে এখানকার আঙ্গুর ও রুটি * খাওয়াইয়া সন্তুষ্ট করিতে পারিতাম।" কিন্তু দুঃখের বিষয়, অস্মদাদির দেশের আম্র, নারিকেল, কাঁঠাল, পেঁপে প্রভৃতি সুস্বাদু ফলের চিহ্নমাত্রও নাই। কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে কেশর অর্থাৎ জাফরান অতি উৎকৃষ্ট এবং রমণীয়। স্বতন্ত্র অধ্যায়ে ইহার বর্ণনা করা যাইবে।

---

১ Apple. ২ Kuince. ৩ Pears. ৪ Cherry. ৫ Peach.

* কাশ্মীরীরা রুটির যেরূপ গৌরব করিয়া থাকে, ফলতঃ উহা তদ্রূপ প্রশংসনীয় নহে। পরন্তু ইহারা মাংস রন্ধন করিতে সুপ্রসিদ্ধ।

[পশু ও পক্ষী] ভারতবর্ষের অপরাপর অংশের নানাবিধ পশুপক্ষী এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত হিমালয় প্রদেশের অনেক জীব জন্তুও আছে। গাভী সকল খর্ব্বাকৃতি এবং অধিকাংশ কৃষ্ণবর্ণ। লোকে সাধারণ কথায় কহিয়া থাকে "কাল গরুর দুগ্ধ অতিশয় পুষ্টিকর।" এই জন্য বোধ হয়, সৃজনকর্ত্তা এই স্বর্গতুল্য স্থানে অন্যান্য সকল প্রাণীকে শ্বেতকায় করিয়া কেবল গাভীকেই কৃষ্ণবর্ণ করিয়া দিয়াছেন। মহিষ এখানে নাই। অহো! কি আশ্চর্য্য! যে বায়সের তিমিরসদৃশ রূপ জগদ্বিখ্যাত, উহা এখানে অপেক্ষাকৃত শ্বেতবর্ণ এবং উহার স্বর অপরাপর স্থানীয় বায়সের ন্যায় কর্কশ নহে। হিমপ্রাধান্য ইহার মূলীভূত কারণ, তাহার কোনো সন্দেহ নাই। এখানে সর্প, বৃশ্চিকাদি হিংস্র জীব অতি বিরল এবং উহাদিকের দংশনেরও কোনো ভয় নাই। কিন্তু পিস্‌স্ নামক এক প্রকার ক্ষুদ্র জীব আছে, উহা অতিশয় ভয়ানক ও কষ্টপ্রদ। বোধ করি, যিনি কখনো কোনো পার্ব্বত্যদেশে কালযাপন করেন নাই, তাঁহার নিকট হয় তো ইহার নামও শ্রুত হয় নাই—ইহার দৌরাত্ম্য সহ্য করা তো দূরের কথা! ইহা অতি ক্ষুদ্রকায়—অন্‌কির ন্যায় ক্ষুদ্র, মশকের ন্যায় রক্তশোষণ করে। ধরিতে গেলে লম্ফ দিয়া অন্তর্দ্ধান! এবং মারিতে গেলে নখ বা ছুরিকা দ্বারা বিদীর্ণ না করিলে প্রাণত্যাগ করে না—বোধ হয় স্বর্গে বাস করে বলিয়া অমরতুল্য হইয়াছে! কি দিবা, কি রাত্রি সকল সময়েই ইহা আবির্ভূত হইয়া দংশনজ্বালায় অস্থির করিয়া তুলে—রাত্রিকালে মশারিতেও ইহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ নাই।

[ধাতু] কাশ্মীর প্রদেশের অনেক স্থানে লৌহ, সীসা, গন্ধক এবং তাম্রের আকর আছে। যৎকালে কাশ্মীর গমন করি, তখন পথিমধ্যে চন্দ্রভাগা নদী হইতে স্বর্ণ ও রৌপ্য সম্বলিত অনেক উপলখণ্ড সংগ্রহ করিয়াছিলাম। প্রত্যুত, এখানে স্বর্ণ ও রজতাদি বহুমূল্য ধাতুর আকর বিদ্যমান আছে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, একটী মাত্রও অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই এবং আধুনিক শাসনকর্ত্তা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিতেছেন। অপর, কোনো কোনো স্থানে পূর্ব্বতন নরপতিরা তাৎকালিক প্রথানুসারে বহুমূল্য ধনসম্পত্তি ভূগর্ভে নিহিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার কোনো সন্দেহ নাই। জনপ্রবাদ আছে, প্রায় পঞ্চদশ শত বৎসর হইল, যৎকালে চীন সম্রাটেরা পরাজিত হইয়া এদেশ হইতে দূরীভূত হয়, তখন তাহারা কোনো কোনো স্থলে দুর্মূল্য রত্নাদি নিহিত করিয়া গমন করে। বিগত ইং ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে যখন কাশ্মীর নগরে যাই, তখন শুনিলাম, যে, ডাক্তার বেলু নামক একজন সাহেব অনেক অনুসন্ধানের পর এক স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উহা পশ্চিমপ্রান্তভাগস্থ বারমুলা নামক স্থানের সন্নিকট। উহা যেরূপ নিভৃতস্থান ও স্থানটী যেরূপ পর্ব্বতাকারে পরিণত হইয়া গিয়াছে, তাহাতে এরূপ সন্দেহ কোনো মতে অসঙ্গত হইতে পারে না। ভগ্নাংশ দেখিয়া বোধ হয়, উহার চতুঃপার্শ্ব এককালে প্রস্তরপ্রাকার দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এবং এখানকার মহারাজার সম্মতিক্রমে উহা খাত হয়। খননকালে উহার নির্ম্মাণ-কৌশল দেখিয়া নিশ্চয় প্রতীতি হইয়াছিল, যে, ইহার অভ্যন্তরে অবশ্যই কিছু না কিছু অমূল্য রত্ন প্রোথিত

আছে। কিন্তু পরিশেষে আকাশ-কুসুমের ন্যায় সমুদায় অলীক হইয়া গেল!

[বাসগৃহ] এখানকার বাটী সকল কাষ্ঠনির্ম্মিত। কাশ্মীরী ভাষায় ইহাকে "লড়ী" কহে। এখানে প্রায় সর্ব্বদাই ভয়ানক ভূমিকম্প* হইয়া থাকে বলিয়া সকলে কাষ্ঠের ঘর প্রস্তুত করে। কোনো কোনো বাটীর ভিত্তি প্রস্তর বা ইষ্টকনির্ম্মিত। কিন্তু অধিকাংশই কাষ্ঠ-বনিয়াদের উপর স্থিত। হিমানীর দৌরাত্ম্যভয়ে ছাদ সমতল না করিয়া মধ্যদেশ উচ্চ এবং দুই পার্শ্ব ঢালু করিয়া থাকে। ইত্যাকার ছাদে কাষ্ঠ ও তক্তা সংলগ্ন করিয়া তদুপরি ভূর্জ্জপত্র বিছাইয়া দেয়; পরে তাহার উপরে মৃত্তিকা স্থাপন করিলেই ছাদ প্রস্তুত হইয়া গেল। বসন্ত ঋতুর আগমনে যখন ইহা হইতে তৃণ উদ্গত হইতে থাকে, তখন বোধ হয়, যেন সৌধ সমূহ হরিদ্বর্ণ গালিচায় আচ্ছাদিত রহিয়াছে। লড়ী সমুদয় দ্বিতল হইতে পাঁচ তল পর্য্যন্ত উচ্চ এবং দৃশ্যে ইংরাজী বাটীর সদৃশ। জানালার কবাট দ্বিভাগে বিভক্ত। বহির্দ্দেশস্থ কবাটে বিচিত্র কারু-কার্য্য আছে। ইহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র বিশিষ্ট। শীতাগমে কাশ্মীরীরা ইহা কাগজ দিয়া বন্ধ করে। সুতরাং দুর্দ্দান্ত হিম

* প্রায় দ্বাদশ বৎসর অতীত হইল, একদা এখানে এমন ভূমিকম্প হইয়াছিল, যে, প্রতি ঘণ্টায় ন্যূনাধিক চারিবার করিয়া কম্পিত হইত এবং এই ভূমিকম্প ক্রমাগত এক সপ্তাহকাল ব্যাপিয়াছিল। সুতরাং কি ধনী, কি নির্ধন সকলেই এ যাবৎকাল স্ব স্ব বাস গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তরুশূন্য মরুদেশে কিম্বা নৌকায় দিন যামিনী যাপন করিত। পরন্তু ঈশ্বরানুগ্রহে কোনো বিশেষ অনিষ্টোৎপত্তি হয় নাই।

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, অথচ আলোকেরও গতি-রোধ হয় না। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে এক একটী "বোখারি" (যাহাকে ইংরাজীতে 'চিম্‌নী' কহে)। এই বোখারি ব্যতীত শীতকালে বাস করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কোনো কোনো বাটীর—বিশেষতঃ ধনীলোকদিগের অট্টালিকার প্রথম তলে হামাম্ অর্থাৎ উষ্ণ স্নানাগার আছে। ইহা এরূপভাবে নির্ম্মিত, যে, ইহাতে শীতল বায়ু প্রবেশ করিতে পারেনা এবং স্নানোপযোগী তারতম্য বিশিষ্ট উষ্ণজল রাখিবার স্থান আছে। এ কারণ শীতকালে ইহাতে স্নান অতি প্রীতিকর এবং হামাম্ জ্বালিলে তৎপার্শ্বস্থ ও তদুপরিস্থ সমুদায় প্রকোষ্ঠ উষ্ণ থাকে। শ্রীনগরে প্রত্যেক লড়ীর দ্বার নদীতটে স্থিত এবং উহাতে অবতরণ করিবার সোপানশ্রেণী আছে। এই ঘাটকে ইয়ার্‌বল কহে। লোকে আপনাপন ইয়ার্‌বলে নৌকা রাখিয়া থাকে। এই সমুদয় কারণ বশতঃ বাটী সকল দেখিতে যেমন সুন্দর, তেমনি উপাদেয়। কিন্তু পাঠকগণ অনায়াসে বুঝিতে পারেন, দৈবাৎ কোনো লড়ীতে অগ্নি লাগিলে উহা নিমেষ মধ্যে দগ্ধ হইয়া যায়। মধ্যে মধ্যে এইরূপ শোচনীয় ব্যাপার ঘটিয়া ক্ষণকালের মধ্যে বহু সংখ্যক ভবন একবারে ভস্মীভূত হইয়া গিয়া থাকে।

[অধিবাসী] কাশ্মীর প্রদেশে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক; এমন কি, প্রতি শতে দশজন হিন্দু গণ্য হওয়াও সুকঠিন। বহুকালাবধি ইহা মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগের অধীন থাকাতে এইরূপ হইয়া উঠিয়াছে। প্রত্যুত, এখানে যে সমুদয় হিন্দু আছে (যাহারা পণ্ডিত নামে খ্যাত) তাহাদিগেরও

লৌকিক আচার ব্যবহার অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়া মুসলমান-দিগের ন্যায় দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু আধুনিক হিন্দু শাসনকর্ত্তা উঁহাদিগকে প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীতে পরিণত করিতেছেন।

পুরুষমণ্ডলী গৌরবর্ণ দৃঢ়কায় এবং অঙ্গ-সৌষ্ঠব বিশিষ্ট। ইহারা চতুর, প্রখর বুদ্ধিশালী এবং আমোদ-প্রিয়। কিন্তু ইহারা অতিশয় ভীরু। মহিলাগণ পরমা সুন্দরী। বিশেষতঃ পণ্ডিতানীরা অনুপমরূপলাবণ্যবতী। কবিবর ভারতচন্দ্রের বিদ্যার রূপ বর্ণনা এখানকার রমণী মাত্রেই প্রযুজ্য। প্রত্যুত, ইহাদিগকে পক্ষবিহীনা পরী অথবা অপ্সরা বলিলেও অত্যুক্তি নহে—অপ্সরা ভিন্ন অপর কোন্ জাতীয় রমণীর স্বর্গে বাস সম্ভব হইতে পারে? কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহারা সাধারণতঃ লজ্জাহীনা এবং দুশ্চরিত্রা। কামরূপ কামাক্ষ্যাবাসী লোকদিগের চরিত্র সম্বন্ধে কথিত আছে;—

> "সধবা বিধবা নাস্তি নাস্তি নারী পতিব্রতা।
> হংস পারাবতো ভক্ষ্য কামরূপ নিবাসিনঃ॥"

কিন্তু আমার মতে এই বাক্যের শেষ চরণের "কামরূপ" পরিবর্ত্তে "কাশ্মীর" শব্দ ব্যবহৃত হইলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়! স্ত্রীলোকেরা দুশ্চরিত্রা হইলে রাজদ্বারে কঠিন দণ্ড পাইয়া থাকে। কিন্তু বহুকালের অভ্যাসজাত দোষ সহসা দূর হইবার নহে।

[পরিচ্ছদ] পুরুষদিগের পরিচ্ছদ কৌপিন, আলখাল্লা, (ইহাকে এখানে "পিরান" কহে) এবং উষ্ণীষ। কি হিন্দু, কি মুসলমান, প্রায় সকলেই সর্ব্বদা মস্তক মুণ্ডিত করিয়া রাখে অর্থাৎ নেড়া হইয়া থাকে এবং হিন্দুরা স্বধর্ম্মের চিহ্ন স্বরূপ

শিক্ষামাত্র ধারণ করে। স্ত্রীলোকেরা কেবলমাত্র আলখাল্লা পরিধান করে। সুতরাং ইহাদিগকে একরূপ উলঙ্গিনী বলিলেই হয়। কেহ কেহ মস্তকে লালটুপি ব্যবহার করে এবং কেশ বিনাইয়া দুই বেণী পৃষ্ঠদেশে লম্বিত করিয়া দেয়। তখন দেখিতে অতি রমণীয়। পণ্ডিতানীদের মধ্যে কেহ কেহ কটিদেশে চাদর জড়াইয়া থাকে। ইহারা কিয়ৎ পরিমাণে অলঙ্কার দ্বারা গাত্র ভূষণ করে, কিন্তু তাহা বাহুল্যমাত্র। কাষ্ঠপাদুকা এবং অগ্নিসেবনার্থ কাঁকড়ি ইহাদের অঙ্গভূষণ বা পরিচ্ছদের মধ্যে গণনীয় হইতে পারে। কেননা, কি স্ত্রী. কি পুরুষ, কি হিন্দু, কি মুসলমান কাশ্মীরী মাত্রেই ইহা ব্যবহার না করিয়া থাকিতে পারে না।

কোনো দেশীয় লোকদিগের পরিধেয় বসন দ্বারা উহাদিগের সভ্যতা এবং শারীরিক ও মানসিক বলবীর্য্যের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। উলঙ্গ বা কৌপীনধারী ভীষণ পার্ব্বত্যজাতি, অর্দ্ধাবৃত মল্ল যোদ্ধা হিন্দুস্থানী, ধুতি চাদরধারী নিরীহ বাঙ্গালী এবং রমণীবেশা আলখাল্লামণ্ডিত কাশ্মীরী প্রভৃতি সকল জাতিই এই বাক্যের সাক্ষ্য দিতেছে। ইতিবৃত্ত পাঠে অবগত হওয়া যায়, যে, অতি পূর্ব্বকালে কাশ্মীরীরা অতি সাহসী, বলিষ্ঠ এবং রণদক্ষ ছিল। দিল্লীর সম্রাটেরা ইহাদিগকে অনেক যুদ্ধে পরাভব ভিন্ন কাশ্মীর অধিকার করিতে পারেন নাই। তথাপি মধ্যে মধ্যে ইহারা ষড়্‌যন্ত্র করিয়া রাজবিপ্লব উপস্থিত এবং যাহারা দুর্গম পার্ব্বত্যপ্রদেশে আশ্রয় লইয়াছিল, তাহারা কখনো বা উপত্যকায় আগমন পূর্ব্বক নানা উৎপাত করিয়া রাজ্যের শান্তি নষ্ট করিত। অবশেষে জেহা-

ঙ্গির বাদশাহ দেখিলেন, যে, কোনো উপায়ে ইহাদের অদম্য বীরত্ব সমূলে উন্মূলিত না করিলে নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ সম্ভব নহে। এ বিধায়ে তিনি এই স্ত্রীবেশ ধারণ করিবার নিমিত্ত ইহাদিগকে পীড়ন করিতে লাগিলেন। পাঠকগণ সহজেই অনুভব করিতে পারেন, যে. ইহারা বিনা যুদ্ধে এবং বিনীতভাবে তাঁহার আজ্ঞা পালন করে নাই। কিন্তু পরাজিত ও অপেক্ষাকৃত ক্ষীণবল জাতি তাৎকালিক দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী সম্রাটদিগের সহিত কি সমকক্ষ হইতে পারে? কাশ্মীরীরা অগত্যা বস্ত্রপরিধান পরিত্যাগ করিয়া রমণাবেশ ধারণ করিল এবং আলখাল্লা তাহাদের সৌর্য্য ও বীর্য্য অপহরণ করিতে লাগিল। এক্ষণে উহাদের পূর্ব্বকালিক সাহস ও রণপাণ্ডিত্যের চিহ্নমাত্রও দেখা যায় না।

কাশ্মীর স্বর্গ বটে, কিন্তু কাশ্মীরীদিগের মলিন বাস এবং কুৎসিত আচার ব্যবহার দেখিলেই ইহাদিগের থাকিবার স্থানকে নরক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। শীতকালে জলের ত্রিসীমায় যাওয়া কাহার সাধ্য? সুতরাং সে সময়ের কথা দূরে থাকুক, অপরাপর ঋতুতেও ইহাদিগের পরিধেয় বসনের সহিত জলের দেখা সাক্ষাৎ হয় না। কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই প্রকাশ্যস্থলে উলঙ্গ হইয়া স্নান করে। সুতরাং তৎকালেও পিরান ধৌত হয় না। এ কারণ উহা এত মলিন যে চিম্‌টী কাটিলে মলা উঠে এবং ঝাড়িলে উকুন ও পিস্‌সু পড়ে। অধিক কি, ইহারা যেরূপ অপরিষ্কার থাকে, তাহাতে নিশ্চয়ই প্রতীত হইবে, যে, যদি এখানকার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর না হইত, তাহা হইলে ইহাদিগের গাত্রে পোকা জন্মাইত এবং এখানে

কোনো মনুষ্যের নিদর্শনও থাকিত না। ইহারা আবার পথি মধ্যে, বাটীর প্রাঙ্গণে এবং গৃহাভ্যন্তরেও মল মূত্র পরিত্যাগ করিয়া থাকে। সুতরাং লোকালয় * নরক ভিন্ন অন্য কোনো শব্দে বাচ্য হইতে পারে না। শীতকালে যখন চারিদিক তুষার মণ্ডিত হইয়া যায় এবং ঘরের বাহির হওয়া সম্পূর্ণ দুঃসাধ্য হইয়া উঠে, তখন ইহারা বাসগৃহ মধ্যে মল মূত্রাদি ত্যাগ করিতে অগত্যা বাধিত হয়। কিন্তু একে স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধীয় নিয়মে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তাহাতে আবার অভ্যাসের গুণ এরূপ, যে, অপরাপর ঋতুতেও তদ্রূপ জঘন্য অবস্থায় কাল যাপন করিতে ঘৃণা বোধ করে না।

অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে আমাদিগের প্রিয়তম বন্ধু বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় এম এ এবং বি এল এখানকার জুডিসিয়েল কমিসনর এবং প্রধান বিচারপতি পদে অভিষিক্ত হইয়া শ্রীনগর প্রভৃতি অপরাপর স্থানে স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধীয় নিয়মাদির প্রচার করিতেছেন। সুতরাং কাশ্মীরীদিগের পথে ও উঠানে মল ত্যাগ প্রভৃতি অস্বাস্থ্যকর ব্যবহারাদি অচিরাৎ সংশোধিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

কাশ্মীরীদিগের চরিত্র সম্বন্ধে একটী বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া নিরস্ত থাকিতে পারিলাম না। "ধামা ঢাকা ঝগড়া"—

* শ্রীনগরও এতদ্রূপ অপকৃষ্ট বলিয়া মহারাজা ইংরাজ ও অপরাপর জাতীয় ভ্রমণকারীদিগের নিমিত্তে সহরের অনতিদূরে নদীতটে রমণীয় বাস গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। রাজবাটী এবং সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারীদিগের বাটী সমুদয় নদীতটে স্থিত। বিদেশীয় জনগণ মাত্রেই অর্থাৎ কাশ্মীরী ব্যতীত অপর সকলেই সহরাভ্যন্তর পরিত্যাগ পূর্ব্বক নদীপুলিনে বাস করে।

এই কথাটী শৈশবকালাবধি শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু এখানে কার্য্যে পরিণত দেখিলাম। কোনো গৃহস্থের সহিত অপর গৃহস্থের বিবাদ উপস্থিত হইলে উহারা অবিশ্রান্তরূপে কলহ করে। পরে সন্ধ্যা আগত হইলে উভয়পক্ষ আপনাপন প্রাঙ্গণ মধ্যে ধামা ঢাকিয়া রাখে। পরদিন প্রত্যূষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ঐ ধামা উত্তোলন করতঃ পূর্ব্ববৎ কলহ আরম্ভ করে। এক দিন নয়, এইরূপ কিছুদিন চলিতে থাকে। বিতস্তা নদী শ্রীনগরের মধ্যদেশ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। উহা এস্থলে অপ্রশস্ত। যৎকালে নদীর উভয় তটে এইরূপ ধামা ঢাকা ঝগড়া হইতে থাকে, তখন দেখিতে অতিশয় কৌতুকাবহ। এরূপ বিসম্বাদ উপলক্ষে আবার কোনো কোনো সময়ে উভয় পক্ষে নানাবিধ কুৎসিৎ 'সং' প্রস্তুত হইয়াও থাকে ; সে সমুদয় ভদ্রলোকের দ্রষ্টব্য নহে।*

[খাদ্য] পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, চাউল, মৎস্য এবং চা কাশ্মীরীদিগের প্রধান খাদ্য। ইহারা দুই বেলা

---

* এই কন্দলের ন্যায় হাজারিবাগে এক প্রকার ভয়ঙ্কর ঝগড়া দেখিয়াছি। কাশ্মীরের ঝগড়া ধামা চাপা থাকে, হাজারিবাগে পেশাদার ঝকড়াটিয়া আছে। অর্থাৎ দুই গৃহস্থে বিবাদ বাঁধিলে যদি আপনাদের মধ্যে কেহ বেশী মুখরা না থাকে, তবে বেতন অথবা ভাড়া দিয়া প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পেশাদার কন্দলিয়া স্ত্রীলোককে নিযুক্ত করা হয়। যুদ্ধের ন্যায় প্রকাশ্যস্থলে ঝগড়ার স্থান ও সময় নিরূপিত হইয়া দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে উভয়দিকে উভয় পক্ষের ঐ পেশাদার ঝগড়াটিয়া মাগীরা দাঁড়ায়। পরে ভয়ানক ও কুৎসিত অঙ্গভঙ্গীর সহিত এরূপ বাক্‌যুদ্ধ হইতে থাকে, যে, তাহা ভদ্রলোকের দ্রষ্টব্য ও শ্রোতব্য নহে। মনুষ্য যে এতদুর নীচ হইতে পারে এবং সেই নীচত্ব দর্শনে কোনো মানব-সমাজ যে কৌতুক পায়, এই আশ্চর্য্য ভাব ভদ্র দর্শকের মনে উদয় না হইয়া যায় না! মধ্যস্থ।

অর্থাৎ দিবা ও রাত্রিকালে আমাদের দেশেরন্যায় অন্ন আহার করে। কিন্তু উত্তপ্ত অপেক্ষা শীতল ভাত ইহাদের অধিক প্রিয়। কড়া কড়া শুষ্ক ভাত, লবণ ও লঙ্কায় জর্জ্জরিত কড়ম নামক এক প্রকার শাক, কিছু মৎস্য এবং এক পেয়ালা চা হইলেই কাশ্মীরীর অতি উপাদেয় ভোজন হইল। এ কারণ, দুঃখীলোকেরা মাসে মাসে দুই টাকা করিয়া উপার্জ্জন করিতে পারিলে অতি সুখস্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে।

চা ইহাদের যেমন নিত্যপেয়, তেমনি ভোগবিলাসের চিহ্ন। কোনো মিত্র বা আগন্তুক বাটীতে আসিলে ইহারা নস্য * এবং চা দ্বারা তাহার অভ্যর্থনা, সম্মানরক্ষা এবং অতিথিসৎকার করিয়া থাকে।

চা প্রস্তুত করিবার পাত্র অতি সুন্দর ও অতি উপাদেয়। ইহাকে কাশ্মীরী ভাষায় সমাবার "সমার" কহে। ইহা সাধারণতঃ ১২ বা ১৪ইঞ্চ উচ্চ এবং ইহার ব্যাস আড়াই ইঞ্চ। ইহাতে ঢাকুনি (আবরণ) মুষ্টি ও মুখ সংলগ্ন আছে এবং ইহার ভিতর (মধ্যস্থলে) অগ্নি নিক্ষেপ করিবার জন্য একটী নল আছে। এই নলে কয়েক খণ্ড প্রজ্জ্বলিত অঙ্গার দিলেই অনতিবিলম্বে চা প্রস্তুত হইয়া যায়। কাশ্মীরীরা যখন স্থানান্তরে ভ্রমণ করিতে যায়, তখন সমাবার এবং ইহার আনুষঙ্গিক উপকরণ পদার্থ সঙ্গে না লইয়া গমন করে না।

ইহারা দুই প্রকারে চা প্রস্তুত করে। প্রথম মিষ্ট চা,

* ইহারা নস্য অত্যন্ত ব্যবহার করে। অতি পূর্ব্বকাল হইতে ইহা চলিয়া আসিতেছে—তখন কেহ ধূমপান করিত না। কিন্তু এক্ষণে অনেকে ইহাও সেবন করিয়া থাকে।

দ্বতীয় লবণ-চা। সাধারণ রীত্যনুসারে মিষ্ট চা প্রস্তুত করিয়া থাকে অর্থাৎ জল ফুটিয়া উঠিলে চা দেয় এবং ইহাতে চিনি, এলাচি, দারুচিনি প্রভৃতি কয়েকটী মসলা মিশ্রিত করে। পরন্তু ইহাতে দুগ্ধ দেয় না। ইহারা আহারকালে বা আহারান্তে এ প্রকার চা পান করে না। সে সময় কেবল লবণ-চা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। লবণ-চা প্রস্তুত করিতে হইলে শীতল জলের সহিত চা ফুটাইতে থাকে। পরে ইহাতে এক প্রকার ক্ষার দেয়। এই ক্ষারকে "ফুল" কহে এবং ইহা তিব্বৎ হইতে আসিয়া থাকে। ফুল দ্বারা চার সারাংশ শীঘ্র আকর্ষিত হয় এবং ইহার উত্তম বর্ণ হইয়া থাকে। এইরূপে চা সিদ্ধ হইলে ইহাতে কেবল মাত্র লবণ ও কখনো কখনো দুগ্ধ মিশ্রিত করে এবং ইহা হইলেই লবণ-চা প্রস্তুত হইল। এই চা মিষ্ট চা সদৃশ স্বাদু নহে, কিন্তু ইহারা ইহাকে অধিকতর পুষ্টিকর এবং পাচক কহে। ইহারা আমাদের দেশের ব্যবহার্য্য চা পচন্দ করে না। তিব্বৎ ও লদাখ্ প্রভৃতি উত্তরখণ্ড হইতে যে মর্দ্দিত এবং একত্র সংলগ্নীকৃত চা আইসে, তাহাই ইহাদের প্রিয়।

[শিল্পকৌশল] কাশ্মীরীরা শিল্পবিদ্যায় অতিশয় নিপুণ। এখানকার শাল জগদ্বিখ্যাত। শ্রীনগরের নিকটবর্ত্তী নাওসেরা নামক স্থানে কাগজ প্রস্তুত হয়। উহা সুচিক্কণ, এবং পার্চমেণ্টের ন্যায় দৃঢ়। বিশেষতঃ রাজকীয় পত্রাদি লিখিবার জন্য যে কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা সুবর্ণপুষ্পে সুশোভিত এবং দেখিতে অতি রমণীয়। এখানকার কলমদানির কর্ম্ম (ইংরাজীতে পেপিয়ার-মেসি কহে) অর্থাৎ কাগজের কলমদান, বাক্স, থালা, রেকাবি প্রভৃতি যে সমুদয় প্রস্তুত হয়, তাহা অতি প্রশংসনীয়। স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কারাদির নির্ম্মাণ-

কৌশলও নিন্দনীয় নহে। পরন্তু ইহাদিগকে যে প্রকার নমুনা দেখান যায়, তাহা অবিকল প্রস্তুত করিতে পারে।

[ভাষা] এখানকার প্রকৃত ভাষার নাম "কাশুর"। ইহা সংস্কৃতের অপভ্রংশ, কিন্তু এ ভাষায় কোনো পুস্তক লেখা দেখা যায় না এবং লিখিবারও উপায় দেখি না। কারণ, শব্দগুলি উচ্চারণানুরূপ লিপিবদ্ধ করিবার কোনো অক্ষর নাই। দেব-নাগরের অপভ্রংশ সারদা অক্ষর, যাহা সংস্কৃত ভাষার পুস্তক লিখিতে ব্যবহৃত হয়, তাহার বর্ণমালায় অনেক গুলি কাশুর উচ্চারণ লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে। কিন্তু অনেক গুলি বিলক্ষণ বর্ণ আছে, যাহার অনুরূপ অক্ষর দেবনাগর বর্ণমালায় নাই। আমাদের বাঙ্গালা ভাষার সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে। কাশ্মীরীরা যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে. উহা নানাবিধ ভাষা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। ভ্রমণকারী ভিগ্‌নি সাহেব লিখিয়াছেন, ইহাদের ভাষার একশত শব্দের মধ্যে ২৫ সংস্কৃত; ৪০ পারসীক; ১৫ হিন্দুস্থানী; ১০ আরবীয় এবং কতি-পয় সংখ্যক তিব্বতীয় বা পাহাড়ী। কিন্তু বোধ হয়, ইহারা সংস্কৃত শব্দ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহার করে। একারণ, ইহাদের কথোপকথন কালে বাঙ্গালা শব্দের ধ্বনি শুনা গিয়া থাকে। প্রত্যুত, "বুঝ্‌চ" (বুঝিয়াছ) 'বুঝ্‌কিম্না' (বুঝ্‌লে কিনা) 'তুলো' (উত্তোলন কর) প্রভৃতি শত শত বাঙ্গালা কথা প্রায় অবিকল ব্যবহৃত হয়। ইহাদের কথোপকথনের বিশেষ প্রকৃতি এই, যে, ইহারা অনেক বাক্য ও পদের প্রথমে "দপাঞ্চ" অর্থাৎ "বলিতেছি" বা "বলিতেছেন" এবং অনেক ক্রিয়া পদের অন্তে "চ" ব্যবহার করে। লোকের প্রকৃতি নম্র, কথাও মিষ্ট।

[শিক্ষা] রাজকীয় ও বৈষয়িক সমুদয় কার্য্য পারসীক

ভাষায় সম্পন্ন হয় বলিয়া এখানকার লোকে পারসীক ভাষা শিক্ষা করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন পণ্ডিত (হিন্দু কাশ্মীরী) দিগের মধ্যে অনেকে সংস্কৃত অধ্যয়ন করে। ইহাদের অনেকে সুদক্ষ পণ্ডিত। বিশেষতঃ কেহ কেহ জ্যোতিষ শাস্ত্রে এবং গ্রহাদির ফলাফল নিরূপণ করিতে অতি নিপুণ। পরন্তু অতি প্রাচীন কালে কাশ্মীর যে সংস্কৃত বিদ্যানুশীলনের জন্য অতি প্রসিদ্ধ ছিল, মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগের অত্যাচারে তাহা লোপ হইয়া আসিতেছিল। এক্ষণে হিন্দু-নরেশ্বর তাহাকে পুনর্জীবিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এখানে মহারাজার স্থাপিত সংস্কৃত ও পারসিক পাঠশালা আছে এবং বোধ হয়, অনতিবিলম্বে ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে।

[ধর্ম্ম] এখানকার প্রায় সমুদয় হিন্দু শাক্ত এবং প্রায় সকলেই রীতিমত পূজা পাঠাদি করিয়া থাকে। স্নান ও পূজাদি করুক বা নাই করুক, হিন্দু মাত্রেই (বালক ও স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত) প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক হিন্দুতার চিহ্ন স্বরূপ ললাটদেশে জাফ্‌রাণের দীর্ঘ ও স্থূল তিলক অঙ্কিত করে। এই তিলক এক সূর্য্যোদয়ে সেবিত হয় এবং অপর সূর্য্যোদয়ে অপনীত হইয়া তৎস্থানে আর একটী সন্নিবেশিত হইয়া থাকে। একারণ, ইহাদের ললাটে সুদীর্ঘ দাগ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

মুসলমানেরা সুন্নি ও সিয়া দুই অংশে বিভক্ত। তন্মধ্যে সুন্নিদিগের সংখ্যা বহু পরিমাণে অধিক। এই দুই ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী লোকদিগের ধর্ম্মবিদ্বেষ অতি গুরুতর ও ভয়ানক। ইং সন ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের শেষার্দ্ধে কোনো মস্-

জিদের প্রাচীর লইয়া এই দুই দলে বিবাদ হয়। এই সূত্রে সহস্র সহস্র সুন্নি একত্র হইয়া অপর পক্ষের ঘরদ্বারে অগ্নি প্রয়োগ, দ্রব্যাদি লুণ্ঠন, কুমারী ও যুবতীদিগের সতীত্ব নাশ, রাজ্যের শান্তিলোপ প্রভৃতি যে সমুদয় ভয়াবহ ও হৃদয়বিদারক অত্যাচার করিয়াছিল, তাহা স্মরণ হইলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। মহারাজার বুদ্ধিচাতুর্য্যে এবং শাসনকৌশলে সে বিপ্লব অনতিবিলম্বে শান্ত হইয়া যায় এবং অপরাধীরা যথোচিত শাস্তি পায় এবং কেবল ইহাঁরই শাসনভয়ে দুর্দ্দান্ত মহম্মদীয়েরা ধর্ম্মবিদ্বেষ-জনিত দুরভীষ্ট সাধন করিতে পারে না। নচেৎ, সুযোগপাইলে ইহাদের নৃশংস ব্যবহারের ইয়ত্তা থাকিত না।

[শাসন-প্রণালী] অতি প্রাচীনকালাবধি কাশ্মীর বিদেশীয় হিন্দু এবং মুসলমান নরপতিদিগের শাসনাধীন ছিল। পরে ইং ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাব নরেশ্বর একাক্ষ সিংহ মহারাজা রণজিৎ সিংহ কাবুলাধিপতি আমীর দোস্ত মহম্মদের ভ্রাতা নবাব জুবরখাঁকে পরাজিত করিয়া ইহা আপন রাজ্যান্তর্গত করেন। তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির পর ইং ১৮৪৬খৃষ্টাব্দে, যৎকালে ইংরাজ রাজপুরুষেরা পঞ্জাব অধিকার করেন, তখন মহারাজা রণজিৎ সিংহের অন্যতর মন্ত্রী মহারাজা গোলাব সিংহ তাঁহাদিগকে অশেষ প্রকারে সাহায্য করিয়াছিলেন; এমন কি, ইনি উহাঁদিগের পক্ষ অবলম্বন না করিলে তাঁহাদিগের জয়লাভ করা দুরূহ হইয়া উঠিত। একেতো, সমুদয় পঞ্জাব ও ইহার অধীনস্থ কাশ্মীর প্রভৃতি সুবিস্তৃত ভূভাগ এক কালে শাসনাধীন করা কঠিন ব্যাপার, তাহাতে আবার মহারাজা গোলাব সিংহকে কৃতজ্ঞতার নিদর্শন দেখানো উচিত। এই

বিধায়ে সুচতুর রাজনীতিকুশল শ্বেতকায় পুরুষেরা মহারাজা গোলাব সিংহের সহিত উক্ত খৃষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ্চ তারিখে এক সন্ধি স্থাপন করেন। এবং তাঁহার নিকট হইতে ৭৫ লক্ষ টাকা (মূল্য স্বরূপ) লইয়া তাঁহাকে কাশ্মীর ও জম্মু দান করিলেন। এই সন্ধিপত্রে ইহাও ধার্য্য হইল, যে, কাশ্মীর ও জম্মু অধিপতি ইংরাজদিগকে প্রতি বৎসর কেবল এক গুট্ অর্থাৎ পার্ব্বতীয় অশ্ব ; ১২টী শাল ছাগল (৬ পুং এবং ৬ স্ত্রী) এবং তিনযোড়া উৎকৃষ্ট শাল কর স্বরূপ প্রদান করিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সহকারে রাজত্ব করিতে পাইবেন।

মহা প্রতাপশালী রাজা গোলাব সিংহ নিজ ভুজবলে ও সুবিজ্ঞ দেওয়ান জোয়ালা সাহার বিচক্ষণতা ও রাজনীতিকুশলতার সাহায্যে কাশ্মীর ও জম্মু সুপ্রণালীক্রমে শাসন করেন। ইহাঁর শাসনকালে রাজ্যে দস্যু ও চৌর-ভয়ের লেশমাত্রও ছিল না এবং অদ্যাপি তদ্রূপই হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব নরপতিদিগের দৌরাত্ম্যে ও পীড়নে প্রজারা মৃতপ্রায় হইয়াছিল। সুতরাং মহারাজা গোলাব সিংহের কোমল ও ন্যায়পরায়ণ শাসনে মৃতদেহে জীবন প্রাপ্ত হইল। প্রত্যুত, গোলাব সিংহ গোলাপ পুষ্পের ন্যায় বিকসিত হইয়া সৌরভ বিস্তার করত রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। ইং ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে তিনি পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি স্বীয় মন্ত্রীকে কহিয়াছিলেন, যে, " ঈশ্বর এমন সময়ে আমাকে কাশ্মীর দিলেন, যখন জরা আক্রমণ করিয়াছে। ৯এ২৮ আমি ইহার এক এক খণ্ড প্রস্তর এবং এক একটী দূর্ব্বাদলের উপর পাদবিক্ষেপ করিতাম।"

মহারাজা গোলাব সিংহ জীবদ্দশায় অর্থাৎ ১৮৫৫ খৃষ্টা-

ব্দের মার্চ্চ মাসে আপন পুত্র মহারাজা রণবীর সিংহকে যৌব-
রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। এক্ষণে ইহাঁর বয়ঃক্রম ৪৮ বৎসর।
সিপাহী বিদ্রোহকালে ইনি বহুসংখ্যক সেনা দিল্লীতে প্রেরণ
করেন এবং তদনন্তর ইংরাজদিগকে অশেষ প্রকারে সাহায্য
করিয়া আসিতেছেন। একারণ মহারাণী ভিক্টোরিয়া প্রীতি সহ-
কারে ইহাঁকে নাইট উপাধি প্রদান করিয়াছেন। ইহাঁর চারি
পুত্র। জ্যেষ্ঠের নাম মিয়া প্রতাপ সিংহ, মধ্যম মিয়া রাম-
সিংহ, তৃতীয় মিয়া অমর সিংহ এবং কনিষ্ঠ মিয়া লক্ষ্মণ সিংহ।
জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র খৃ ১৮৫০, দ্বিতীয় ১৮৬৩, তৃতীয় ১৮৬৫
খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। কনিষ্ঠ এক্ষণে তিন বৎসর মাত্র।

ইহাঁরা সূর্য্যবংশীয়। মহারাজা রণবীর সিংহ পিতৃ-মন্ত্রী
দেওয়ান জোয়ালা সাহা এবং তৎপুত্র দেওয়ান কৃপারামের
অসীম বুদ্ধি, কার্য্যদক্ষতা এবং বিচক্ষণতা বলে স্বরাজ্য গৌরব-
সহকারে শাসন করিতেছেন। জম্বু নগর ইহাঁর রাজধানী।
তথায় মহারাজা বাস করেন এবং প্রায় প্রতি বৎসর গ্রীষ্ম
কালে কাশ্মীরে গমন করিয়া থাকেন।

কাশ্মীরে হিন্দুধর্ম্ম মূর্ত্তিমতী। জম্বুতে রঘুনাথজীর এবং
কাশ্মীরে গদাধর দেবের স্বর্ণমণ্ডিত মন্দিরে চারি বেদ অহর্নিশি
পাঠ হইয়া থাকে। হিন্দুমাত্র সকলকেই অতি প্রত্যুষে শয্যা
হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যথারীতি স্নানপূজাদি করিতে হয়—
কাহারো লৌকিক আচার ব্যবহার অথবা আহারাদি ধর্ম্মবিরুদ্ধ
হইলে রাজদ্বারে যৎপরোনাস্তি দণ্ড হইয়া থাকে। গোহত্যা,
সুরাপান ও জুয়াখেলা এই তিন মহাপাতকের নাম মাত্রও
নাই। কাশ্মীরীরা পুরাকালাবধি স্ব স্ব ভবনে আঙ্গুর এবং

আপেলের সুরা প্রস্তুত করিয়া পান করিত। কিন্তু মহারাজা এক্ষণে উহা রহিত করিয়াছেন এবং যদি কেহ কখনো পান করে, তাহা হইলে তাহাকে সপরিবারে অশেষ অপমানিত করিয়া রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। শ্রীনগরে ইংরাজদিগের আহারোপযোগী দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ দুই তিন খান দোকান আছে; তাহারা মদ বিক্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু ইংরাজ ভিন্ন কোনো প্রজাকে অথবা ভারতবর্ষীয় কোনো লোককে তাহারা মদ বিক্রয় করিতে পারে না।

এখানে বিচারকার্য্য হিন্দুশাস্ত্র সম্মতিক্রমে সম্পাদিত হইয়া থাকে। অধুনা মহারাজার আদেশ মতে বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় হিন্দুদিগের ব্যবস্থাশাস্ত্র, মুসলমানদিগের কোরাণ এবং ইংরাজদিগের পিনাল্‌কোড ঐক্য করিয়া এক নূতন নিয়মাবলী প্রস্তুত করিয়াছেন। কিছু দিন তদ্দ্বারাই দণ্ডবিধি হইয়া আসিতেছে। কোনো অপরাধী প্রাণবধ (ফাঁসি) দণ্ডার্হ হইলে মহারাজা ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অবিদিতে ও অননুমোদনে স্বীয় স্বাধীনতা বলে বধ-কার্য্য করিতে পারেন।

যাহাতে রাজ্য মধ্যে অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইয়া জ্ঞানালোক সম্যক্‌রূপে প্রদীপ্ত হয়, মহারাজা তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগী আছেন। দূরদেশ হইতে কোনো সুপণ্ডিত আসিলে তাঁহার যথেষ্ট সমাদর করেন, আপন সভাসদ পণ্ডিতদিগের সহিত তর্কবিতর্ক করাইয়া তাঁহার বিদ্যার পরিচয় লয়েন এবং গুণের পুরস্কার স্বরূপ যথোচিত রত্নাদি প্রদান পূর্ব্বক বিদায় করেন। কাশ্মীরে সংস্কৃত ও পারস্য বিদ্যালয়ের জন্য এবং জম্বুতে সংস্কৃত, পারস্য ও ইংরাজী বিদ্যালয়ের জন্য

বার্ষিক ত্রিশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় (কেবলমাত্র—শিক্ষকদিগের বেতন ও ছাত্রবৃত্তি) স্বাক্ষর করিয়াছেন। বিদ্যার্থী বালকেরা অবস্থানুসারে কেহ কেহ মাসিক দশ মুদ্রা করিয়া ছাত্রবৃত্তি পাইয়া থাকে এবং অধিকাংশ প্রাত্যহিক প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জন, আবশ্যকীয় পরিচ্ছদ, পাঠ্য পুস্তক এবং বাসগৃহ পাইয়া থাকে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা কার্য্য ও রাজকীয় প্রধান প্রধান কার্য্য সম্পাদনার্থ কলিকাতা প্রভৃতি দূরদেশ হইতে উপযুক্ত সন্তি-ধানগণ আনীত হইতেছেন। এবং যাহাতে ইংরাজ রাজ্যের ন্যায় সুপ্রণালীক্রমে সমুদায় রাজকার্য্য সম্পাদিত হয়, তদ্বিষয়ে মহারাজা ঐকান্তিক চেষ্টা করিতেছেন। অপর, স্বরাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ও পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার বিদ্যার পুস্তক সংগ্রহ করিতেছেন এবং তৎসমুদায় সরল সংস্কৃত, হিন্দী এবং উর্দ্দু ভাষায় অনুবাদ করাইতেছেন। এই অনুবাদ বিভাগ একটী স্বতন্ত্র সমাজরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এতৎসম্বন্ধে প্রতি বৎসর বিপুল অর্থ ব্যয় হইতেছে।

মহারাজার দানও অতি প্রশংসনীয়। প্রাত্যহিক স্বস্ত্যয়ন ও গ্রহপূজা; প্রতি শনিবারে শনৈশ্চর দেবের পূজা; মধ্যে মধ্যে কালপুরুষ প্রভৃতি কুগ্রহের পূজা। অমাবস্যা, পৌর্ণমাসী, সংক্রান্তি, গ্রহণ প্রভৃতি উপলক্ষে বিপুল অর্থ দীন হীন অনাথ-দিগকে দান জন্য মহারাজার বার্ষিক তিন লক্ষ এবং রাজপুত্র-দিগের প্রত্যেকের লক্ষ মুদ্রা স্থিরীকৃত আছে। অপর, স্বরা-জ্যস্থ হউক, বা বিদেশস্থ হউক, কোনো বিপদ্‌গ্রস্ত আগন্তুক ব্যক্তি স্বীয় প্রকৃত বিপদ জানাইলে মহারাজা মুক্ত হস্তে অর্থে সামর্থ্যে তাহার বিপদোদ্ধার করেন। এতদ্ব্যতীত, সময়ে

সময়ে ভারতবর্ষীয় অথবা ইংলণ্ডীয় কোনো উৎসব উপলক্ষে অথবা কোনো কল্যাণব্রতে বিপুল বিত্ত ব্যয় করিয়া থাকেন।

রাজস্ব ও পণ্যজাত দ্রব্যাদির কর প্রভৃতি সমুদায়ে মহারাজার বার্ষিক আয় অনুমান এক কোটি মুদ্রা এবং প্রায় তৎসমুদয়ই ব্যয় হইয়া থাকে। অধুনা শাল হইতে দশ লক্ষ টাকা উৎপন্ন হইতেছে। পূর্ব্বে শালের কর অধিক ছিল বলিয়া তদপেক্ষা অধিক টাকা সংগৃহীত হইত। কিন্তু উহা প্রজাপীড়ক ছিল—তন্তুবায়েরা অতি কষ্টে প্রদান করিত। একারণ, মহারাজা নিজ কোষের হ্রাসতা করিয়াও অনেক পরিমাণে উহার লাঘব করিয়াছেন। পূর্ব্বে ভূমি মাত্রই রাজসম্পত্তি ছিল; কোনো ভূমির নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব ছিল না। কৃষিকার্য্যের সময়ে কৃষকদিগকে উহা বিভাগ করিয়া দেওয়া হইত এবং শস্যোৎপাদন হইলে কেবলমাত্র তাহাদিগের ভরণপোষণোপযোগী শস্য প্রদান পূর্ব্বক অবশিষ্ট সমুদয় রাজকোষে সঞ্চিত হইত এবং প্রজাদিগের আবশ্যক মত নরপতি স্বয়ং শস্য বিক্রয় করিতেন। সুতরাং, পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, এই রীতি কতদূর পর্য্যন্ত প্রজাশোণিতশোষক, নৃশংস এবং দৌরাত্ম্য-মূলক ছিল। কিন্তু করুণহৃদয় বর্ত্তমান নরেশ্বর উহা সমূলে উচ্ছেদ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে অতি লঘু পরিমাণে ভূমির কর নির্দ্দেশ পূর্ব্বক কৃষকদিগকে বণ্টন করিয়া দিয়াছেন। কয়েক বৎসর অতীত হইল, কাশ্মীরে প্রজাদিগের নিকটে রাজস্ব হিসাবে ন্যূনাধিক দ্বাবিংশতি লক্ষ মুদ্রা অনাদায়ী ছিল। বিশেষ পীড়ন না করিলে সে সমুদয় আদায় হইবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু মহারাজা উহার স্বত্ব ত্যাগ করিয়া-

ছেন এবং যাহাতে বর্ষে বর্ষে রাজস্ব আদায় হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। এইরূপে প্রজাগণের সুখোদ্দেশে ইনি অনেক অনেক বিষয়ের করের লাঘব করিয়াছেন এবং যাহাতে কোনো কোনো বিষয় হইতে অধিক রাজস্ব উৎপন্ন হয়, তাহার উপায় অবলম্বন করিতেছেন। এতাবৎকাল রেসম হইতে দশ সহস্র টাকা আয় হইত; কিন্তু বিজ্ঞবর নীলাম্বর বাবু এখানকার অসংখ্য তুঁতবৃক্ষ এবং সুলভ গুটিপোকা দেখিয়া মহারাজার নিকটে আবেদন করেন, যে, সুচারুরূপে বর্দ্ধিত হইলে রেসম হইতে দশ সহস্রের পরিবর্ত্তে ছয় লক্ষ মুদ্রা উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা। মহারাজা এই বাক্যে অনুমোদন করাতে তিনি বাঙ্গালা দেশ হইতে কতিপয় সুশিক্ষিত তন্তুবায় আনাইয়া রেসমের কার্য্য বিস্তৃত করিয়াছেন। বোধ হয়, তাঁহার আশা ফলবতী হইবে।

মহারাজার চল্লিশ সহস্র সুশিক্ষিত সৈন্য আছে। রঘুনাথজী প্রভৃতি দেবতাদিগের নামানুসারে সম্প্রদায় সমুদায়ের নামকরণ হইয়াছে এবং ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন পরিচ্ছদ—সে সমুদয় অতি উৎকৃষ্ট। সৈন্যদিগের অধিকাংশ ডোগ্রা অর্থাৎ জম্বু ও তৎসন্নিধি স্থানবাসী। এতদ্ব্যতীত, অনেক হিন্দুসিপাহী এবং কাশ্মীর প্রদেশের উত্তরভাগস্থ গিলগিৎ প্রভৃতি স্থানবাসী আছে। প্রায় সকল সেনানায়ক ডোগ্রা। কাশ্মীরে কর্ণেল গার্ডনার নামক এক জন ইউরোপীয় (বোধ হয়, ইটালী দেশীয় হইবেক) মহারাজা গোলাপ সিংহ কর্ত্তৃক সৈন্যাধ্যক্ষ পদে অভিষিক্ত আছেন এবং সম্প্রতি ইউরোপীয় তুরস্ক দেশীয় এক জন দৃঢ়কায়, বলিষ্ঠ ও কর্ম্মদক্ষ কর্ম্মচারী

এক সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। অধুনা মহারাজা ডোগ্রা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের সন্তানের এক নূতন সম্প্রদায় প্রস্তুত করিতেছেন। উহারা শিক্ষিত হইলে মহারাজার শরীর রক্ষক হইবে। সৈন্যগণ ইতিপূর্ব্বে ইংরাজী শব্দে শিক্ষিত হইত। কিন্তু অধুনা তৎসমুদয় সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে যথা, "স্কন্ধে যন্ত্রম্" "দক্ষিণে চক্রম্" ইত্যাদি।

মহারাজা সুবিখ্যাত আলফ্রেড নরপতির ন্যায় দিন-রাত্রিকে নানাভাগে বিভক্ত করিয়া স্বীয় নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের নিয়মাবলী প্রস্তুত করিয়াছেন। নিতান্ত শরীর অসুস্থ অথবা কোনো দৈব দুর্ঘটনা উপস্থিত না হইলে উহা উল্লঙ্ঘন করেন না—নচেৎ প্রত্যহ তৎসমুদয় স্পষ্টাক্ষরে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। প্রত্যূষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপন পূর্ব্বক ঈশ্বরোপাসনায় মনোনিবেশ করেন। যৎকালে মৃগ বা ব্যাঘ্র চর্ম্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া ভক্তি সহকারে পূজা করিতে থাকেন, তখন ইঁহাকে দর্শন করিলে ভক্তিরসের উদয় হয়। পূজাকালে শ্রীমদ্ভাগবৎ অথবা পুরাণাদি পাঠ শ্রবণ করেন এবং কৃতবিদ্য পণ্ডিত মণ্ডলীতে মণ্ডিত হইয়া ধর্ম্মালোচনা ও শাস্ত্রানুশীলন করিতে থাকেন। পণ্ডিতদিগকে যেরূপ জটিল প্রশ্ন করেন; প্রাপ্ত উত্তরের যৌক্তিকতা ও অযৌক্তিকতা যেরূপ প্রতিপন্ন করেন, তাঁহাদিগের পরস্পরের মতভেদ হইলে যেরূপ ন্যায়পরায়ণ মধ্যস্থ হইয়া মীমাংসা করিয়া দেন, তাহাতে তাঁহার সুশিক্ষা, অসীম বহুদর্শিতা এবং অসাধারণ ধীশক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়। অধিক-

তর প্রতিষ্ঠার বিষয় এই, যে, পাছে প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ রাজ্যেশ্বরের মতের বিরুদ্ধে কেহ কোনো কথা কহিতে সাহসী না হয়, এ কারণ মহারাজা ভূয়োভূয়ঃ সকলকেই আপনাপন অভিপ্রায় অকুতোভয়ে প্রকাশ করিতে উত্তেজনা করেন এবং স্বপক্ষ, যত কেন প্রিয় ও বিশ্বাসস্থল হউক না, ভ্রান্তিমূলক প্রমাণীকৃত হইলে প্রীতি-প্রফুল্লমনে তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রকৃতপক্ষ অবলম্বন করেন।

যৎকালে মহারাজা পূজা করিতে থাকেন, তখন ধীমান জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র স্নান, দান, পূজা প্রভৃতি প্রাতঃক্রিয়া সমাপন পূর্ব্বক সচিবপ্রধান দেওয়ান জোয়ালা সাহার সহিত বহুসংখ্যক সভাসদ্‌বর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া “দেওয়ান খানায়” উপবিষ্ট হয়েন এবং রাজ্যসংক্রান্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্য সমাধা করেন। পরে নবম ঘটিকাকালে মহারাজা পূজা ও প্রাত্যহিক দান সমাপন করিয়া দরবারে আইসেন। চোপদারেরা অগ্রবর্ত্তী হইয়া মহারাজের আগমন ঘোষণা করিতে থাকে। এই দরবারকে “খাস্‌দরবার” অর্থাৎ অপ্রকাশ্য রাজসভা কহে। ইহাতে কেবলমাত্র জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র, মন্ত্রীদ্বয় এবং তদ্বংশজাত সুদক্ষ কর্ম্মচারীরা উপস্থিত থাকেন। ইহাতে রাজ্য-সংক্রান্ত গুহ্য বিষয়াদির পরামর্শ হয়; কি লঘু, কি গুরু সমুদয় রাজকার্য্যের তত্ত্বাবধারণ হয়; প্রচলিত নিয়মাদি সংশোধন আবশ্যক হইলে পরিবর্ত্তন হয়; রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন ও প্রজাগণের সুখোন্নতি উদ্দেশে কল্যাণময় ব্রতসকল স্থিরীকৃত হয়; এবং প্রয়োজনমতে প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীরা আহূত হইয়া তাহাদিগের ভারার্পিত কর্ম্মের পর্য্যালোচনা হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত, নির্দ্দিষ্ট দিবসে মহারাজা স্বয়ং সৈন্য-সংক্রান্ত ও গুরুতর দেওয়ানী ও ফৌজদারী সম্বন্ধীয় অভিযোগ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বিভাগের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করেন।

পাঠকবর্গের গোচরার্থ এস্থলে উল্লেখ করা উচিত, যে, জন্মাষ্টমী, বিজয়াদশমী, রামনবমী প্রভৃতি কয়েক মহোৎসবে মহারাজা বহুমূল্য রত্নালঙ্কারে শোভিত হইয়া সভাসীন হয়েন। নচেৎ প্রাত্যহিক দরবারে ঋতু উপযোগী সাধারণ পরিচ্ছদ এবং ক্ষত্রিয় জীবনসর্ব্বস্ব তরবারি ভিন্ন কোনো প্রকার অলঙ্কার ধারণ করেন না। মহারাজা সভাসীন হইলে রাজকর্ম্মচারী মাত্রেই দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া "জয় দেব মহারাজ" শব্দে বন্দনা করতঃ রাজসাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে। বিদেশীয় সম্ভ্রান্ত আগন্তুকেরা এই প্রাতঃকালীন দরবারে মন্ত্রীদিগের সাহায্যে রাজসদনে উপনীত হইয়া থাকেন। পরে বেলা একাদশ ঘটিকাকালে সভা ভঙ্গ হয় এবং চোপদারেরা সভাভঙ্গসূচক ধ্বনি প্রকাশ করিতে থাকে। *

বেলা অপরাহ্ন চতুর্থ ঘটিকাকালে জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র প্রাড়্বিবাকদিগের সহিত "মণ্ডী" অর্থাৎ রাজবাটীর বহির্দ্দেশস্থ মধ্যস্থলবর্ত্তী প্রকাশ্য সভামণ্ডপে অধিবেশন পূর্ব্বক নিরাশ্রয় অনাথদিগের মর্ম্মবেদনার আবেদন শ্রবণ এবং তৎপ্রতীকারের আদেশ প্রচার করেন।

সূর্য্যাস্তের প্রাক্কালে মহারাজা অশ্বারোহণ পূর্ব্বক নগর

---

* ইহা এবং পরবর্ত্তী বর্ণনা জম্বুরাজধানী আদর্শ করিয়া লিখিত হইল। মহারাজা কাশ্মীরে প্রায় নৌকাযানে সন্ধ্যাসমীরণ সেবন এবং নগর পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। সেখানে কোনো হস্তী নাই।

পর্য্যবেক্ষণ করিতে গমন করেন। সম্মুখে অস্ত্রধারী শরীর-রক্ষকেরা ধাবিত হইতেছে, উচ্চৈঃশ্রবা সদৃশ ঘোটক-পৃষ্ঠে মহারাজা উপবিষ্ট হইয়া একতান নয়নে চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিতেছেন, রাজপুত্রেরা ও পারিষদ্‌বর্গ সুদীর্ঘ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পশ্চাদ্‌গমন করিতেছে, পশ্চাতে দুই বা চারি মাতঙ্গ সুসজ্জিত হইয়া গর্ব্বসহকারে মৃদু মৃদু পাদবিক্ষেপ করিতেছে, অশ্বের হ্রেষারবে ও পদশব্দে দিঙ্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতেছে, নগরী সহস্র মুখ ধারণ করতঃ "মহারাজ জয় দেব" শব্দে বন্দনা করিতেছে—দেখিলে নরেশ্বরের প্রতাপে বিমোহিত হইতে হয়! প্রতি রবিবারের সায়ংকালে সেনা-প্রদর্শন হইয়া থাকে। মহারাজা স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সৈন্যদিগের শিক্ষার পরীক্ষা লয়েন।

বিভাবরী সমাগতা হইলে মহারাজা প্রত্যাগমন পূর্ব্বক দরবারে আসীন হয়েন। কোনো গুহ্য পরামর্শের আবশ্যকতা থাকিলে মন্ত্রীবর্গের সহিত নিভৃত স্থানে উপবেশন করেন। ইহাকে "কিনারা" বা "গোসা" (কর্ণ) কহে। পরে "আম-দরবার" অর্থাৎ প্রকাশ্য রাজসভা আরম্ভ হয়। ইহাতে প্রধান প্রধান রাজ কর্ম্মচারী মাত্রেই উপস্থিত হয়েন। ইহাতে প্রাতঃকালীন দরবারের ন্যায় রাজ্যের হিতৈষিণী ও ঔৎ-কর্ষসাধিনী মন্ত্রণা অবলম্বিত, সমুদয় বিভাগের কার্য্য পুঙ্খা-নুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচিত, বিদ্যা ও ধর্ম্মবিষয়িণী তত্ত্ব বিতণ্ডিত হইয়া থাকে। মহারাজা সাধারণ বিষয়াদি সম্বন্ধে যেরূপ নীতিগর্ভ কথোপকথন, রাজ্যশাসন সম্পর্কে যেরূপ সদভি-প্রায় প্রকাশ এবং রাজা ও প্রজার পরস্পর পিতাপুত্র সম্ব-

স্বীয় কর্ত্তব্য বিষয়ে যেরূপ বক্তৃতা করেন, তাহাতে ইহাঁর অসাধারণ অভিজ্ঞতা, অনুপম প্রজাবাৎসল্য, স্বকীয় গরিষ্ঠ পদের যোগ্যতা, অসীম দয়া, দাক্ষিণ্য, উদারতা ও মহান্‌চিত্তের সহস্র সহস্র নিদর্শন দর্শনে বিমোহিত ও ভক্তিমান হইতে হয়। রাত্রি নবম ঘটিকাকালে রাজসভা ভঙ্গ হইয়া থাকে।

প্রত্যুত, মহারাজা রণবীর সিংহ, কে, জি, সি, এস, আই, যেরূপ শান্তমূর্ত্তি, ধীরপ্রকৃতি, সৎকর্ম্মশীল, সাধুচরিত্র, উদার-চিত্ত, ধর্ম্মভীত, বদান্য, নিরহঙ্কার, প্রজাবৎসল, গুণগ্রাহক, অতুল-বুদ্ধিসম্পন্ন এবং সর্ব্বগুণান্বিত, তাহাতে ইহাঁকে দেব-তুল্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যিনি ইহাঁর দর্শন লাভ করিয়াছেন, তিনিই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন, যে, ইহাঁর সৌম্যমূর্ত্তিতে রাজচক্রবর্ত্তী-লক্ষণ-সংযুক্ত রমণীয় প্রভা স্পষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে। ইনি যেরূপ অতুল বিভবশালী, সম্যক্‌ প্রকারে স্বাধীন এবং দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত নরেশ্বর, তাহাতে যে ইহাঁর চরিত্র দোষশূন্য হইয়া সর্ব্বগুণের আকর হই-য়াছে, ইহা অতি প্রশংসনীয়। অপিচ, স্বর্গ যাঁহার রাজ্য, অমরাপুরী যাঁহার বাসস্থান, এবং নন্দনকানন যাঁহার ক্রীড়ার উপবন, তিনি যে কোনো প্রকার ইন্দ্রিয় দোষে দূষিত নহেন, ইহা যেমন অনুমোদনীয়, তেমনি আশ্চর্য্যের বিষয়। ইনি রাজনীতিজ্ঞ বিচক্ষণ সচিবদ্বয়ের সদুপদেশে যেরূপ সুপ্র-ণালীক্রমে রাজ্য শাসন করিতেছেন—প্রজাদিগের হিত-সাধন উদ্দেশে যে সকল সুনিয়ম প্রচার ও মহদনুষ্ঠান করিতেছেন—তাহাদিগের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবার জন্য স্নেহময় পিতার ন্যায় যেরূপ সকরুণহস্তে পালন করিতে-

ছেন—স্বরাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করিবার জন্য যেরূপ একাগ্রচিত্ত ও তৎপর আছেন এবং বিদেশীয় বা বিজাতীয় জন সমূহের পক্ষে যেরূপ সহৃদয় ও কৃপালু, তাহাতে ইহাঁর রাজ্য "রামরাজ্য" বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ভারতবর্ষীয় কোনো আধুনিক নরপতি ইহাঁর সমকক্ষ যে হইতে পারেন না, এ কথা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে। তবে যে সময়ে সময়ে কোনো কোনো ইংরাজী সংবাদপত্র-সম্পাদক বা তদ্রূপ কেহ ইহাঁর শাসন প্রণালীর নিন্দা দ্বারা জঘন্য কুৎসা করিয়া থাকেন, সে সমুদায় অলীক ও বিদ্বেষমূলক। এমন স্বর্গসম কাশ্মীর "নেটিভ" রাজার অধীনে রহিয়াছে, ইহা অনেক ইংরাজ মহোদয়ের প্রাণে সহ্য হয় না, তাহাতে তাঁদের ঘোর চক্ষুঃ-পীড়া উৎপাদন করে। অপর, এস্থলে ইহাঁরা বারমাস* বাস করিয়া ইংরাজাধীন স্থান সমূহের ন্যায় যথেচ্ছাচারী হইয়া

---

* ইংরাজদিগের সহিত মহারাজা গোলাপ সিংহ এই অভিপ্রায়ে এক সন্ধি স্থাপন করেন, যে, কাশ্মীর দর্শনার্থী ইংরাজেরা নিয়মিত সংখ্যায় প্রতি বৎসর ১৫ ই এপ্রেল হইতে ১৫ ই অক্টোবর পর্য্যন্ত কাশ্মীরে থাকিতে পারিবেন। এই নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইলে তাঁহাদিগকে কাশ্মীর পরিত্যাগ করিতে হয়। পঞ্জাব গবর্ণমেন্ট সংখ্যা নির্দ্দেশ পূর্ব্বক (তিন শতের অধিক নহে) আদেশ-পত্র অর্থাৎ টিকিট প্রচার করিয়া থাকেন। এবং গমনার্থীদিগের চরিত্র লাম্পট্য প্রভৃতি দোষে দূষিত না হয়, যথেচ্ছাচারী হইয়া রাজ্যের শান্তি নষ্ট না করে, প্রজাদিগের সহিত কোনো বিষয়ে অসামঞ্জস্য না ঘটায়, এই সমুদায়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য প্রতি বৎসর এক জন "আফিসর অন্ স্পেশিয়েল ডিউটী" নিযুক্ত করেন এবং তৎসমভিব্যাহারে এক জন চিকিৎসক এবং এক জন পাদ্রী প্রেরণ করেন। এইরূপ আবহমান চলিয়া আসিতেছিল, কিন্তু গত বৎসর ইয়ক´ন্দের সহিত সন্ধি স্থাপন হওয়াতে উক্ত আফিসর ছয় মাসের পরিবর্ত্তে আট মাস থাকিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন। কিন্তু তিনি রাজ্য সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে হস্তার্পণ করিতে পারেন না।

আপনাপন নিকৃষ্টবৃত্তি চরিতার্থ ও পশুবৎ ব্যবহার করিতে সমর্থ হয়েন না, কথায় কথায় "ড্যাম্ নিগার" বলিয়া স্ব স্ব প্রভুত্ব দেখাইতে এবং বিবিধরূপে প্রজাদিগকে পদতলে দলিত করিতে পারেন না; ইত্যাকার নানাবিধ মনস্তাপে অকারণে মহারাজার বিপক্ষ পক্ষ অবলম্বন করত লেখনী দ্বারা ঝাল ঝাড়েন!

আবার কেহ কেহ হয় তো নিজ দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল স্বরূপ অপমানিত হইয়া রাজ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছেন। সুতরাং মহারাজার কুৎসা ও নিন্দা চারিদিকে প্রচার করিয়া বেড়ান। কিন্তু মহারাজা এই সমুদয় "কুত্তা ভোঁক্তা হায়" (কুক্কুর ঘেউ ঘেউ করিতেছে) বলিয়া সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেন।